ভাববার কথা

জে. কৃষ্ণমূর্তি

কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া

ভাববার কথা
জে. কৃষ্ণমূর্তি ‘This matter of culture’ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

অনুবাদ :
অঞ্জন পাহাড়ী

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী ২০১১
পুনর্মুদ্রণ : জুন ২০১১

প্রকাশক :
কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া (কলকাতা সেন্টার)
৩০, দেওদার স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০১৯
দূরভাষ (০৩৩) ৪০০৮-২৩৯৮
ই-মেল kfikolkata@gmail.com
ওয়েবসাইট www.jkrishnamurti.org / kfionline.org

© কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া (চেন্নাই)

মুদ্রক :
শাল্মলী পাবলিকেশনস্
৫৭-বি টাউনসেন্ড রোড
কলকাতা - ৭০০ ০২৫

দাম :
একশত পঞ্চাশ টাকা

সূচিপত্র

১। শিক্ষার ভূমিকা ১

২। স্বাধীনতা ১২

৩। মুক্তি ও প্রেম ২২

৪। শোনা ৩৬

৫। সৃজনশীল অতৃপ্তি ৪৬

৬। জীবনের সমগ্রতা ৫৭

৭। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ৬৭

৮। সুসামঞ্জস্য ৭৮

৯। মুক্ত মন ৮৯

১০। অন্তরের সৌন্দর্য ৯৯

১১। বশ্যতা ও বিপ্লব ১১১

১২। অকপট প্রতীতি ১২৩

১৩। সমানতা ১৩৪

১৪। অনুশাসন ১৪৫

১৫। সহযোগিতা.. ১৫৬

১৬। মনের নবীভবন ১৭২

১৭। জীবনপ্রবাহ... ১৮৫

১৮। মনোযোগ ১৯৮

১৯। জ্ঞান ও ঐতিহ্য ২১২

২০। ধর্মিষ্ঠ মনের উন্মুক্ততা ২২৬

২১। শেখা ২৩৮

২২। সহজ ভালোবাসা.. ২৫০

২৩। একাকীত্ব ও একত্ব.. ২৬৪

২৪। প্রাণশক্তি ২৭৮

২৫। সংগ্রামহীন জীবন ২৯১

২৬। মনের অতীত যে বিরাট ৩০৪

২৭। সত্যের খোঁজ ৩১৭

প্রশ্নসূচি ৩২৯

১

শিক্ষার ভূমিকা

আমি অবাক হয়ে ভাবি, সত্যি কি আমরা নিজেদের কোনোদিন জিজ্ঞাসা করেছি— শিক্ষার অর্থ কী? কেন আমরা স্কুলে যাই? কেনই-বা আমরা বিভিন্ন বিষয় শিখি? কেন একটার পর একটা পরীক্ষা পাশ করি এবং একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় নামি— আমাদের ঈপ্সিত একটু উচ্চমানের জন্য? এই তথাকথিত শিক্ষার অর্থ কী? শুধুমাত্র ছাত্রদের কাছেই নয়, পিতামাতাদের কাছে, শিক্ষকদের কাছে এবং যাঁরা এই পৃথিবীকে ভালোবাসেন— তাদের সবার জন্য এটা কিন্তু খুবই জরুরী প্রশ্ন। শিক্ষিত হওয়ার জন্য কেন আমরা এই ভীষণ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যাই? এটা কি শুধুমাত্র কয়েকটা পরীক্ষা পাশ করে একটা চাকরি পাওয়ার জন্য? নাকি আমরা যখন নবীন, তখন শিক্ষার কাজ হলো জীবনের সমগ্র প্রক্রিয়াটা বোঝবার জন্য আমাদের প্রস্তুত করা? একটা চাকরি, একটা জীবিকা অবশ্যই জরুরী— কিন্তু সেটাই কি সব কিছু? জীবন কিন্তু একটা চাকরি বা কোনো পেশায় প্রবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের বিস্তার অনন্ত, এর গভীরতা অতল, অগাধ, এর রহস্য অসীম, আর এই অসীম ব্যাপ্তিতে আমরা মানবসত্তা হিসাবে ক্রিয়া করে চলেছি। তাই আমরা যদি শুধু জীবিকার জন্যই নিজেদের প্রস্তুত করি তবে আমরা জীবনের মূল ব্যাপারটাকেই হারাবো। কেবলমাত্র পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি এবং গণিত, পদার্থবিদ্যা

বা অন্য কিছুতে দক্ষতা অর্জনের থেকেও জীবনকে বোঝা কিন্তু অনেক অনেক বেশী জরুরী।

সেইজন্যই, আমরা শিক্ষকই হই বা ছাত্রই হই, আমাদের নিজেদের কি প্রশ্ন করা জরুরী নয়— কেন আমরা অন্যদের শিক্ষিত করে তুলছি অথবা কেন শিক্ষিত হচ্ছি? এর সাথেই আর একটা প্রশ্ন— জীবনের অর্থই-বা কী? জীবন কি সত্যিই একটা অসাধারণ কিছু নয়? এই পাখী, ফুল, নতুন শাখায়-পাতায় সেজে ওঠা গাছ, এই অন্তহীন আকাশ, অগণিত নক্ষত্র আর এই বয়ে চলা নদী, তার মধ্যের মাছ— এইসব কিছুই জীবন। জীবন দারিদ্র, জীবন ঐশ্বর্যশালিতা, জীবন সম্প্রদায়ে, জাতিতে ও দেশের মধ্যের অবিশ্রান্ত সংগ্রাম, জীবন ধ্যান, জীবন ধর্ম, জীবন মনের গহনে লুকোনো অসংখ্য সূক্ষ্ম জিনিস— হিংসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আবেগ, ভয়, পরিপূর্ণতা, পরিতৃপ্তি আর উদ্বেগ। এইসব কিছুই জীবন এবং তার চেয়েও আরো অনেক বেশী কিছু। কিন্তু আমরা এর এক ক্ষুদ্র অংশকে বোঝার জন্য নিজেদের তৈরী করতে থাকি। আমরা বিশেষ কিছু পরীক্ষা পাশ করি। একটা চাকরি কোনোমতে খুঁজে নেই, বিবাহ করি, সন্তানের জন্ম দিই, আর তারপর আরো আরো বেশী যন্ত্রের মতো হয়ে যাই। আমরা জীবন সম্পর্কে ভীত, চিন্তান্বিত হয়ে থাকি। তাহলে এখন প্রশ্ন— শিক্ষার কাজ হলো জীবনের সমগ্র প্রক্রিয়া ও তার প্রবাহটি বোঝবার জন্য আমাদের সহায়তা করা, নাকি আমাদের কোনো ব্যবসা বা কোনো চাকরির জন্য তৈরী করে দেওয়া?

তোমরা যখন পূর্ণবয়স্ক পুরুষে বা নারীতে পরিণত হবে তখন তোমাদের সাথে কী ঘটবে? যখন তোমরা বড়ো হবে তখন তোমরা কী করবে— এ প্রশ্ন কি কোনোদিন নিজেদের জিজ্ঞাসা করেছো? স্বভাবতই বিবাহ করবে, কোথায়, কীভাবে আছো সেইসব কিছু বোঝবার আগেই বাবা-মা হয়ে যাবে; কোনো চাকুরি বা রান্নাঘরের চৌহদ্দিতে

বাঁধা পড়বে, আর সেখানেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হবে, নষ্ট হবে। এই কি সব— যা তোমাদের জীবনের সাথে ঘটবে? নিজেদের এ প্রশ্নগুলো করা কি উচিত নয়? যদি তোমরা সম্পন্ন পরিবার থেকে এসে থাকো, তবে তোমাদের প্রতিষ্ঠা আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। তোমাদের বাবারা হয়তো-বা একটি সুখের, আরামের চাকুরির ব্যবস্থা করে দেবেন, তোমরা হয়তো এক চমকদার বিবাহও করবে; তবু সেখানেও তোমরা ক্ষীণ হবে, জীর্ণ হবে, নষ্ট হবে।

অবশ্যই শিক্ষা যদি তোমাদেরকে— জীবনের বিরাট ব্যাপ্তি আর তার অগণন সূক্ষ্মতা, তার অপরিমেয় সৌন্দর্য, তার সকল দুঃখ আর আনন্দকে উপলব্ধি করতে সাহায্য না করে, তবে তার কোনো অর্থই নেই। হয়তো তোমরা কিছু ডিগ্রী অর্জন করলে, নামের শেষে অনেকগুলো শব্দ বসালে, ভালো চাকরিও হলো— কিন্তু তারপর? এইভাবে চলাতে তোমাদের মন যদি চিন্তাগ্রস্থ, স্থূল হয়ে ওঠে তবে এসবের অর্থ কী? ঠিক সেইজন্যই যখন তোমরা নবীন, তখন এ জীবন কী— তা খোঁজা কি সমীচীন নয়? যে মেধা, যে বোধ তোমাদের সকল সমস্যার সমাধান করবে— তার উন্মেষ ঘটানোই কি শিক্ষার সত্য ভূমিকা নয়? তোমরা কি জানো এই মেধা কী? অবশ্যই এটা একটা শক্তি, এটা একটা সামর্থ্য, যাতে তোমরা ভয়শূন্য হয়ে কোনো সিদ্ধান্তকে ছাড়াই মুক্তভাবে চিন্তা করতে পারবে; ফলত তোমরা নিজেই— সত্য কী, বাস্তব কী— এই সবের খোঁজও করতে পারবে। কিন্তু যদি তোমরা ভয়ের মধ্যে থাকো তবে কখনই সেই মেধা লাভ করতে পারবে না। যেকোনো ধরণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা— সে আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাই হোক বা রোজকার জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষাই হোক তা উদ্বেগ আনে, ভয় আনে। তাই উচ্চাকাঙ্ক্ষা কোনোদিনই একটা স্বচ্ছ, সরল, স্পষ্ট মন তথা মেধাসম্পন্ন মনের জন্ম দেয় না।

একটা কথা জেনো— যখন তোমরা নবীন, তখন এমন একটা

পরিবেশে থাকা খুবই জরুরী যেখানে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। আমাদের মধ্যে অধিকাংশই যত বয়ঃপ্রাপ্ত হতে থাকি, ততই ভয় পেতে থাকি। আমরা জীবনকে ভয় পাই, চাকরি হারাবার ভয় পাই, পরম্পরাকে ভয় পাই অথবা আমদের প্রতিবেশী, স্বামী বা স্ত্রী কে কী বলবে, কে কোনটা কীভাবে নেবে সেই ভয় পাই, আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই। আমাদের অধিকাংশেরই কোনো-না-কোনোপ্রকারের ভয় আছে, আর যেখানে ভয় থাকে সেখানে মেধা থাকে না। এটা কি সম্ভব নয় যে আমাদের জীবনের প্রথম সময়টা, যখন আমরা নিতান্তই কিশোর, তখন এমন এক পরিবেশের মধ্যে থাকি যেখানে ভয়ের লেশমাত্র নেই; এক স্বাধীনতার, এক মুক্তির বাতাবরণ আছে— অবশ্য যা খুশী করার স্বাধীনতা নয় বরং জীবনের সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে বোঝবার স্বাধীনতা রয়েছে? জীবন কিন্তু সত্যিই সুন্দর, আমরা একে যে শ্রীহীন বস্তুতে পরিণত করেছি, এটা কিন্তু তা নয়। এর অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য, এর অতল গভীরতা, এর অতুলনীয় সৌন্দর্যকে তখনই অনুভব করতে পারবে— যখন তোমরা সংগঠিত ধর্ম, পরম্পরা আর বর্তমানের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের সব কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। আর তখনই একজন মানুষ হিসাবে— সত্য কী, তুমি নিজেই খুঁজে পাবে। শিক্ষা কোনো কিছুকে অনুকরণ নয়, এটা একটা খোঁজ। যা সমাজ বা তোমাদের বাবা-মা বা তোমাদের শিক্ষকেরা বলেন— তার সাথে মানিয়ে নেওয়া, সেই অনুযায়ী চলা খুবই সহজ। এটা বেঁচে থাকার একটা সুরক্ষিত এবং সহজ পথ কিন্তু তা বেঁচে থাকা নয়, কারণ এর মধ্যে ভয় আছে, ক্ষয় আছে আর মৃত্যু আছে। জীবনে বেঁচে থাকা মানে নিজে খুঁজে বার করা— সত্য কী। আর সেটা সম্ভব যখন স্বাধীনতা থাকে, নিরন্তর অন্তরের বিপ্লব নিজের মধ্যে চলতে থাকে।

কিন্তু কেউ তোমাদের এ বিষয়ে উৎসাহিত করে না। কেউ তোমাদের এসে বলে না— প্রশ্ন করো, নিজে খুঁজে বার করো ঈশ্বর কী; তার

কারণ তোমরা যদি বিদ্রোহ করো— এই বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে, এই খোঁজের মধ্যে দিয়ে— যেসব জিনিস অসত্য তোমরা তাদের কাছে এক বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের বাবা-মা বা সমাজ চায় তোমরা সুরক্ষিতভাবে, নিরুপদ্রবে বেঁচে থাকো এবং তোমরাও তাই চাও। এই সুরক্ষিতভাবে বেঁচে থাকা মানে বোঝায় অনুকরণ করে বেঁচে থাকা, ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকা। তাই শিক্ষার প্রধানতম ভূমিকা হলো আমাদের মুক্তভাবে, নির্ভয়ে বেঁচে থাকবার জন্য সহায়তা করা— তাই নয় কি? যেখানে ভয়ের চিহ্ন নেই এমন এক পরিবেশ তৈরী করার জন্য তোমাদের এবং শিক্ষকদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।

যেখানে ভয়ের লেশমাত্র নেই এমন কোনো পরিবেশ কতটা অসাধারণ ব্যাপার তোমরা কি তা জানো? আমাদের এমন এক বাতাবরণ আনতেই হবে— কারণ সারা পৃথিবীতে আজ অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ চলছে। যাঁরা রাজনীতিবিদ বা ক্ষমতালোভী, তাঁদের দ্বারা এই পৃথিবী পরিচালিত। এটা পুলিশ, মিলিটারী, উকিল আর অসংখ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষের পৃথিবী। এঁরা সবাই উঁচুতে উঠতে চাইছেন এবং নিজেরাই নিজেদের মারছেন। এছাড়া তথাকথিত মহাত্মা, ধর্মীয় গুরুরা রয়েছেন, আর আছে তাঁদের ভক্তের দল, তাঁরাও হয় এ জীবনে না হয় পরের জীবনে ক্ষমতা চান অথবা উচ্চাসন চান। এ এক অদ্ভুত উন্মত্ত পৃথিবী, সীমাহীন সংশয়ে দিশাহারা— একদিকে সাম্যবাদীরা লড়াই করছে পুঁজিবাদীদের সাথে, আবার সমাজবাদীরা দুজনকেই বাধা দিচ্ছে— এখানে সবাই সবার বিরুদ্ধে লড়ছে, সবাই সবার আগে কোনো এক সুরক্ষিত জায়গায়, ক্ষমতায় অথবা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে পৌঁছোতে চাইছে। বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী বিশ্বাসের, জাতির, সম্প্রদায়ের, শ্রেণী বিভাগের, পৃথক রাষ্ট্রের— সবরকম স্থূলতা আর নিষ্ঠুরতার আঘাতে-আঘাতে পৃথিবী আজ দীর্ণ। আর এমনই এক পৃথিবীতে— মানিয়ে চলার জন্য, বেঁচে থাকবার জন্যই তোমাদের শিক্ষিত করা হচ্ছে।

এমনই এক বিধ্বংসী সমাজের কাঠামোর সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্যই তোমাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। তোমাদের বাবা-মায়েরাও চান তোমরা মানিয়ে নাও, আর তোমরাও তাই চাও।

এখন কথা হলো, শিক্ষার কাজ কি এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের কাঠামোর সাথে তোমরা যাতে মিলিয়ে চলতে পারো তাতে সাহায্য করা, নাকি তোমাদের স্বাধীন করা, সম্পূর্ণ মুক্ত করা, যাতে তোমরা এক ভিন্ন সমাজ গড়তে পারো, এক নতুন পৃথিবী গড়তে পারো? আমরা কিন্তু এই স্বাধীনতা ভবিষ্যতে নয় এখনই চাই— তা না হলে আমরা সকলেই হয়তো নষ্ট হয়ে যেতে পারি। এই মুহূর্তেই আমাদের স্বাধীনতার তথা মুক্তির এক বাতাবরণ গড়তে হবে— যাতে তোমরা বাঁচতে বাড়তে পারো, সত্য কী— তা নিজেরা খুঁজতে পারো, মেধাসম্পন্ন হতে পারো, এবং পৃথিবীর সাথে নিজেদের মানিয়ে না নিয়ে তার সম্মুখীন হয়ে তার সমগ্র ধারাটিকে উপলব্ধি করতে পারো। এরফলে তোমাদের সত্তার অন্তরতম প্রদেশেও এক গভীর বিপ্লব নিরন্তর চলতে থাকবে এবং যার মধ্যে এই গভীর আন্তরিক বিপ্লব চলে সে-ই খুঁজে পায় সত্য কী। যে এই পরম্পরাকে অন্ধের মতো অনুসরণ করছে, তাকে মানিয়ে নিয়ে চলছে তার পক্ষে কোনোদিনই তা সম্ভব হয় না। যখন তোমাদের মধ্যে অবিশ্রাম অন্বেষণ, বিরামহীন পর্যবেক্ষণ আর নিরন্তর শিখে চলা থাকবে তখনই তোমরা সত্য কী, ঈশ্বর কী, প্রেম কী— তা উপলব্ধি করবে। কিন্তু ভয় থাকলে— সেই তীব্র অনুসন্ধিৎসা, পর্যবেক্ষণ, শিখে চলা আর গভীর সচেতনতা থাকে না। সুতরাং শিক্ষার ভূমিকা হলো বাহিরে এবং ভিতরে সকল ভয়কে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, কারণ এই ভয় মানুষের চিন্তাকে, সম্পর্ককে আর প্রেমকে নষ্ট করে।

প্রশ্নকারী ঃ *যদি সবাই বিদ্রোহ করে তবে কি পৃথিবীতে এক অরাজকতার সৃষ্টি হবে না?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ প্রশ্নটাকে শোনো। কেবল একটা তৈরী উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে, প্রশ্নটাকে উপলব্ধি করা প্রয়োজনীয়। প্রশ্নটা হল— যদি সব ব্যক্তি বিদ্রোহ করে তবে কি পৃথিবীতে এক অরাজকতার সৃষ্টি হবে না? কিন্তু বর্তমানে যে সমাজ রয়েছে তা-কি সুবিন্যস্ত, সুব্যবস্থিত। তাই, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে বিপ্লব করে তাহলে সেটা অব্যবস্থিত, অবিন্যস্ত হয়ে যাবে? এখনই কি বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা নেই? সব কিছুই এতে কি সুন্দর, অবিকৃত, বিশুদ্ধ? প্রত্যেকে কি আনন্দে, সমৃদ্ধিতে, আর পূর্ণতায় বেঁচে আছে? এখানে একজন কি আর একজনের বিরুদ্ধে নয়? এখানে কি উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতার বিষাক্ত বাতাবরণ নেই। এখন পৃথিবী যে অবস্থায় আছে তা বিশৃঙ্খলা— সেটাকে প্রথমে বুঝতে হবে। এটাকে একটা সুবিন্যস্ত, সুচারুরূপে পরিচালিত সমাজ বলে ধরে নিও না। কিছু ভালো-ভালো কথায় মোহিত হয়ে যেও না। এই দেশ বা ইউরোপ, আমেরিকা বা রাশিয়া— সমগ্র পৃথিবী ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আর যদি তুমি এই ক্ষয়কে দেখতে পাও— তখনই সেটা একটা চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জটা হলো এই আশু সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করা। কীভাবে তোমরা এই সমস্যার মুখোমুখি হও, এতে সাড়া দাও, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ, তাই নয় কি? যদি তোমরা হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টান বা কম্যুনিস্ট হিসাবে সাড়া দাও তবে তা কিন্তু খুবই সীমাবদ্ধ ব্যাপার হবে— বলতে পারো এটা কোনো সাড়া দেওয়াই নয়। যখন তোমাদের মধ্যে কোনো ভয় থাকবে না, যখন একজন হিন্দু বা সাম্যবাদী বা পুঁজিবাদী হিসাবে নয়, একজন পূর্ণ মানবসত্তা হিসাবে এই সমস্যার সমাধান খুঁজবে— তখনই তোমরা এই চ্যালেঞ্জে পূর্ণভাবে সাড়া দিতে পারবে। আর যতক্ষণ তোমরা এই সমগ্র জিনিসটার বিরুদ্ধে— এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এই গৃধ্নুতা— যার উপর ভিত্তি করে এ সমাজ দাঁড়িয়ে আছে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করবে, ততক্ষণ এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। যখন তোমরা নিজেরা

উচ্চাকাঙ্ক্ষী নও, কোনো কিছু অর্জন করার জন্য লোলুপ নও, যখন নিজের নিরাপত্তাটাই তোমাদের কাছে প্রথম এবং শেষ কথা নয়— তখনই তোমরা এই চ্যালেঞ্জের প্রতি পূর্ণভাবে সাড়া দিতে পারবে, তখনই তোমরা এক নতুন বিশ্ব গড়তে পারবে।

প্রশ্নকর্তা ঃ *বিপ্লব, শেখা আর প্রেম— এরা কি পৃথক পৃথক প্রক্রিয়া, নাকি এরা একইসাথে ক্রিয়া করে?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ অবশ্যই এরা তিনটি পৃথক প্রক্রিয়া নয়। এটা একক প্রক্রিয়া। আসলে প্রশ্নটার অর্থ কী সেটা বোঝা খুব জরুরী। প্রশ্নটা আসলে একটা তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে করা, এটা কোনো উপলব্ধি থেকে আসা প্রশ্ন নয়। সেইজন্যই এটা তাত্ত্বিক প্রশ্ন। তাই এর কোনো সত্যমূল্য নেই। যে নির্ভয়, যার মধ্যে সেই বিপ্লবের লেলিহান শিখা জ্বলছে, যে শেখা কী, প্রেম কী জানবার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করছে, অবিশ্রান্তভাবে খুঁজছে, সে কখনো জিজ্ঞাসা করে না— এটা একটা প্রক্রিয়া, না তিনটে পৃথক প্রক্রিয়া। আমরা শব্দের ব্যবহারের ব্যাপারে অতি চতুর; আমরা ভাবি সমস্যার ব্যাখ্যা করে আমরা সমস্যাটারই সমাধান করে ফেলেছি।

তোমরা কি জানো— শেখার অর্থ কী? যখন তোমরা সত্যকার শিখছো তখন সারাজীবন ধরেই তোমরা শিখে চলো। এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে কোনো বিশেষ একজন শিক্ষকের থেকে তোমরা শিখছো। তখন একটা ঝরা পাতা, পাখীর উড়ে যাওয়া, ভেসে আসা কোনো গন্ধ, এক ফোঁটা চোখের জল, ধনী ও দরিদ্র— যারা কোলাহল করছে, কোনো স্ত্রীলোকের হাসি অথবা কারোর অহংকার, ঔদ্ধত্য— এইসব কিছুই তোমাদের শেখায়। তোমরা সকল কিছু থেকে শেখো; তাই আলাদা করে কোনো দিশারি, কোনো দার্শনিক, কোনো গুরুর প্রয়োজন হয় না। তখন জীবন নিজেই তোমাদের দিশারি আর তোমরাও নিরন্তর শিখে চলো।

প্রশ্নকর্তা ঃ *সমাজ, কিছু অর্জনের লোলুপতা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তা ঠিক, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকলে কি আমাদের ক্ষয় বন্ধ হয়ে যাবে?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এবং এটার জন্য আমাদের প্রয়োজন গভীর মনোযোগ।

তোমারা কি এই গভীর মনোযোগ দেওয়ার অর্থ জানো। আচ্ছা একসাথে ব্যাপারটা দেখা যাক। ক্লাসের মধ্যে বসে যখন তোমরা জানালা দিয়ে বাহিরে তাকাও অথবা কোনো সহপাঠীর চুল টেনে দাও, তখন শিক্ষক মহাশয় বলেন মনোযোগ দিতে। এর অর্থ কী? অর্থাৎ তোমরা যেটা পড়ছো সেটা তোমাদের কাছে আকর্ষণীয় নয়, তাতে তোমাদের আগ্রহ নেই, তখন শিক্ষক জোর করে মনোযোগ দিতে বাধ্য করেন— যেটা আসলে কোনো মনোযোগই নয়। যখন কোনো বিষয়ে তোমাদের গভীর অনুরাগ ও আকর্ষণ থাকে তখনই মনোযোগ আসে। তখন তোমাদের সমস্ত মন, সমগ্র সত্তাই সেখানে উপস্থিত আর তোমরাও ঐ বিষয়ের ব্যাপারে যাবতীয় কিছু জানতে চাও। ঠিক সেইভাবেই, যে মুহূর্তে উপলব্ধি করো— যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকে, তাহলেই কি আমাদের ক্ষয় থাকবে না— এই প্রশ্নটা সত্যি অতি গুরুত্বপূর্ণ, তখন এর সত্যতা জানবার তীব্র অনুসন্ধিৎসা তোমাদের মধ্যে দেখা দেয়।

এখন কথা হলো একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ কি নিজেকেই নিজে নষ্ট করে না? এটাকেই প্রথম খুঁজে বার করতে হবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঠিক না ভুল সে প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। নিজেদের চারিদিকে একটু লক্ষ্য করো। যে সব লোকেরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী তাদের লক্ষ্য করো। তোমরা যখন উচ্চাকাঙ্ক্ষী তখন কী ঘটে? তখন তোমরা তোমাদের নিজের সম্বন্ধেই ভেবে চলেছো, নিজের চাওয়াটাকে পূর্ণ করতে গিয়ে, নিজে বড় কিছু হতে গিয়ে নিষ্ঠুরতার সাথে, ক্রূরতার সাথে অন্যকে সরিয়ে

দিচ্ছ। এইভাবেই সমাজে— যারা সফলতার দিকে এগোচ্ছে আর যারা অসফল হয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে তাদের উভয়ের মধ্যে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। তোমরা যেটা চাও আর তোমাদেরই সাথে আরো যারা ঐ একই জিনিস চায়— তাদের মধ্যে নিরন্তর সংগ্রাম চলেছে। এখন প্রশ্ন— এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি কোনো সৃজনশীল জীবনের জন্ম দেয়? প্রশ্নটা কি খুব শক্ত হলো?

যখন তোমরা কোনো কিছুকে ভালোবাসো আর সেটার জন্যই সেটা করতে চাও— তখন কি তোমরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী? কোনো লক্ষ্যে পৌঁছোবে বলে নয়, আরো কিছু লাভ আসবে বলে নয়, বিশেষ পরিণামের আশা করেও নয়, কেবল জিনিসটাকে ভালোবাসো বলেই মনপ্রাণ দিয়ে, সমগ্র সত্তা দিয়ে যখন সেটা করো তখন উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে না, তাই নয় কি? সেখানে প্রথম স্থান অধিকারের জন্য কারো সাথে কোনো প্রতিযোগিতা নেই, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। সত্যকার তোমরা কী করতে ভালোবাসো, এবং জীবনের প্রথম থেকে শেষ অবধি তোমরা এমন কিছু করো— যা তোমাদের কাছে মূল্যবান, যা তোমাদের কাছে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ— সেটা খুঁজে বের করাতে সহায়তা করাই কি শিক্ষার ভূমিকা নয়? নাহলে তোমাদের জীবনের বাকী দিনগুলো নৈরাশ্যের নিরালোকে হারিয়ে যাবে। কী করতে ভালো লাগে, না জানলে, মন এক অভ্যস্ত জীবনের জালে আটকা পড়বে। সেখানে বৈচিত্র্যহীনতার ক্লান্তি, ক্ষয় আর মৃত্যু ছাড়া কিছুই নেই। তাই জীবনের প্রত্যুষেই তোমাদের খুঁজে বার করতে হবে, সত্যই তোমরা কী করতে ভালেবাসো, কোন কাজের প্রতি তোমাদের সত্যঅনুরাগ রয়েছে, আর এটাই নতুন সমাজ গড়ার একমাত্র পথ।

প্রশ্নকারী ঃ *অন্যান্য বেশীর ভাগ দেশের মতো ভারতেও শিক্ষা সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এমতাবস্থায় আপনার আলোচিত বিষয়গুলোর পরীক্ষা-*

নিরীক্ষা কি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব?

কৃষ্ণমূর্তি ঃ যদি সরকারের সাহায্য না পাওয়া যায় তবে এমন ধরণের স্কুল কি চলতে পারে? এটাই প্রশ্ন। যিনি প্রশ্নটা করলেন, তিনি দেখেন সারা পৃথিবী আরো-আরো বেশী করে সরকার দ্বারা, রাজনীতিবিদ দ্বারা, যাঁরা ক্ষমতায় আছেন তাঁদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাঁরা আমাদের মনকে, আমাদের হৃদয়কে একটা বিশেষ ছাঁচে ফেলতে চাইছেন। তাঁরা চান আমরা এক বিশেষ ধরণের চিন্তাভাবনাই করি। রাশিয়া বা অন্য যেকোনো দেশেই সরকার দেশের শিক্ষাপ্রণালীকে নিজেদের মতো করে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়। এখন কথা হচ্ছে আমি যে ধরণের স্কুল বা শিক্ষার কথা বলছি— সরকারের সাহায্য ছাড়া তার অস্তিত্ব সম্ভব কি না।

যদি আপনারা কোনো জিনিসকে সত্যি প্রয়োজনীয় মনে করেন, যদি সত্যিই তাকে মূল্যবান মনে করেন এবং তাতে নিজেদের সমগ্র হৃদয় ঢেলে দেন— তাহলে সমাজ বা সরকারের স্বীকৃতি বা সহায়তা থাকুক বা না থাকুক, সেটা ফলবান হবেই। কিন্তু আমাদের অধিকাংশই আমাদের হৃদয়, আমাদের মনপ্রাণ একসাথে কোনো কিছুতে ঢেলে দিই না আর তাই আমরা এমনতরো প্রশ্ন করি। যখন আপনি এবং আমি সত্যকার ভাবি যে এক নতুন পৃথিবী গড়া সম্ভব, যখন আমাদের মধ্যে মানসিক ও অ্যাধ্যাত্মিক বিপ্লব নিরন্তর চলতে থাকে— কেবল তখনই আমরা আমাদের হৃদয়, মন, আমাদের সমগ্র সত্তা দিয়ে এমন বিদ্যালয়ের নির্মাণ করি— যেখানে ভয়ের চিহ্নমাত্র থাকে না।

আসলে সত্যকার বিপ্লবাত্মক কিছু কিন্তু কিছু সংখ্যক ব্যক্তির দ্বারাই সৃষ্টি হয়। তাঁরা দেখেন সত্য কী এবং তারই আলোতে তাঁরা বাঁচেন। কিন্তু সেই সত্যের সন্ধান পেতে গেলে আপনাদের সকল পরম্পরা, সকল অতীত থেকে মুক্ত হতে হবে, আর এর অর্থ হলো সকল ভয় থেকে মুক্ত হতে হবে।

২

স্বাধীনতা

আজ আমি তোমাদের সাথে স্বাধীনতা বা মুক্ত হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করবো। এই জটিল সমস্যাটা গভীর পর্যবেক্ষণ এবং বোধ দাবী করে। ধর্মীয় স্বাধীনতা বা কোনো ব্যক্তির নিজের ইচ্ছানুযায়ী যা কিছু করার স্বাধীনতা, তথা স্বাধীনতা সম্পর্কে আমরা অনেক আলাপ-আলোচনাই শুনতে পাই। বুদ্ধিজীবীরাও এর সম্বন্ধে বইয়ের পর বই লিখে গেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় আমরা খুব সহজ সোজাসুজি ভাবে এই সমস্যাটাকে বোঝার চেষ্টা করলে সত্য সমাধানে পৌঁছোতে পারবো।

আমি ভাবি তোমরা কি চুপচাপ দাঁড়িয়ে, দিনান্ত সূর্যের শেষ অস্তরাগের ছোঁয়ায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠা পশ্চিমের আকাশকে আর তার সাথে ঐ গাছেদের একটু ওপরে সলজ্জ কিশোরী চাঁদকে কখনো দেখেছো? সেই নিবিড় মুহূর্তে নদী বড়ো শান্ত। সেতু, চলে যাওয়া ট্রেন, ক্ষীণ চাঁদ আর অন্ধকার ঘনতর হলে একে একে বেরিয়ে আসা দীপ্ত তারা— সব কিছু সে নদীর শান্ত জলে প্রতিফলিত হয়। সমগ্র সত্তা দিয়ে ঐ সৌন্দর্যকে দেখতে হলে— মনকে পুরোনো চিন্তার ঘূর্ণাবর্ত থেকে মুক্ত হতে হবে, তাই নয় কি? সমস্যা, দুশ্চিন্তা ও দূরকল্পনায় মন পূর্ণ থাকলে হবে না। যখন মন গভীরভাবে শান্ত তখনই তোমরা সত্যকার দেখতে পাও, লক্ষ্য করতে পারো; মনও কোনো

কিছুর অসাধারণ সৌন্দর্যের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে; হয়তো বা এখানেই আমাদের স্বাধীনতার বা মুক্তির সমস্যার সমাধান সূত্রটা রাখা আছে।

স্বাধীন হওয়ার অর্থ কী? এটা কি যা তোমাদের সুবিধা হয় তাই করলে, যেখানে যেতে ইচ্ছে হলো গেলে, যা ইচ্ছে হলো ভাবলে— সেটাই? অবশ্য এরকমটাই কিন্তু তোমরা করো। এই পৃথিবীতে অনেক ব্যক্তি স্বনির্ভর, কিন্তু খুব কম ব্যক্তিই স্বাধীন বা মুক্ত। মুক্ত হওয়া বা স্বাধীন হওয়ার অর্থ গভীর বোধসম্পন্ন বা মেধাসম্পন্ন হওয়া, তাই নয় কি? কিন্তু এই মেধা তোমরা চাইলেই আসে, তা নয়। যখন তোমরা তোমাদের চারিপাশের পরিবেশ; সামাজিক, ধর্মীয়, পিতামাতার এবং পরম্পরাগত যে প্রভাবগুলো তোমাদের সীমাবদ্ধ করে— তাদের বুঝতে শুরু করবে তখনই সেই মেধা লাভ করবে। পিতামাতার প্রভাব, সরকার, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব, ঈশ্বর, বিভিন্ন বিশ্বাস, কুসংস্কার ও বিভিন্ন পরম্পরাগত জিনিসগুলো— না ভেবে-চিন্তেই তোমরা মেনে নিয়েছো; এই সকল কিছুর প্রভাবকে বুঝতে গেলে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন। কিন্তু তোমরা ভীত বলে প্রথম থেকেই হার মেনে ঐ সব কিছুই করে চলেছো। জীবনে যদি প্রতিষ্ঠা না পাওয়া যায়, কোনো ব্যাপারে পুরোহিতের মতামত কী হতে পারে, পরম্পরাকে অনুসরণ না করলে কী হবে অথবা যদি কোনো ভুল কাজ করে ফেলো— এইসব বহু ব্যাপারে তোমরা ভীত। কিন্তু স্বাধীনতা মনের এমন একটা অবস্থা যেখানে ভয় নেই, কোনো বাধ্যবাধকতা, কোনো সুরক্ষিত থাকার ইচ্ছাও নেই।

আমাদের মধ্যে অধিকাংশই কি সুরক্ষিত থাকতে চাই না? আমরা অসাধারণ ব্যক্তি, আমরা অসাধারণ দেখতে ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন— এইসব কি আমরা অন্যের কাছ থেকে শুনতে ভালোবাসি না? যদি তা না হতো তাহলে আমরা আমাদের নামের পরে ঐ শব্দগুলো বসাতাম

না। ঐসব জিনিসগুলো আমদের একটা আত্মপ্রত্যয় দেয়, আমাদের যে একটা গুরুত্ব আছে— সেরকম একটা ভাব যোগায়। আমরা প্রত্যেকেই বিখ্যাত হতে চাই— আর যে মুহূর্তে আমরা কিছু হতে চাই, তখন আমরা আর মুক্ত নই।

এটা ভালো করে লক্ষ্য করো কারণ এটাই কিন্তু স্বাধীনতার সমস্যাকে বোঝার সত্যকার সমাধান সূত্র। রাজনীতিবিদের, ক্ষমতা, পদ বা কর্তৃত্বের পৃথিবী অথবা তথাকথিত আধ্যাত্মিক পৃথিবী— যেখানে তোমরা সদ্‌গুণসম্পন্ন, মহৎ বা সাধু হওয়ার চেষ্টা করো, সর্বত্রই— যে মুহূর্তে তোমরা বিশেষ কেউ হতে চাও, সেই মুহূর্তে তোমরা আর মুক্ত নও। এই বিশেষ কিছু একটাতে পরিণত হওয়ার অযৌক্তিকতা দেখতে পেলে হৃদয়ও থাকে সহজ, সরল এবং সেখানে অন্য কিছুতে পরিণত হওয়ার ইচ্ছে ক্রিয়াশীল থাকে না। তেমন মানুষই কিন্তু মুক্ত। যদি তোমরা এর সহজতাটা একবার উপলব্ধি করো, তখনই এর অভিনব সৌন্দর্য এবং এর গভীরতাটাও দেখতে পাবে।

আসলে পরীক্ষাগুলোর উদ্দেশ্যই তোমাদের প্রতিষ্ঠা দেওয়া, তোমাদের অন্য কিছু হতে সাহায্য করা। বিভিন্ন উপাধি, পদ এবং জ্ঞান তোমাদের পৃথক কিছু একটা হয়ে ওঠবার জন্য উৎসাহিত করে। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো কি— তোমাদের শিক্ষকেরা, পিতামাতারা জীবনে কিছু একটা হয়ে ওঠবার জন্য উৎসাহ দেন। তাঁরা বলেন, তোমাদেরও তোমাদের কাকা বা দাদুর মতো সফল হতে হবে। তোমরা নিজেরাও আবার কোনো আদর্শ পুরুষ, গুরু বা মহাত্মার আদর্শকে অনুসরণ করতে চাও। তাই তোমরা কখনই মুক্ত নও। যখন কোনো গুরু, মহাত্মা, শিক্ষক বা কোনো আত্মীয়কে অনুসরণ করা বা বিশেষ কোনো পরম্পরাকে আঁকড়ে ধরা থাকে, তখন এটা স্পষ্ট যে— তোমাকে কোনো কিছু একটা হতে হবে— এই ইচ্ছা তোমার মধ্যে ক্রিয়া করছে। যখন এই ব্যাপারটা তোমরা উপলব্ধি করো তখনই তোমরা মুক্ত হও।

সুতরাং, তোমাদের কাউকে অনুকরণে নয়, তোমরা যা সেই সহজ অবস্থায় থাকতে সাহায্য করাই হলো শিক্ষার কাজ। সে তুমি যাই হওনা কেন— সুন্দর, অসুন্দর, ঈর্ষাকাতর— সর্বদাই সেই অবস্থায় থেকে তাকে উপলব্ধি করাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। তোমরা মনে করো তোমরা যা— তা সাধারণ, তা সম্মানজনক নয়। তাই তোমাদের সেই অবস্থায় থাকাটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এইজন্য তোমরা ভাবো, তোমরা যদি নিজেদের কোনো মহান কিছুতে পরিণত করতে পারো ব্যাপারটা খুব ভালোই হবে— কিন্তু এমন কখনই ঘটে না। অপরপক্ষে আসলে তুমি যা— তাকে যদি দেখো, তাকে যদি উপলব্ধি করো, তবে সেই বোধ থেকেই এক রূপান্তর আসে। সুতরাং অন্য কিছু হওয়ার চেষ্টায়, যা করতে ইচ্ছে হলো সেটা করায়, কোনো একটা বিশেষ ঐতিহ্য বা পরম্পরা বা পিতামাতা বা কোনো গুরুর কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার মধ্যে কোনো স্বাধীনতা নেই। প্রতি মুহূর্তে তোমরা নিজে যা— তাকে উপলব্ধির মধ্যেই সেই স্বাধীনতা রয়েছে।

তোমরা কি দেখছে পাচ্ছো তোমাদের কিন্তু এরজন্য শিক্ষিত করা হয় না। নিজেকে উপলব্ধি নয়, কী করে অন্যকে অনুকরণ করা যাবে, অন্য কিছুতে পরিণত হওয়া যাবে— শিক্ষা তাতেই উৎসাহ দেয়। তোমাদের 'স্ব' (self) কিন্তু একটা খুব জটিল জিনিস। এই সত্তাটা এরকমই নয়— যে শুধু স্কুলে যায়, খেলে, ঝগড়া করে, ভয় পায়; এর মধ্যে আরো অনেক কিছু লুকানো, অনেক কিছু অস্পষ্ট, প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তোমরা যা-যা ভাবো শুধু তাই নিয়েই এ তৈরী নয়; বিভিন্ন লোকেরা, বই, সংবাদপত্র, নেতা ইত্যাদি— এরা সবাই মিলে তোমাদের মনে যা-যা ঢুকিয়েছে সবই ঐ সত্তার অংশ। আর এইসব উপলব্ধি করা তখনই সম্ভব, যখন তোমাদের অন্য কিছুতে পরিণত হওয়ার, কাউকে অনুসরণ বা অনুকরণ করার সমাপ্তি ঘটে। তার অর্থ তোমরা কিছুতে একটা পরিণত হওয়ার যে চেষ্টা— সেই ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

করেছো। এটাই কিন্তু সত্যকার বিপ্লব, এটাই সেই স্বাধীনতা বা মুক্তির পথে তোমাদের নিয়ে যায়। এমন স্বাধীনতার উন্মেষ ঘটানোই শিক্ষার সত্যকার ভূমিকা।

তোমাদের পিতামাতারা, তোমাদের শিক্ষকেরা আর তোমরা নিজেরাও কোনো কিছুর সাথে নিজেদের মিলিয়ে, একাত্ম হয়ে থাকতে চাও। কারণ তোমরা সুখ আর নিরাপত্তা চাও। কিন্তু বোধসম্পন্ন বা মেধাসম্পন্ন হতে গেলে, যেসব প্রভাবগুলো তোমাদের ঐ সকল কিছুর দাসত্ব করায়, তোমাদের আবদ্ধ করে, জীর্ণ করে, পেষণ করে— তাদের অতিক্রম করা কি সমীচীন নয়?

তোমাদের মধ্যে যারা দেখতে শুরু করে মিথ্যা কোনটা এবং তার বিরুদ্ধে বিপ্লব আনে, অবশ্য তা কথাবার্তায় নয়— বাস্তবিকই বিপ্লব আনে, তাদের মধ্যেই নতুন পৃথিবী গড়ার বীজ অঙ্কুরিত হয়। এইজন্য তোমাদের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। যখন তোমরা মুক্ত পরিবেশে বিকশিত হবে, তখনই তোমরা এক নতুন পৃথিবী গড়তে পারবে। কোনো বিশেষ পরম্পরা বা কোনো দার্শনিক বা কোনো আদর্শবাদীর বিশেষ চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্যের উপর সে নতুন পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপিত হবে না। কিন্তু যতক্ষণ তোমরা— কিছুতে একটা পরিণত হতে চেষ্টা করবে বা কোনো মহৎ উদাহরণকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করবে ততক্ষণ সেই মুক্তি, সেই স্বাধীনতা আসবে না।

প্রশ্নকারী ঃ *মেধা কী?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ আমরা এই প্রশ্নটার মধ্যে ধৈর্য্য সহকারে প্রবেশ করবো এবং অন্বেষণ করবো। কোনো বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার জন্য কিন্তু এই অন্বেষণ নয়। এর সূক্ষ্মতা বুঝতে পারলে কিনা জানিনা। যে মুহূর্তে তুমি মেধা কী— তার সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে এলে সেই মুহূর্তে তুমি আর মেধাসম্পন্ন নও। অধিকাংশ লোকেরা সেটাই

করেছেন, তাঁরা বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, আর সেইজন্যই তাঁরা মেধাসম্পন্ন নন। তাহলে তোমরা একটা জিনিস দেখতে পেলে ঃ মেধাসম্পন্ন মন হলো যে মন নিরন্তর শিখে চলেছে, কখনই কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছে স্থাণু হয়ে যাচ্ছে না।

মেধা কী? অধিকাংশ লোকই একটা সংজ্ঞা নিয়েই খুশী। হয় তাঁরা বলেন, 'আঃ কী দারুণ ব্যাখ্যা', নয়তো নিজস্ব প্রিয় ব্যাখ্যাতো রয়েছেই। যে মন শুধু ব্যাখ্যা নিয়েই সন্তুষ্ট তা খুবই উপরভাসা মন, অগভীর মন, আর সেইজন্যই সেই মন মেধাসম্পন্ন নয়।

তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছো মেধাসম্পন্ন মন কোনো ব্যাখ্যা, কোনো সিদ্ধান্তের দ্বারাই সন্তুষ্ট হয় না। এই মন কোনো বিশ্বাসকেও আঁকড়ে ধরে না, কারণ বিশ্বাস হলো এক ধরণের সিদ্ধান্ত। মেধাসম্পন্ন মন হলো এক অন্বেষী মন— সে মন অনুক্ষণ লক্ষ্য করছে, আর শিখছে। এর অর্থ— যখন ভয় নেই, যখন ঈশ্বর কী, পরম কী অথবা কোনো কিছুর সত্যতাকে খোঁজার জন্য তুমি সমাজের কাঠামোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত, যখন তুমি অন্তরের বিপ্লবে আগ্রহী, তখনই মেধা ক্রিয়াশীল।

মেধা কিন্তু জ্ঞান নয়। তোমরা পৃথিবীর যাবতীয় বইপত্র পড়ে ফেলতে পারো, কিন্তু এটা তোমাকে মেধা এনে দেবে না। এটা খুবই সূক্ষ্ম জিনিস, এ কখনও থেমে থাকে না। যখন তোমরা তোমাদের নিজস্ব মনের সমগ্র প্রক্রিয়াটি উপলব্ধি করবে (অবশ্যই কোনো দার্শনিক বা গুরুর মতামত অনুযায়ী নয়) তখনই মেধার উন্মেষ ঘটবে। তোমাদের মন (অতীত থেকে আজ অবধি) সমগ্র মানব মনের পরিণাম, আর তোমরা যখন এটা বুঝতে পারো তখন আর কোনো বই পড়ারই প্রয়োজন হয় না, কারণ মনতো সমগ্র অতীতের জ্ঞানকেই ধারণ করে রয়েছে, সুতরাং মেধা— নিজেকে অর্থাৎ 'স্ব'-কে উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই আসে, আর বিভিন্ন মানুষ, বিভিন্ন বস্তু, বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা-

ধারণার যে এই বিশ্ব— তার সাথে নিজের সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই নিজেকে বোঝা সম্ভব হয়। মেধা কিন্তু কোনো জ্ঞান লাভের মতো লাভ করা যায় না। এর আবির্ভাব এক মহত্তম বিপ্লবের সাথে ঘটে— এমন এক বিপ্লব— যেখানে ভয়ের কোনো অস্তিত্বই নেই। অন্যভাবে বলা যেতে পারে সেখানে এক প্রেমময় অবস্থা রয়েছে। কারণ, যেখানে ভয় নেই একমাত্র সেখানেই প্রেম প্রস্ফুটিত হতে পারে।

যদি তুমি কোনো সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা আশা করে থাকো তাহলে তোমার হয়তো মনে হবে আমি প্রশ্নটার উত্তর দিলাম না। এই প্রশ্নটা কেমন জানোতো— অনেকটা প্রশ্ন করা জীবন কী? জীবন অধ্যয়ন, জীবন খেলা, জীবন যৌন সহবাস, জীবন কর্ম-কলহ-ঈর্ষা-উচ্চাকাঙ্ক্ষা, জীবন প্রেম-সৌন্দর্য-সত্য— জীবন সব কিছু, তাই নয় কি? কিন্তু তোমরা দেখবে আমাদের অধিকাংশেরই ঐকান্তিকভাবে অবিরাম কোনো অন্বেষণকে চালিয়ে নিয়ে যাবার ধৈর্য্য নেই।

প্রশ্নকারী ঃ *রুক্ষ মন কি সংবেদনশীল মন হতে পারে?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ প্রশ্নটাকে ভালো করে শোনো, এর নিহিতার্থ বোঝার চেষ্টা করো। একটা রুক্ষ মন কি সংবেদনশীল হতে পারে? যদি আমি বলি আমার মন রুক্ষ এবং আমি সংবেদনশীল হতে চাই— এই প্রচেষ্টাটাই হলো রুক্ষতা। অধীর হয়ো না, একে লক্ষ্য করো। যদি আমি বুঝতে পারি আমি রুক্ষ এবং একে পরিবর্তন করে সংবেদনশীল হওয়ার চেষ্টা না করে, আমার প্রতিদিনকার জীবনকে লক্ষ্য করতে থাকি— কেমন লোভী, লোলুপ হয়ে আমি খাই, কেমন রুক্ষভাবে আমি মানুষের সাথে ব্যবহার করি, আমার গর্বিত ও উদ্ধত ভাব, আমার অমার্জিত চিন্তা ও অভ্যাস সব কিছু— তখন সেই পর্যবেক্ষণ, 'যা ভিতরে বর্তমান আছে' (what *is*) তার রূপান্তর আনে।

একইভাবে, যদি আমি বলি— আমি স্থূল, আমাকে বুদ্ধিমান হতে

হবে, তখন এই বুদ্ধিমান হওয়ার প্রচেষ্টা হলো— এক অধিকতর স্থূলতার লক্ষণ। আসলে স্থূলতাকে উপলব্ধি করতে হবে এবং সেটাই জরুরী। আমি যতই বুদ্ধিমান হওয়ার চেষ্টা করি না কেন, স্থূলতা থেকেই যাবে। আমি উপরে-উপরে হয়ত শিক্ষার চাকচিক্য আনতে পারি, বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে ও মহান লেখকদের লেখা থেকে বহু কিছু উদ্ধৃতও করতে পারি, কিন্তু ভিতরে আমার স্থূলতা থেকেই যাবে। কিন্তু এই স্থূলতা আমার প্রাত্যহিক জীবনে কীভাবে বার বার প্রকাশিত হয়— যেমন, আমার বাড়ীতে যিনি কাজ করেন আমি কীভাবে তাঁর সাথে ব্যবহার করি, আমি আমার প্রতিবেশী, একজন দরিদ্র কাউকে বা ধনী কাউকে বা একজন কেরানিকে কীভাবে গ্রহণ করি, কেমনভাবে তাঁদের সাথে ব্যবহার করি— এই সমস্ত কিছুকে লক্ষ্য করি ও সচেতন থাকি— সেই সচেতনতাই আমাকে স্থূলতা থেকে মুক্ত করে।

লক্ষ্য করো, যখন তুমি তোমাদের বাড়িতে যিনি কাজ করেন তাঁর সাথে কথা বলছো; লক্ষ্য করো, যখন তুমি যিনি প্রশাসনে আছেন তাঁর সাথে কী গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে কথা বলছো; লক্ষ্য করো, যে মানুষটার তোমাকে কিছুই দেবার নেই কতো স্বল্প সম্মান তাঁর জন্য তোমার কাছে আছে। এই সচেতনতার মধ্যে দিয়েই তুমি তোমার নিজের স্থূলতা আবিষ্কার করবে, আর এই উপলব্ধির সাথেই আসে বোধ, সংবেদনশীলতা। তোমাকে সংবেদনশীলতার জন্য চেষ্টা করতে হবে না। আসলে যে মানুষ এমনইভাবে কিছু হওয়ার জন্য চেষ্টা করছে সে-ই একজন শ্রীহীন, সংবেদনহীন রুক্ষ মানুষ।

প্রশ্নকারী ঃ *কী করে একজন শিশু তার বাবা-মা ও শিক্ষক ছাড়া খুঁজে পাবে— সে কী?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ আমি কি বলেছি সে পারবে, নাকি এটা আমি যা বললাম আপনি তার ব্যাখ্যা করলেন। শিশু যে পরিবেশে থাকে যদি সেই

পরিবেশ তাকে সাহায্য করে, তাহলে সে নিশ্চয়ই পারবে। যদি বাবা-মা এবং শিক্ষকেরা সত্যিই মনে করেন যে শিশু নিজে কী তা শিশুকে নিজেই আবিষ্কার করতে হবে, তাহলে তাঁরা তাকে কোনো বিষয়ে বাধ্য করবেন না, বরং এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যেখানে সে নিজেকে আবিষ্কার করবে।

আপনি এই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করেছেন, কিন্তু এটা কি সত্যিই আপনার কাছে জরুরী প্রশ্ন? যদি আপনি গভীরভাবে অনুভব করে থাকেন— শিশুর নিজেকে আবিষ্কার, নিজেকে উপলব্ধি করা খুবই প্রয়োজনীয় এবং যতক্ষণ কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণ থাকে সে সেটা করতে পারবে না, তবে কি আপনি এক মুক্ত পরিবেশ গঠনে সহায়তা করবেন না? আসলে এটা সেই গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গী— আমাকে বলুন কী করতে হবে, আমি তাই করবো। আমরা কখনো বলিনা 'আসুন আমরা সবাই মিলে এটা সৃষ্টি করি'। কী করে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবে যাতে শিশু নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে— এ ব্যাপারটার সাথে বাবা-মা, শিক্ষক এবং শিশু সবাই যুক্ত। আত্মোপলব্ধি কারোর উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না, বোধ জোর করে আনা যায় না। যদি এটা আমাদের কাছে জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে থাকে— তাহলে আপনি, আমি, শিশুর বাবা-মা ও শিক্ষকেরা সবাই মিলে এমন স্কুলই সৃষ্টি করবো।

প্রশ্নকারী ঃ *বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে গ্রামে তারা অদ্ভুত ঘটনা— যেমন ভূতে-ধরা বা ভর হওয়া এইসব দেখেছে এবং তারা ভূত-প্রেত এসবে ভয় পায়। তারা মৃত্যু সম্পর্কেও প্রশ্ন করে। কীভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ সময় মতো আমরা মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করবো। ভয় কিন্তু একটা অসাধারণ ব্যাপার। এই ভূত-প্রেত সম্বন্ধে তোমাদের বাবা-মা বা বয়স্ক কেউ অনেক কিছু বলেছেন, না হলে তোমরা কোনোদিন ভূত

দেখতে পেতে না। এই ভূত ভর করা সম্বন্ধে, কেউ-না-কেউ তোমাদের কিছু বলেছে। এইসব জানবার পক্ষে তোমরা খুবই ছোটো। এটা আদৌ তোমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা নয়, এটা বয়স্ক লোকেরা যা বলেছেন তারই প্রতিধ্বনি। বয়স্ক লোকেরা আবার অধিকাংশই এসব সম্পর্কে কিছু জানেন না। তাঁরা হয়তো কোনো বইপত্রে এসব সম্পর্কে পড়ে থাকবেন এবং ভাবেন তাঁরা ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছেন। এটা আর একটা প্রশ্নের জন্ম দেয় ঃ অতীত দ্বারা প্রভাবিত নয় এমন কি কোনো অভিজ্ঞতা (experience) হতে পারে? যদি কোনো অভিজ্ঞতা অতীত দ্বারা প্রভাবিত, তবে সেটা অতীত স্মৃতিরই বয়ে চলা প্রবাহ, তারই ভিন্ন রূপ— সেটা কোনো মৌলিক অভিজ্ঞতা বা অনুভব নয়।

যেটা জরুরী সেটা হলো আপনারা যাঁরা শিশুদের নিয়ে আছেন তাঁরা কখনোই নিজেরা ভূতের ব্যাপারে নিজেদের কল্পনা, বিশেষ চিন্তাভাবনা বা অভিজ্ঞতাগুলো শিশুদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেবেন না। এটা অবশ্য খুবই কঠিন ব্যাপার। বয়স্ক লোকেরা সাধারণত অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার নিয়ে কথা বলেন, যেগুলোর জীবনে কোনো প্রয়োজন নেই। ধীরে ধীরে নিজেদের জীবনের ভয়, উদ্বেগ এবং কুসংস্কারগুলোর কথা বাচ্চাদেরও বলতে থাকেন। বাচ্চারাও স্বভাবত যা শোনে তারই পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। বয়স্ক লোকেরা যাঁরা এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না তাঁদের উচিত বাচ্চাদের সামনে এই সব নিয়ে আলোচনা না করা। অপরপক্ষে তাঁদের এমন এক পরিবেশ নির্মাণে সাহায্য করা উচিত, যেখানে বাচ্চারা স্বাধীনতার সাথে, নির্ভয়তার সাথে বেড়ে উঠতে পারে।

৩

মুক্তি ও প্রেম

স্বাধীনতা বা মুক্তি বলতে আমি কী বোঝাতে চেয়েছি, তোমাদের মধ্যে অনেকই সম্পূর্ণভাবে তা বুঝতে পারো নি। যে ধরণের চিন্তা ভাবনায় তোমরা অভ্যস্ত নও তেমন নতুন কিছুর সংস্পর্শে আসা, উন্মুক্তভাবে তাদের দেখা খুবই প্রয়োজনীয়। জীবনের সুন্দর জিনিস-গুলোকে দেখা সত্যি ভালো, কিন্তু জীবনের শ্রীহীন জায়গাগুলোকেও দেখতে হবে, তথা তোমাদের সব কিছুর ব্যাপারেই সচেতন থাকতে হবে। যেসব ব্যাপার তোমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারো না, সেইসব কিছুর সংস্পর্শে আসতে হবে, কারণ যতো তোমরা ঐ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবে ততই জীবন গভীর হবে।

কোনোদিন কি খুব ভোরের নরম আলোকে জলের উপর দেখছো? কী কমনীয় সে আলো, কেমন করে অন্ধকার জল তার স্পর্শে নেচে ওঠে? তখনও গাছেদের ওপারে শুকতারা দেখা যায়, সারা আকাশে সে একা জেগে আছে। কখনও কী এদের দেখো, নাকি ব্যস্ত, রোজকার বাঁধা ছক নিয়ে এতো ব্যস্ত যে, যে পৃথিবীতে আমরা সবাই থাকি, যে পৃথিবীতে আমাদের থাকতে হবে তার অনন্য সৌন্দর্যকেই দেখতে ভুলে যাও, অথবা তার সৌন্দর্যকে কোনোদিন অনুভবই করোনি। আমরা নিজেদের সাম্যবাদী, পুঁজিবাদী, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলমান— যা খুশি ভাবতে পারি; আমরা অন্ধ, খঞ্জ হতে পারি অথবা

সুন্দর, সুখীও হতে পারি, তথা আমরা যাই হই না কেন— এ কিন্তু আমাদেরই পৃথিবী। এটা বিশেষ কারোর পৃথিবী নয়; কোনো ধনী বা শক্তিশালী শাসকেরও পৃথিবী এটা নয়। যদিও আমরা গণ্যমান্য কেউ নয়, তবু আমরা এই পৃথিবীতে থাকি আর আমাদের একসাথেই থাকতে হবে। এটা ধনী-দরিদ্র-শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের পৃথিবী— এটা আমাদের পৃথিবী। কালেভদ্রে কোনো এক শান্ত সকালে একে অনুভব করা বা একে ভালোবাসা নয়— সবসময় সেই অনুভব, সেই ভালোবাসা যেন থাকে। যখন আমরা বুঝতে পারবো সত্যকার স্বাধীনতা বা মুক্তি কী— তখনই আমরা অনুভব করবো এ আমাদের পৃথিবী, এবং একে ভালোবাসতে পারবো।

বর্তমান সময়ে স্বাধীনতা বা মুক্তি বলে কোনো কিছুর অস্তিত্বই নেই। আমরা জানিই না এর অর্থ কী? আমরা মুক্ত বা স্বাধীন হতে চাই— কিন্তু যদি একটু লক্ষ্য করো দেখবে— শিক্ষক, পিতামাতা, উকিল, পুলিশ, সৈনিক, রাজনীতিবিদ বা ব্যবসায়ী বা যেই হোন— তাঁরা তাঁদের ক্ষুদ্র পরিসরে এমন কিছু করছেন, যা স্বাধীনতাকেই প্রতিহত করে। স্বাধীন মানে এই নয়— যা খুশী হলো করলাম অথবা বাহিরের যে পরিস্থিতি বন্ধন সৃষ্টি করে তাকে ভেঙ্গে ফেললাম। বরং বোঝা জরুরী নির্ভরশীলতার অর্থ কী। তোমরা কি জানো নির্ভরশীলতার অর্থ কী? তোমরা তোমাদের বাবা-মায়ের উপর নির্ভর করো, তাই নয় কি? তোমরা— শিক্ষক, তোমাদের জন্য যিনি রান্না করেন, যিনি তোমাদের দুধ এনে দেন, পোস্টম্যান ইত্যাদি অনেকের উপর নির্ভর করো। এমন নির্ভরতার ব্যাপারটা খুব সহজেই বোঝা যায়। আর এক গভীরতর নির্ভরতা রয়েছে। নিজের পরিতৃপ্তির জন্য, নিজের সুখের জন্য অন্যের উপর নির্ভরতা। মুক্ত হওয়ার আগে এই নির্ভরতা কী সেটা বুঝতে হবে। নিজের সুখ, নিজের তৃপ্তির জন্য অন্যের উপর নির্ভরতার অর্থ কি তোমরা জানো? এটা কেবল অন্যের উপর বাহিরের

ব্যাপারে নির্ভরতাই নয় যেটায় আমরা বাঁধা পড়ি, এ এক আভ্যন্তরীণ মানসিক নির্ভরতা— যা থেকে আমরা তথাকথিত সুখ আহরণ করি। এইভাবে যখন কারোর উপর নির্ভর করি তখন আমাদের দাসত্বের শুরু হয়। যখন তোমরা বড়ো হচ্ছো, তখন যদি বাবা, মা, স্বামী, স্ত্রী, গুরু বা বিশেষ ভাবধারার প্রতি আবেগপ্রবণ হও ও নির্ভর করতে থাকো— তাহলে সেখান থেকে কিন্তু বন্ধনের শুরু হলো। যদিও আমরা যখন নবীন আমরা সকলেই স্বাধীন হতে বা মুক্ত হতে চাই, কিন্তু আমরা ঐ সহজ সত্যটা বুঝতে পারি না।

মুক্ত হতে গেলে আভ্যন্তরীণ নির্ভরতার বিরুদ্ধে বিপ্লব প্রয়োজন। অবশ্যই আমরা কেন নির্ভর করি সেটা না বুঝতে পারলে এই বিপ্লব সম্ভব নয়। সেই আভ্যন্তরীণ নির্ভরতাকে উপলব্ধি এবং তার সমাপ্তির মধ্যে দিয়েই মুক্তি আসে। কিন্তু মুক্তি কোনো প্রতিক্রিয়া নয়। তোমরা কি জানো প্রতিক্রিয়ার অর্থ কী? আমি এমন কিছু বললাম তুমি আঘাত পেলে, আমি এমন কোনো অপশব্দ তোমার সম্পর্কে ব্যবহার করলাম তুমি রেগে উঠলে— এটাই হলো প্রতিক্রিয়া। নির্ভরতা থেকে এই প্রতিক্রিয়া আসে; আবার তার থেকে স্বতন্ত্রতা বা স্বনির্ভরতার একটা প্রতিক্রিয়া আসে। কিন্তু স্বাধীনতা কোনো প্রতিক্রিয়া নয়। যতক্ষণ না আমরা প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি এবং তাকে অতিক্রম করছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কখনই মুক্ত নয়।

তোমরা কি জানো কাউকে ভালোবাসা মানে কী? কোনো গাছকে, কোনো পাখীকে, কোনো পোষা প্রাণীকে ভালোবাসা— যদিও জানো তার প্রতিদানে সে তোমাদের কিছুই ফিরিয়ে দেবে না, ছায়া দেবে না, সঙ্গ দেবে না, তোমাদের উপর নির্ভর করবে না, তবুও তোমরা তাকে খাওয়াও, যত্ন নাও, তাকে লালন করো— তোমরা কি এর অর্থ জানো? আমাদের মধ্যে অধিকাংশই এভাবে ভালোবাসি না। আমাদের ভালোবাসায় উদ্বেগ, ঈর্ষা, ভয় এইসব জড়িয়ে থাকে— যার অর্থ

আমরা ভিতরে-ভিতরে অন্যের উপর নির্ভর করি, আমরা অন্যের কাছে থেকে ভালোবাসা পেতে চাই। আমরা কাউকে ভালোবেসে সেখানেই সেটার শেষ করি না— আমরা প্রতিদানে কিছু চাই, এবং এই চাওয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ি।

সুতরাং স্বাধীনতা বা মুক্তি এবং প্রেম যুগপৎ চলে। প্রেম কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া নয়। যদি আমি তোমাকে ভালোবাসি কারণ তুমি আমাকে ভালোবাসো— এমন হয়, তবে সেটা একটা ব্যবসার মতো হয়ে গেল, এ যেন হাটে-বাজারেও পাওয়া যাবে এমন কোনো বস্তু। এটা কিন্তু প্রেম নয়। প্রেম হলো প্রতিদানে কিছু না চাওয়া— এমনকী, কিছু যে দিচ্ছো তেমন অনুভব বা বোধও না থাকা— সেই প্রেমই জানে স্বাধীনতার সৌরভ। তোমাদের কিন্তু এসব কিছুর জন্য শিক্ষিত করা হয় না। তোমাদের গণিত, রসায়ন, ভূগোল, ইতিহাস— এইসব শেখানো হচ্ছে এবং সেখানেই তার শেষ। কারণ তোমাদের পিতামাতারা তোমরা যাতে একটা ভালো চাকুরি পাও আর জীবনে সফল হও সেই ব্যাপারেই আগ্রহী। তাঁদের যদি আর্থিক অবস্থা ভালো হয়, তবে হয়তো তাঁরা তোমাদের বিদেশে পাঠাবেন। কিন্তু ভিতরের আসল উদ্দেশ্যটা হলো তোমরা যাতে ধনী হও, সমাজে সম্মানের সাথে প্রতিষ্ঠিত হও। অন্যদিকে তোমরা যত উপরে উঠতে থাকো ততই অন্যের জন্যে দুর্দশা সৃষ্টি করতে থাকো, কারণ তোমাকে উচ্চে পৌঁছোতো হলে প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। অনেক বেশী কঠোর, নির্মম হতে হয়। সুতরাং পিতামাতারা তাঁদের সন্তানদের সেইসব স্কুলেই পাঠাতে চান যেখানে ভালোবাসা নেই, আছে উচ্চাকাঙ্ক্ষার উসকানি আর প্রতিযোগিতার ঘোড়দৌড়। সেই কারণেই আমাদের সমাজ প্রতিনিয়ত ক্ষয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ চলছে। এর মধ্যে যদিও রাজনীতিবিদরা, বিচারকরা অথবা তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত মানুষেরা শান্তির কথা বলছেন কিন্তু সত্যিই সেগুলো কোনো অর্থই বহন করে না।

এখন তোমরা এবং আমি এক সাথে এই স্বাধীনতার ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করবো। আমাদের নিজেদের জন্যই এটা খুঁজে বার করতে হবে ভলোবাসা কী, কারণ যদি ভালোবাসা না থাকে তবে আমরা কোনোদিন বিচারশীল, সচেতন বা সহানুভূতিসম্পন্ন হতে পারবো না। এই সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া মানে তোমরা কি জানো? কোনো এক পথে, যেখান দিয়ে অনেক মানুষ খালি পায়ে চলাচল করেন, সেই পথে তুমি যদি কোনো ধারালো পাথর পড়ে থাকতে দেখো, তুমি সেখান থেকে সেটা সরিয়ে দাও। কেউ তোমাকে কিন্তু সরাতে বলেনি— কিন্তু তুমি অন্যের জন্য অনুভব করো— সেই অন্যকে তুমি চেনো না, জানো না, হয়তো কোনোদিন তার সাথে তোমার দেখাও হবে না। একটা গাছ লাগানো, তাকে যত্নে বড়ো করে তোলা, বহমান নদীকে দেখা আর এ পৃথিবীর পূর্ণতাকে, তার বৈভবশালিতাকে অনুভব করা, কোনো পাখীর উড়ে যাওয়া, ডানা মেলে তার ভাসার সৌন্দর্যকে অনুভব করা, প্রতি মুহূর্তের এই যে অসাধারণ প্রবাহ যার নাম জীবন তার প্রতি উন্মুখ থাকা, সংবেদনশীল থাকা— এইসব কিছুর জন্য চাই মুক্তি, আর মুক্ত হতে গেলে তোমাদের ভালোবাসতেই হবে। প্রেমের বিহনে মুক্তি নেই, প্রেমহীন অবস্থায় মুক্তি বা স্বাধীনতা একটা অর্থহীন ধারণা। তাই যারা আভ্যন্তরীণ নির্ভরতাকে বুঝে তাকে সমাপ্ত করবে, ফলত বুঝতে পারবে প্রেম কী— তারাই মুক্ত। তারাই এক নতুন সভ্যতা, এক অন্য ভুবনের জন্ম দেবে।

প্রশ্নকারী ঃ *কামনার উৎপত্তি কোথা হতে হয়, কী করে আমি এর থেকে মুক্ত হবো?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ একজন যুবক এ প্রশ্ন করছে। কেন সে ইচ্ছা বা কামনা থেকে মুক্ত হতে চাইছে? একজন যুবক, যৌবনের আশীর্বাদে যে পূর্ণ— কেন সে ইচ্ছা থেকে মুক্ত হবে? তাকে বলা হয়েছে কামনাশূন্য

হওয়াই হলো মহত্তম সদ্‌গুণ। এই কামনাশূন্য হওয়ার পথ দিয়ে ঈশ্বরোপলব্ধি হবে, অথবা চরম অবস্থাতে থাকার উপলব্ধি আসবে। ফলত সে এই প্রশ্ন করছে ঃ 'কামনার মূল কারণ কী, কী করে এর থেকে মুক্তি পাবো' ? কিন্তু বাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছাও বাসনারই একটা অংশ, তাই নয়কি ? প্রশ্নটা আসলে ভয় দ্বারা প্রেরিত।

কামনার উৎস কী ? তোমরা আকর্ষণীয় কোনো কিছু দেখো, সেটা চাও। তোমরা একটা গাড়ি বা একটা নৌকা প্রভৃতি দেখো, আর সেটার অধিকার চাও অর্থাৎ তোমার কাছে ঐসব থাকুক। তোমরা ধনী ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা চাও অথবা সন্ন্যাসী হতে চাও। এটাই চাওয়ার উৎস— কিছু দেখা— সঙ্গে সঙ্গেই তার সাথে তোমার একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়— সেখান থেকে সংবেদনা (Sensation) আসে আর সেই সংবেদনা থেকে কামনা আসে। এখন এই যে কামনা— এটা দ্বন্দ্ব আনছে, সংঘর্ষ আনছে— এটা বুঝতে পেরে তোমরা জিজ্ঞাসা করো, 'কী করে কামনা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে ?' আসলে তোমরা কামনা থেকে কিন্তু মুক্ত হতে চাও না। কামনা যে উদ্বেগ, যে উৎকন্ঠা, যে অচরিতার্থতার পীড়া নিয়ে আসে— তার থেকে মুক্ত হতে চাও। তোমরা কামনার তিক্ত পরিণাম থেকে মুক্তি চাও কিন্তু কামনা থেকে মুক্তি চাও না, এটা বোঝা সত্যিই জরুরী। তোমরা যদি কামনা থেকে তার চরিতার্থতার জন্য সংঘর্ষ, অতৃপ্তিবোধ, তার জ্বালা, উৎকন্ঠাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তার পরিতৃপ্তি, তার প্রসন্নতাকে উপভোগ করতে পারো— তখনও কি তোমরা একইভাবে কামনা থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলবে ?

যতক্ষণ কিছু লাভ করা, কোনো লক্ষ্যে পৌঁছোনো, কিছুতে একটা পরিণত হওয়া থাকে— সে যে কোনো স্তরেই হতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভয়, উৎকন্ঠা, দুঃখ থাকবে। ধনী হওয়ার বা যে কোনো কিছুতে একটা পরিণত হওয়ার কামনা তথা যে কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষাই হোক,

যখন আমরা উচ্চাকাঙ্ক্ষার পচনশীল, দূষিত স্বরূপটা দেখতে পাই, তখনই এর সমাপ্তি ঘটে। প্রধানমন্ত্রী, বিচারক, পুরোহিত বা গুরুর ক্ষমতা অর্থাৎ তা যে কোনো রূপেই হোক না কেন— এই ক্ষমতার জন্য কামনা অশুভ— এই সহজ সত্যটা যে মুহূর্তে আমরা দেখতে পাই, তখনই ক্ষমতালাভের কামনা লুপ্ত হয়। কিন্তু আমরা আসলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে সব কিছুকে দূষিত করছে, ক্ষমতার জন্য লোভ যে অশুভ সেটা দেখতে পাই না; বরং আমরা বলি আমরা ক্ষমতাটা অন্যের ভালোর জন্য ব্যবহার করবো— ওটা একেবারে মূঢ়তা। ভুল উপায় কোনোদিন কোনো সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় না। যদি পথটাই অসৎ হয়, অশুভ হয়— পরিণামও তাই হবে। সৎ কোনোদিন অসৎ-এর বিপরীত নয়। সত্তায় সৎ-এর উদ্বোধন তখনই হয় যখন অসৎ সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন।

সুতরাং যদি আমরা কামনার সম্পূর্ণ গুরুত্ব ও তার পরিণামসহ তার সৃষ্ট সব কিছুকে উপলব্ধি না করি, তবে শুধুমাত্র কামনা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টার কোনো অর্থ থাকে না।

প্রশ্নকারী ঃ *যতক্ষণ আমরা সমাজে বসবাস করছি, ততক্ষণ কী করে আমরা এই নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হবো?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ তোমরা কি জানো সমাজ কী? মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কই হলো সমাজ। একে জটিল কোরো না, বিভিন্ন বই থেকে সংজ্ঞাও উদ্ধৃত কোরো না। খুব সহজভাবে ভাবো, দেখো— তোমার আমার ও অন্যদের মধ্যের সম্পর্কই হলো সমাজ। মানুষের সম্পর্কই সমাজ তৈরী করে। আমাদের বর্তমান সমাজ— সর্বক্ষেত্রে অধিকারের ও সংগ্রহের তীব্র আকাঙ্ক্ষা যে ধরণের সম্পর্ক তৈরী করে, তেমন সম্পর্কের উপরই ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা অধিকাংশই চাই অর্থ, ক্ষমতা, সম্পদ, অন্যের উপর কর্তৃত্ব। যেকোনো স্তরেই হোক,

যেকোনো রূপেই হোক আমরা পদমর্যাদা, প্রতিষ্ঠা ও সম্মান চাই। সুতরাং আমরা স্বত্ব-স্বামিত্ব অর্জনের তীব্র ইচ্ছায় পূর্ণ এক সমাজ তৈরী করেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে পদমর্যাদা, সম্মান, ক্ষমতা প্রভৃতির তীব্র লিপ্সা থাকবে, ততক্ষণ আমরা এই সমাজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত এবং এর উপর নির্ভরশীল। যদি কেউ এই সবের কিছুই না চায়, সহজাতভাবে সে যা— বিনম্রতার সাথে তেমনই থাকে, তখন সে এইসব কিছুর বাইরে, তখন তার মধ্যে এক বিপ্লব আসে এবং এই বর্তমান সমাজ থেকে সে মুক্ত হয়।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যই হলো— এই স্বত্ব-স্বামিত্বলিপ্সু সমাজের সাথে তোমরা যাতে মানিয়ে নিতে পারো, কোনো এক বিরাট যন্ত্রের কোনো ক্ষুদ্র অংশের মতো এই সামাজিক কাঠামোয় যেন ঠিকঠাক একটা অংশ হয়ে থাকতে পারো— তারই জন্য তৈরী করা। তোমাদের পিতামাতা, তোমাদের শিক্ষকেরা, তোমাদের যাবতীয় বইপত্র এই কাজেই লেগে আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মানিয়ে নেবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অর্জনেচ্ছু, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেদের ক্ষমতা আর প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যদের কলুষিত করবে, নষ্ট করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একজন সম্মানীয় নাগরিক হিসাবে পরিগণিত হবে। তোমরা যাতে এই সমাজদেহের একটা লাগসই অঙ্গ হতে পারো তারজন্য তোমাদের শিক্ষিত করা হয়। এটা তোমাদের সমাজের অনুকূল করে গড়ে তোলার একটা প্রক্রিয়া। কিন্তু এটা তো শিক্ষা নয়। শিক্ষার প্রকৃত ভূমিকা তোমাদের একটা কেরানি বা কোনো বিচারক অথবা প্রধানমন্ত্রী তৈরী করা নয়। বরং এর কাজ হলো এই রুগ্ন, ক্ষয়িত সমাজের পুরো কাঠামোটাকে বুঝতে এবং মুক্তভাবে তোমাদের বেড়ে উঠতে সাহায্য করা। এই পথেই তোমরা এই সমাজ থেকে মুক্ত হবে এবং এক অন্য সমাজ, এক নতুন পৃথিবী গড়ে তুলবে। যারা পুরাতনের বিরুদ্ধে আংশিক নয়, এক পূর্ণ বিপ্লব

করবে এমন মানুষের প্রয়োজন, কারণ তারাই এমন এক পৃথিবী গড়বে— যা অধিকার, ক্ষমতা ও সম্মানের লিপ্সার উপর ভিত্তি করে হবে না। তা হবে সম্পূর্ণ এক নতুন পৃথিবী।

আমি বয়োজ্যেষ্ঠদের বলতে শুনি 'ওসব সম্ভব নয়, মানুষের প্রকৃতি যেমন আছে তেমনই থাকবে, এইসব আলোচনার কোনো মানেই হয় না'। কিন্তু আমরা কখনই বয়স্কদের সংস্কারমুক্ত করা আর শিশুদের সংস্কারে আবদ্ধ না করার কথা ভাবিনি। শিক্ষা নিরাময়েরও কাজ করে আবার প্রতিরোধকেরও কাজ করে। তোমরা যারা বয়স্ক ছাত্র তাদের মন ইতিমধ্যেই একটা আকার নিয়ে নিয়েছে, সংস্কারাবদ্ধ হয়ে গেছে, তোমরা এখন থেকেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তোমরা তোমাদের বাবার বা গভর্নর বা অন্য কারোর মতো সফল হতে চাও। সুতরাং শিক্ষার সত্যকার কাজ শুধুমাত্র সংস্কারাবদ্ধতার অসুস্থতা নিরাময়ই নয়— যাতে তোমরা মুক্তভাবে বড়ো হতে পারো, এক নতুন পৃথিবী গড়তে পারো— তারজন্য প্রতিদিনকার জীবনের সমগ্র প্রক্রিয়াটি বুঝতে সাহায্য করা। ঐ নতুন পৃথিবী কিন্তু এই বর্তমান পৃথিবী থেকে সব অর্থেই ভিন্ন হবে। দুর্ভাগ্যবশত, না তোমাদের বাবা-মা, না শিক্ষক, না সাধারণ মানুষ— কেউই এই ব্যাপারে আগ্রহী নন। সেইজন্যই শিক্ষা যেন শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়কেই শিক্ষিত করার একটা প্রক্রিয়া হয়।

প্রশ্নকারী : *মানুষ লড়াই করে কেন?*

কৃষ্ণমূর্তি : বলতো বাচ্চা ছেলেরা মারামারি করে কেন? তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে বা এখানে অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে মারামারি করো— তাই নয় কি? কেন? তোমরা খেলনা নিয়ে মারামারি করো। হয়তো অন্য কোনো ছেলে তোমার বলটা নিয়ে নিয়েছে বা বইটা নিয়ে নিয়েছে আর সেইজন্যই লড়াই শুরু হয়। বয়স্করা ঠিক একই কারণে মারামারি করেন। কেবলমাত্র তাদের খেলার পুতুলগুলো আলাদা— সেগুলো

হলো ক্ষমতা, পদ, মর্যাদা ও অর্থ ইত্যাদি। তুমি একটা কোনো ক্ষমতা চাও, আমিও সেই ক্ষমতা চাই— তোমাতে আমাতে বাধলো লড়াই। এইজন্যই বিভিন্ন দেশও লড়াই করে। এটা একেবারে জলের মতো সহজ; শুধু শুধুই দার্শনিকরা, রাজনীতিবিদরা, ধর্মীয় লোকেরা একে জটিল করে তোলেন। একটা কথা জেনো— প্রগাঢ় জ্ঞান, অগণন অভিজ্ঞতা থাকা— জীবনের সমৃদ্ধিকে, অস্তিত্বের সৌন্দর্যকে, সব সংগ্রাম, সব দুর্দশাকে, হাসিকে, কান্নাকে নিবিড়ভাবে জানা অথচ মনকে খুব সরল রাখা কিন্তু এক মহত্তম শিল্প। আর যখন তুমি কী করে ভালোবাসতে হয় জানতে পারো, তখনই মন হয় সহজ, সরল।

প্রশ্নকারী ঃ *ঈর্ষা কী?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ ঈর্ষার অর্থ, তুমি যা— তা নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট নও এবং অন্যের অবস্থা দেখে নিজের ভিতরে একটা জ্বলন, তাই নয় কি ? তোমার অবস্থা নিয়ে তুমি অখুশি, অতৃপ্ত— এটাই ঈর্ষার গোড়ার কথা। তোমাদের থেকে যার জ্ঞান বেশী, যে বেশী সুন্দর, যার বড়ো বাড়ি আছে, যার বেশী ক্ষমতা আছে, যে উচ্চপদে আছে, তোমরা তার মতো হতে চাও। তোমরা সদ্‌গুণসম্পন্ন হতে চাও, কী করে আরো সফলতার সঙ্গে ধ্যান করা যাবে— তা জানতে চাও, তোমরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে চাও। আসল কথা হলো তোমরা ঠিক যা— তার থেকে অন্য কিছু হতে চাও। সেইজন্যই তোমরা ঈর্ষান্বিত, সেইজন্যই তোমরা পরশ্রীকাতর। তোমরা নিজেরা ঠিক কী— সেটা উপলব্ধি করা কঠিন; তার কারণ এই উপলব্ধির জন্য তোমরা যা, তার থেকে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা থেকে তোমাদের সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে। নিজেকে অন্য কিছুতে পরিণত করার যে আকাঙ্ক্ষা, সেটাই ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতার জন্ম দেয়। তোমরা নিজেরা ঠিক যা— তাকে উপলব্ধি করলে কিন্তু সেই অবস্থার রূপান্তর ঘটে। কিন্তু দেখবে

তোমাদের সমগ্র শিক্ষা, তোমরা নিজেরা যা— তার থেকে অন্য কিছুতে পরিণত হবার জন্যই তোমাদের প্রেরণা দেয়। তোমরা যখন ঈর্ষান্বিত, তোমাদের বলা হয়, 'পরশ্রীকাতর হয়ো না। ওটা একেবারেই ভালো কিছু নয়'। তখন তোমরা ঈর্ষান্বিত না হওয়ার চেষ্টা চালাও, কিন্তু এ চেষ্টা ঈর্ষারই একটা অংশ— কারণ তোমরা অন্যরকম কিছু হতে চাইছ।

দেখো, একটা সুন্দর গোলাপ সুন্দর গোলাপই থেকে যায়। কিন্তু মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা আছে এবং আমরা ভুলভাবে চিন্তা করি। 'কীভাবে' চিন্তা করতে হয়— সেটার জন্য গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বোধের প্রয়োজন, কিন্তু 'কী' চিন্তা করতে হবে সেটা অপেক্ষকৃত সহজ। আমাদের বর্তমান যে শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে এটা শুধু তোমাদের বলে— কী চিন্তা করতে হবে। কীভাবে চিন্তা করতে হবে, কীভাবে গভীর স্তরে পৌঁছোতে হবে, কীভাবে অন্বেষণ করতে হবে— এসব কিন্তু তা শেখায় না। যখন শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েই জানে কীভাবে ভাবতে হয়, তখন বিদ্যালয় সত্য অর্থেই বিদ্যালয় হয়ে ওঠে।

প্রশ্নকারী ঃ *কেন আমি কখনও কোনো কিছুতেই সন্তুষ্ট নই?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ একটি ছোট্ট মেয়ে এই প্রশ্নটি করছে। আমি নিশ্চিত, অন্য কেউ তাকে দিয়ে এ প্রশ্নটা করায়নি। জীবনের প্রত্যুষেই সে জানতে চায়, কেন সে কোনো কিছু নিয়েই সন্তুষ্ট নয়। এই ব্যাপারে আপনারা যাঁরা বয়স্করা রয়েছেন— তাঁদের বক্তব্য কী? এটা আপনাদেরই তৈরী।

আপনারা এমন এক পৃথিবী তৈরী করলেন, যেখানে একটা ছোট্ট মেয়েকে জিজ্ঞাসা করতে হয়— কেন সে কোনো কিছুই নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। আপনারা কিন্তু শিক্ষক, অথচ এই প্রশ্নের বেদনাদায়ক জায়গাটা আপনারা লক্ষ্য করেননি। আপনারা ধ্যান করেন, কিন্তু আপনারা স্থূল, চিন্তাগ্রস্থ, অন্তরের দিক থেকে মৃত।

মানুষ কেন কখনই সন্তুষ্ট নয়? তারা কি সবসময় সুখই খুঁজছে না

এবং তারা কি এটাই ভাবছে না— যে সদাসর্বদা একটা পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা সুখী হবে? তারা একটা চাকরি থেকে আর একটা চাকরিতে, একটা সম্পর্ক ভেঙ্গে আর একটা সম্পর্কে প্রবেশ করছে, একটা ধর্ম বা একটা ভাবধারা ছেড়ে অন্য ধর্ম বা অন্য ভাবধারা গ্রহণ করছে। এইভাবেই তারা ভাবছে যে অবিরাম পরিবর্তনের মধ্যেই তারা সুখ খুঁজে পাবে। কেউ কেউ আবার, জীবনের প্রবাহ যেখানে পৌঁছোয় না— এমনই এক জায়গা খুঁজে নিয়ে সেখানেই আবদ্ধ হয়ে রয়ে যাচ্ছে। আসলে সন্তোষ কিন্তু একবারেই অন্য জিনিস। যখন তোমরা নিজেরা যা, তাকে কোনো পরিবর্তনের চেষ্টা না করে, তাকে দোষ না দিয়ে, সেটা খারাপ এইসব না বলে, তার সাথে অন্য কোনো অবস্থার তুলনা না করে— তাকে দেখো, তখন সেই সন্তোষ তোমাদের নিজ অস্তিত্বে দেখা দেয়। এইভাবে দেখা মানে কিন্তু যা দেখছো তাকে স্বীকার করে নেওয়া এবং তার প্রতি চোখ বন্ধ রাখা বা ঘুমিয়ে যাওয়া নয়। যখন মন (নিজের অবস্থার সাথে অন্য কোনো অবস্থার) তুলনা করে না, ঠিক না ভুল এমন কোনো অভিমত প্রকাশ করে না, কোনো মূল্যায়ন করে না— আর সেইজন্যই প্রতিক্ষণে নিজের মধ্যে 'যা বর্তমান রয়েছে' তাকে কোনো পরিবর্তনের অভিলাষ ছাড়াই দেখতে পারে— তখন সেই শুদ্ধ দৃষ্টিতেই শাশ্বত বিরাজ করে।

প্রশ্নকারী ঃ *পড়াশুনা করা কেন জরুরী?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ শান্ত হয়ে শোনো। তোমরা কোনোদিন— কেন খেলা উচিত, কেন খাওয়া উচিত, কেন কোনো নদীর দিকে দেখো, কেন কোনো ব্যাপারে নিষ্ঠুর হও— এ প্রশ্ন কিন্তু একবারও করো না, তাই নয় কি? তোমরা যখন কোনো জিনিস করতে ভালোবাসো না, তখনই তোমরা বিদ্রোহ করো, তখনই প্রশ্ন করো— কেন তোমাদের ঐ বিশেষ জিনিসটা করা উচিত। কিন্তু পড়া, হাসা, নির্মম হওয়া, উদার হওয়া,

নদীর দিকে দেখা, মেঘকে দেখা— এগুলো তো সবই জীবনের অংশ। কিন্তু যদি তুমি নাই জানো কীভাবে পড়তে হয়, কীভাবে চলতে হয়, যদি তুমি একটা পাতার সৌন্দর্যকে না দেখো, সে সৌন্দর্যকে অনুভব না করো, তবে তাকে বাঁচা বলে না। তোমাদের জীবনের সমগ্রতাকে অনুভব করতে হবে, তার কোনো এক ক্ষুদ্র অংশকে শুধু বুঝলেই চলবে না। সেইজন্যই তোমাদের পড়তে হবে, সেইজন্যই তোমাদের নিঃসীম আকাশকে দেখতে হবে, সেইজন্যই তোমাদের গান গেয়ে উঠতে হবে, নাচতে হবে, কবিতা লিখতে হবে, সেইজন্যই তোমাদের প্রাণকে তাপিত হতে হবে এবং এইসব কিছুকে উপলব্ধি করতে হবে, কারণ এইসব কিছু হলো জীবন।

প্রশ্নকারী ঃ *সঙ্কোচ কী?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ যখন কোনো অচেনা মানুষের সাথে দেখা হয় তখন কি সংকোচ বোধ করো না? যখন তুমি প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করছিলে অথবা যদি তোমাকে আমার মতো মঞ্চে বসতে হয়, আর কথা বলতে হয়— তবে কি সংকোচ বোধ করবে না? যখন কোনো অদ্ভুত সুন্দর গাছের সাথে তোমার দেখা হয়, অথবা যখন একটা নরম ফুল বা একলা পাখীকে তার নীড়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে দেখো, তখনও কি একটু অপ্রতিভ হয়ে— এক বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে চুপচাপ দাঁড়াও না? দেখছো তো সংকোচ থাকা ভালো। কিন্তু আমাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে সংকোচ অর্থ 'আমি'র ব্যাপারে সচেতন হওয়া, সংবেদনশীল হওয়া। আমাদের যখন কোনো বড়ো লোকের সাথে দেখা হয় (অবশ্য যদি এমন কেউ আদৌ থেকে থাকেন) আমরা আমাদের 'আমি'টার ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠি। আমরা ভাবি 'উনি কী মহান বহুপরিচিত এক মানুষ, আর আমি একজন নগণ্য মানুষ'। তখন আমরা সংকোচ বোধ করি। এটা কিন্তু আসলে আমরা আমাদের 'আমি'টার প্রতি সচেতন বা সংবেদনশীল

হয়ে উঠি। আর এক অন্য ধরণের সংকোচ আছে যা সত্যি নম্র, সত্যি স্নিগ্ধ। এমন সংকোচে নিজের 'আমি'র প্রতি সচেতনতার অস্বস্তি থাকে না।

৪

শোনা

তোমরা এখানে বসে কেন আমার কথা শুনছো? তোমরা কি কোনোদিন ভেবেছো কেন তোমরা অন্যকে শোনো? অন্যকে শোনার অর্থই-বা কী? একজন কথা বলছেন— আর এখানে তোমরা সবাই তার সামনে বসে আছো। তোমরা কি এমন কিছু শুনতে চাও— যার সাথে তোমাদের চিন্তাভাবনাগুলো মিলিয়ে নাও অর্থাৎ নিজের চিন্তাভাবনাগুলোর সপক্ষে সমর্থন খোঁজো? এইজন্যই কি এই কথাগুলো শুনছো? নাকি তোমরা কোনো অন্বেষণের জন্য শুনছো? তোমরা কি পার্থক্যটা দেখতে পাচ্ছ? কোনো কিছু খোঁজার জন্য শোনা,আর শোনাটা কেবলমাত্র নিজের চিন্তাভাবনার সমর্থন করবে, তাকে পুষ্ট করবে সেইজন্য শোনা— এই দুয়ের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে। নিজেদের চিন্তাভাবনাগুলো যাতে সুদৃঢ় হয়, যাতে পুষ্ট হয়, যাতে উৎসাহিত হয়— সেইজন্য যদি তোমরা শোনো তবে সে শোনার মূল্য কিন্তু খুবই স্বল্প। যদি তোমরা কোনো কিছু অন্বেষণের জন্য শোনো তাহলে কিন্তু মন মুক্ত, মন কোনো কিছুর প্রতি দায়বদ্ধ নয় তথা মন কোথাও আটকে নেই। এটা তখন এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত, শাণিত, অনুসন্ধিৎসু মন— যা, আবিষ্কারে সমর্থ। সুতরাং তোমরা কেন শুনছো, আর কী শুনছো— সেটা বোঝা খুবই জরুরী।

তোমরা কি কখনো খুব শান্ত হয়ে বসেছো— যখন মনোযোগ

কোনো বিশেষ বস্তুর উপর স্থির নয়, সেখানে মনঃসংযোগের জন্য কোনো চেষ্টা নেই; মন একেবারে স্থির, অচঞ্চল? তখন তোমরা সব কিছু শুনতে পাও, তাই নয় কি? অনেক দূরের শব্দ, কাছের শব্দ, একবারে আশেপাশের শব্দ তোমরা শুনতে পাও— যার অর্থ তোমরা সব কিছু শুনছো। তোমাদের মন কোনো একটা সংকীর্ণ খাতে আবদ্ধ নয়। যদি আয়াসহীনভাবে, কোনো উদ্বেগ ছাড়া অবাধে শুনতে পারো, দেখো তোমাদের অন্তরে এক অসাধারণ পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। সে পরিবর্তন তোমাদের চাওয়া বা চেষ্টা থেকে আসে না। সে পরিবর্তনে এক অসাধারণ সৌন্দর্য, এক প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে।

কখনো এটা অনুভব করে দেখো অথবা এখনই অনুভব করতে পারো। যখন আমি কথা বলছি— আর তোমরা শুনছো, তখন শুধু আমাকেই না শুনে তোমাদের আশেপাশেরও প্রত্যেক কিছুকে শোনো। ঐ ঘন্টার শব্দ— গরুর গলায় বাঁধা ঘন্টা অথবা মন্দিরের ঘন্টার ধ্বনি শোনো; অনেক দূরের ট্রেনের শব্দ আর ঐ পথ ধরে যে গরুর গাড়ি চলেছে তার শব্দ শোনো; আরো পাশে আমাকে শোনো— তখন দেখো এমন শোনায় এক অতল গভীরতা রয়েছে। কিন্তু এমন-ভাবে শুনতে গেলে একটা শান্ত মনের প্রয়োজন। তোমরা যদি সত্যি শুনতে চাও, মন স্বভাবতই শান্ত হয়ে যায়, তাই নয় কি? তখন তোমাদের পাশে ঘটা কোনো কিছু তোমাদের বিক্ষিপ্ত করে না, মন তখন স্থির, কারণ তোমরা সব কিছুকে গভীরভাবে শুনছো। এভাবে আয়াসহীন হয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে যদি শুনতে পারো তবে দেখবে তোমাদের হৃদয়ে তোমাদের মনে এক অনন্যসাধারণ রূপান্তর দেখা দিচ্ছে। সে রূপান্তরের কথা তোমরা আগে কোনোদিন ভাবোও নি, তা তোমাদের নিজেদের তৈরী করা নয়।

চিন্তা এক অদ্ভুত জিনিস, তাই নয় কি? তোমরা কি জানো চিন্তা কী? অধিকাংশ লোকের কাছে চিন্তা বা চিন্তা করা হলো, মনের তৈরী

করা একটা ক্রিয়া। তাঁরা আবার নিজেদের চিন্তাভাবনার জন্য ঝগড়াঝাঁটি পর্যন্ত করে থাকেন। কিন্তু যদি তোমরা নদী তটে আছড়ে পড়া ছোট ছোট ঢেউয়ের শব্দ, পাখির সুর, কোনো শিশুর কান্না, অথবা তোমাকে তোমার মায়ের শাসন, তোমাকে উত্যক্ত করার জন্য তোমার বন্ধুর কথাবার্তা, তোমাদের স্ত্রীর বা স্বামীর কোনো কিছু নিয়ে একঘেয়ে-ভাবে বলে চলা— এইসব কিছু সত্যকার শোনো, তখন দেখবে তোমরা শব্দের অতীত কোথাও চলে যাচ্ছো, যেসব কথাগুলো হৃদয়কে ফালা ফালা করে দেয়— সেইসব শব্দের প্রভাবকে অতিক্রম করে বহুদূরে কোথাও চলে যাচ্ছো।

এই শাব্দিক অভিব্যক্তিগুলোকে অতিক্রম করা খুবই প্রয়োজন। আসলে আমরা কী চাই? আমরা যুবক হই বা বৃদ্ধ, বহু বছরের অভিজ্ঞতায় পূর্ণ বা অনভিজ্ঞ— আমরা সবাই সুখী হতে চাই, তাই নয় কি? ছাত্রাবস্থায় আমাদের খেলা, পড়াশুনা, যেসব ছোটোখাটো জিনিস আমাদের ভালোলাগে সেইসব করার মধ্যে দিয়েই আমরা সুখী থাকতে চাই। যখন প্রাপ্তবয়স্ক হই, আমরা আমাদের সম্পত্তি, অর্থ, সুন্দর একটা বাড়ী, সহানুভূতিসম্পন্ন স্বামী বা স্ত্রী, একটা ভালো চাকরি এইসবের মধ্যে সুখ খুঁজি। যখন এইসব জিনিস আমাদের আর সুখ বা সন্তুষ্টি দেয় না তখন আমরা অন্য কিছুর দিকে দৃষ্টি ফেরাই। তখন আমরা বলি, 'আমাকে অনাসক্ত হতে হবে, এসবকে ত্যাগ করতে হবে, তবেই আমি সুখী হবো'। এইভাবে আমরা অনাসক্তির অভ্যাস করতে থাকি। আমরা আমাদের পরিবারকে, আমাদের সম্পত্তিকে ত্যাগ করি এবং পৃথিবী থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিই। অথবা আমরা কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত হই আর ভাবি— এইভাবে একসাথে থেকে, বন্ধুতা-ভ্রাতৃত্ব-সহধর্মিতা নিয়ে আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে, একই দিশারি বা একই গুরু বা একই আদর্শের উপর বিশ্বাস রেখে ও তাকে অনুসরণের মধ্যে দিয়েই সুখ পাবো। এসব কিছু আসলে

আত্ম-ছলনা, ভ্রম ও অন্ধবিশ্বাস।

তোমরা কি বুঝতে পারছ আমি কী নিয়ে কথা বলছি?

যখন চুল আঁচড়াও, যখন তোমাদের সুন্দর দেখাবে বলে পরিষ্কার পাটভাঙ্গা পোশাক পরো, সেগুলো কিন্তু তোমাদের সুখী হওয়ার ইচ্ছেরই একটা অভিব্যক্তি। যখন তোমরা কোনো একটা পরীক্ষা পাশ করে কয়েকটা শব্দ তোমাদের নামের পিছনে বসিয়ে দাও, যখন একটা চাকরি, একটা বাড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তি পাও, যখন বিবাহ করো, সন্তানের পিতামাতা হও, যখন কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ে যোগ দাও— যার প্রধানেরা বলেন তারা অদৃশ্য মহাত্মাদের থেকে নির্দেশ লাভ করেন, তখনও কিন্তু এই সবের পিছনে সুখকে, আনন্দকে খুঁজে পাওয়ারই একটা তীব্র বাসনা থাকে।

অথচ তোমরা জানো আনন্দ অতো সহজে আসে না। কারণ, আনন্দ এইসব কোনো কিছুই নয়। তোমরা ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি পেতে পারো, নতুন কোনো সন্তুষ্টিও পেতে পারো। কিন্তু, আগে আর পরে সেটাও ক্লান্তি নিয়ে আসে। কারণ আমরা এই যে জিনিসগুলো জানি তারমধ্যে কোনো শাশ্বত আনন্দ নেই। কোনো নিবিড় চুম্বনকে চোখের জলের ধারা অনুসরণ করে, প্রফুল্লতাকে বিধুরতা নিঃসঙ্গতা অনুসরণ করে। সব কিছুর ক্ষয় হয়, সব কিছু নষ্ট হয়। তাই জীবনের শুরুতেই তোমাদের খোঁজা শুরু করা উচিৎ— আমরা যাকে আনন্দ বলি সেই অদ্ভুত জিনিসটা কী। এটা কিন্তু শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

যখন তোমরা, আনন্দের জন্য চেষ্টা করো তখন আনন্দ আসে না। যদিও কথাটা খুব সহজেই বলা গেলো, তবু এটাই সবচেয়ে বড়ো রহস্য। আমি একে খুব সহজভাবে বলতে পারি, কিন্তু আমার কাছ থেকে এটা শোনা এবং তাকে কেবলমাত্র পুনরাবৃত্তির মধ্যে দিয়ে কিন্তু কখনই তোমরা সুখী বা আনন্দিত হতে পারবে না। আনন্দ একটা অদ্ভুত জিনিস, যখন তোমরা একে খোঁজ না তখনই এ উপস্থিত হয়।

যখন একে পাওয়ার জন্য কোনো চেষ্টাই নেই, তখন একেবারেই অপ্রত্যাশিত এক রহস্যময় পথে আনন্দ সেখানে উপস্থিত হয়। এক শুদ্ধতা, এক পবিত্রতা, সত্তার প্রীতিময়তা একে আহ্বান করে। কিন্তু এরজন্য প্রয়োজন গভীর বোধ। কোনো সংস্থায় বা সম্প্রদায়ে যোগদান করার বা বিশেষ কিছুতে পরিণত হবার মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। সত্য কিন্তু এমন কিছু নয় যা তোমরা অর্জন করতে পারো। সত্যের আগমন তখনই হয়, যখন তোমাদের হৃদয় ও মন— কিছু পাওয়ার জন্য, কিছু হওয়ার জন্য যে চেষ্টা, যে সংঘর্ষ চলে— সেইসব থেকে মুক্ত। তখন মন শান্ত, তখন মন সব কিছুকে শুনছে, সে শোনা সময়াতীত শোনা। আমি যা বলছি সে কথাগুলো শুনতো পারো কিন্তু আনন্দকে উপলব্ধি করতে গেলে, কীভাবে মনকে সবরকমের ভয় থেকে মুক্ত করবে তা তোমাদের খুঁজতে হবে।

তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো কিছুকে বা কাউকে ভয় পাও, ততক্ষণ পর্যন্ত আনন্দের অস্তিত্ব থাকে না। যতক্ষণ তোমরা তোমাদের পিতামাতাকে, শিক্ষকদের ভয় করবে, পরীক্ষায় অসফল হওয়ার বা আশানুরূপ উন্নতি হচ্ছে না বলে ভয় পাবে, নিজের গুরুর বা সত্যের আরো কাছে পৌঁছোতে পারছো না বলে ভয় পাবে অথবা অন্যের থেকে সম্মান, স্বীকৃতি বা প্রশংসা যদি না পাও, সেজন্য ভয় পাবে— ততক্ষণ আনন্দের সাথে তোমাদের দেখা হবে না। যদি সত্তায় ভয়ের চিহ্নমাত্র না থাকে, তখন কোনো এক সকালে ঘুম ভেঙ্গে অথবা কখনো একলা চলার সময়ে হঠাৎই অনিমন্ত্রিত, অযাচিত, অপ্রত্যাশিতভাবে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। তাকে পরম, প্রেম বা আনন্দ যা খুশি নাম দিতে পারো।

তোমাদের জীবনের শুরু থেকেই যেন তোমরা সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারো— সেটা খুবই জরুরী। আমরা যাকে শিক্ষা বলে বলি— আসলে সেটা শিক্ষাই নয়। কেউ তোমাদের সাথে এইসব

বিষয়ে কথা বলে না। তোমাদের শিক্ষকরা তোমরা কীভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, সেজন্যই তোমাদের প্রস্তুত করতে থাকেন। তাঁরা কেউ এই জীবন, এই বেঁচে থাকা নিয়ে কোনো আলোচনা করেন না। অথচ এটাই সবচেয়ে জরুরী। জানো খুব কম লোকেই জানেন— কীভাবে বাঁচা উচিত। আমাদের মধ্যে অধিকাংশই কেবলমাত্র নিজেদের অস্তিত্বটা টিকিয়ে রাখি, কোনোরকমে এ জীবনের ভার বয়ে নিয়ে চলি, সেইজন্যই জীবন আমাদের কাছে সুখদায়ী কিছু হয়ে আসে না। সত্যকার বাঁচতে গেলে প্রয়োজন গভীর প্রেম ও নীরবতার প্রতি প্রগাঢ় অনুভূতি, অপরিমিত সারল্য আর অগণন অভিজ্ঞতা বা অনুভব; প্রয়োজন স্বচ্ছভাবে চিন্তা করতে পারে এমন একটা মন যা পক্ষপাত, কুসংস্কার, আশা বা ভয়ে জীর্ণ নয়। এইসব কিছুই জীবন, আর যদি তোমরা সত্যকার বাঁচবার জন্যই শিক্ষিত না হও, তাহলে শিক্ষার কোনো মূল্যই থাকে না। তোমরা হয়তো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে শিখবে, আদবকায়দা শিখবে, সব পরীক্ষাগুলোও হয়তো পাশ করবে। কিন্তু সমাজের সমগ্র কাঠামো যখন ভাঙছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে, তখন ঐ সমস্ত উপরভাসা জিনিসগুলোকে মুখ্য গুরুত্ব দেওয়া কেমন জানোতো— তোমার বাড়ীতে যখন আগুন লেগেছে, সব কিছু যখন ছাই হয়ে যাচ্ছে, তখন তুমি বসে বসে আঙ্গুলের নখের পরিচর্যা করছো, চেষ্টা করছো কীভাবে ওগুলো আরো চকচকে হয়। দেখছো তো কেউ তোমাদের এসব নিয়ে কথা বলে না। যেমন তোমরা দিনের পর দিন— গণিত, ইতিহাস, ভূগোল এমনই কিছু বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করো— তেমনই জীবনের এইসব গভীর বিষয়গুলো নিয়েও অনেকটা সময় আলোচনা কোরো, এতে তোমাদেরই জীবন ঋদ্ধ হবে।

প্রশ্নকারী ঃ *ঈশ্বরকে পূজা করা কি সত্যকার ধর্ম নয়?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ সর্বপ্রথমে খুঁজে বার করা যাক কোনটা ধর্ম নয়। এটাই কি

সঠিক পথ নয়? যদি আমরা বুঝতে পারি কোনটা ধর্ম নয়, সম্ভবত তখন আমরা অন্য কিছু দেখতে শুরু করবো। এটা কেমন জানোতো তোমার জানালার কাঁচটা নোংরা হয়েছে, তুমি সেটাকে সাফ করলে— তখন সেটার ভিতর দিয়ে সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাবে। সেইভাবেই দেখা যাক উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে যা ধর্ম নয়, মন থেকে তার মলিন ছাপ আমরা মুছে ফেলতে পারি কিনা। তবে 'আমি এই বিষয়ে ভাববো' একথা বলা এবং কিছু শব্দ নিয়ে খেলা করা এমন যেন আমরা না করি। হয়তো তোমরা খুঁজে পেলেও পেতে পারো, কিন্তু বয়স্করা ইতিমধ্যেই যা ধর্ম নয় তারই জালে আটকা পড়েছেন। তাঁরা খুবই আরামে নিজের নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁরা কিন্তু কোনোরকমভাবেই বিক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হতে চান না।

তাহলে এখন প্রশ্ন হলো— কী ধর্ম নয়? তোমরা কি এ ব্যাপারে কোনোদিন চিন্তাভাবনা করেছো? তোমাদের বার বার বলা হয়েছে ধর্ম কীরকম হওয়া উচিত, ঈশ্বরে এবং এমন অসংখ্য কিছুতে বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে কীভাবে তা পালন করতে হয়; কিন্তু কেউ তোমাদের এটা খুঁজে বার করতে বলেনি— কোনটা ধর্ম নয়? এখন তোমরা এবং আমি, আমরা নিজেরাই সেটা খুঁজে বার করবো।

আমাকে বা অন্য কাউকে যখন শুনছো— সেই মতামতগুলোকে স্বীকার করে নিও না। বরং বিষয়টার সত্যতাকে উপলব্ধি করার জন্য শোনো। যদি একবার খুঁজে পাও ধর্ম ঠিক কী নয়, তাহলে তোমাদের সমগ্র জীবনে— কোনো পুরোহিত, কোনো বই তোমাদের প্রতারণা করতে পারবে না। কোনোপ্রকারের ভয়ের অনুভূতি থেকে সৃষ্ট কোনো বিভ্রান্তিকে তোমরা মেনে নেবে না বা বিশ্বাস করবে না। ধর্ম কী নয়— সেটা বুঝতে গেলে তোমাদের প্রতিদিনকার জীবনের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে, সেখান থেকেই শুরুটা হবে, তারপর তোমরা বহুদূর যেতে পারো। অনেক অনেক দূর যেতে গেলে তোমাদের একেবারে

কাছ থেকে শুরু করতে হবে, এবং সেই পদক্ষেপ খুবই জরুরী। এখন প্রশ্ন— কী ধর্ম নয়? এই যে বাহ্যিক অনুষ্ঠান, সমারোহ, এসব কি ধর্ম? বার বার পূজার বন্যা বইয়ে দেওয়া— এটা কি ধর্ম?

কী ভাবতে হবে তা নয়, কীভাবে ভাবতে হবে সেটা শেখাই হলো সত্যকার শিক্ষা। যদি জানো কীভাবে ভাবতে হয়, যদি সত্যিই সে সামর্থ্য থাকে তবে তোমরা হবে মুক্ত মানুষ; সব মতবাদ, সব কুসংস্কার, সব আচার-অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত এবং তখনই ধর্ম কী তার অন্বেষণ সম্ভব।

নিঃসন্দেহে আচার-অনুষ্ঠান ধর্ম নয়। আচার-অনুষ্ঠান হলো অন্যের কাছ থেকে শেখা কিছু পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি। তুমি যখন এই আচারনিয়ম করছো, তখন তুমি কিছু সুখানুভূতি পেলেও পেতে পারো, ঠিক অন্যেরা যেমন ধূমপান বা মদ্যপানের সময় পেয়ে থাকেন, কিন্তু এটাই কি ধর্ম? এই আচার-অনুষ্ঠান পালনের সময় তুমি এমন সব কিছু করছো যার সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না। তোমার বাবা এবং তাঁরও বাবা এটা করতেন, তাই তুমি এটা করো। আবার তুমি যদি এইসব না করো তাহলে তাঁরা তোমাকে তিরস্কার করেন। এটা নিশ্চয় ধর্ম নয়, তাই নয় কি?

মন্দিরে কী আছে? কোনো মানুষ নিজের ভাবানুযায়ী বা কল্পনানুযায়ী একটা ভাবগম্ভীর মূর্তি খোদাই করেছেন— সেটি রয়েছে। এই যে প্রতিমা, হয়তো এ একটা প্রতীক, তবু এটা একটা প্রতিমাই— এ কিন্তু সত্যবস্তু নয়। এই প্রতীক, এই যে কিছু উচ্চারিত শব্দ— যে জিনিসকে এরা প্রকাশ করতে চায় বা যার প্রতিনিধি হিসাবে এদের ব্যবহার করা হচ্ছে— সেই সত্যবস্তুটি নয়। 'দরজা' শব্দটা কিন্তু আসলে দরজা নয়। শব্দ কোনোদিন যে বস্তুর জন্য তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই আসল বস্তুটি নয়। আমরা মন্দিরে পূজার্চনা করতে যাই, কিন্তু কীসের? আমরা এক প্রতিমার পূর্জাচনা করি— যাকে কোনো কিছুর প্রতীক

বলে ধরে নেওয়া হয়েছে— কিন্তু প্রতীক তো সেই সত্যবস্তুটা নয়। তাই কেন যাবো? এটা বাস্তব সত্য। আমি কিন্তু কোনো কিছুকে দোষারোপ করছি না। যেহেতু এটা বাস্তব সত্য, তাই উঁচু জাতের বা অচ্ছুৎ অথবা ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ— কারা মন্দিরে গেলেন, সে নিয়ে ভাববার কী প্রয়োজন। দেখছো তো, বয়স্ক ব্যক্তিরা এই প্রতীককেই ধর্মে পরিণত করেছেন। এটা নিয়ে তারা কলহ, সংঘর্ষ, হানাহানি করতেও প্রস্তুত, কিন্তু ঈশ্বর সেখানে নেই। ঈশ্বর কখনো প্রতীক হতে পারে না। তাই কোনো প্রতীক বা প্রতিমার পূজার্চনা কখনও ধর্ম নয়।

এখন প্রশ্ন হলো ধর্ম কি একটা বিশ্বাস? এটা আর একটু জটিল। আমরা আমাদের সবচেয়ে পাশেই যেটা চোখে পড়ে— সেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, এবার একটু গভীরে যাবার চেষ্টা করবো। দেখা যায় খ্রিষ্টানদের, হিন্দুদের, মুসলমানদের এবং বৌদ্ধদের এক একরকমের নিজস্ব বিশ্বাস রয়েছে। এঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের ধার্মিক মানুষ বলে মনে করেন। এদের প্রত্যেকের নিজের নিজের মন্দির, ঈশ্বর, প্রতীক এবং বিশ্বাস রয়েছে। এখন এটাই কি ধর্ম? যখন তুমি ঈশ্বর, রাম, সীতা বা কোনো দেবতার উপরে বিশ্বাস করো, সেটা কি ধর্ম? এইসব বিশ্বাসগুলো তোমরা পাও কোথা থেকে? তোমরা এগুলো বিশ্বাস করো কারণ তোমাদের বাবা ও দাদু এগুলোকে বিশ্বাস করেন, শ্রদ্ধা করেন অথবা কোনো গ্রন্থ পড়েছো; সেখানে শঙ্করাচার্য বা বুদ্ধ যা-কিছু বলেছেন তাকে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেছো, তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছো। তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই গীতাতে কোনো কিছু বলা আছে বলেই তাকে মেনে নাও। একেবারে পরিষ্কারভাবে, সরলতার সাথে তাকে কোনোদিন পরীক্ষা করে দেখোনি। অন্য কিছু জ্ঞানের ব্যাপারে বা অন্য কোনো বইয়ের ব্যাপারে তোমরা যেমন পরীক্ষা করো, যাচাই করে দেখো, এই ব্যাপারে কিন্তু তেমনটি ঘটে না। আসলে সত্য কী— তোমরা কোনোদিন তা খুঁজতে চেষ্টা করো না।

তাহলে আমরা দেখলাম এই আচার-অনুষ্ঠান, বাহ্যিক আড়ম্বর এসব কিন্তু ধর্ম নয়। মন্দিরে যাওয়াও ধর্ম নয় এবং কতকগুলো কিছুতে বিশ্বাস করাও ধর্ম নয়। আসলে বিশ্বাস মানুষে মানুষে বিভেদ আনে। খ্রিষ্টানদের নিজস্ব বিশ্বাস আছে এবং তারা অন্য বিশ্বাসে আবদ্ধ সম্প্রদায়ের থেকে নিজেদের পৃথক করেছে, আবার তাদের নিজেদের মধ্যেও বিভেদ রয়েছে। হিন্দুদের মধ্যেও সেই শত্রুতা চলে আসছে, কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ অব্রাহ্মণ, এটা-সেটা কতো বিভাগে তারা বিভক্ত। সুতরাং দেখা যায় বিশ্বাস আসলে বিভেদ, শত্রুতা আর হানি আনে; তাই এই বিশ্বাসগুলো ধর্ম নয়।

ধর্ম তবে কী? যদি সেই জানালার কাঁচের সব মলিনতা মুছে গিয়ে থাকে, যার মানে তুমি এই আচারবিচার, অনুষ্ঠান, এই বিশ্বাস, অথবা কোনো মহাত্মা বা গুরুকে অনুসরণ— এইসব থেকে মুক্ত, তখন মন হলো পরিষ্কার জানালার মতো। তুমি তার মধ্যে দিয়ে সব স্পষ্ট দেখতে পাবে। মনের মধ্যে থেকে যখন এই প্রতীক, প্রতিমা, বিশ্বাস, শাস্ত্রীয়-আচার, নিয়ম-নিষ্ঠা, মন্ত্র ও তার লক্ষ পুনরাবৃত্তি এবং সব ভয়ের মালিন্য ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়, তখন তুমি যা দেখো— তা পরম, সত্য, সময়াতীত। তোমরা একে ঈশ্বর নাম দিতে পারো। কিন্তু এইসব কিছুর জন্য চাই গভীর অন্তর্দৃষ্টি, বোধ আর অপরিমেয় ধৈর্য্য। এটা তাঁদের পক্ষেই সম্ভব যাঁরা দিনের পর দিন শেষ অবধি ধর্ম কী তা অন্বেষণ করে যান। তাঁরাই জানতে পারেন সত্য ধর্ম কী। অন্যেরা কতোগুলো কথা বলেন আর তাই নিয়ে খেলা করেন। তাঁদের বেশভূষা, তাঁদের সাজসজ্জা, তাঁদের পূজা, তাঁদের ঘন্টাধ্বনি— কতকগুলো বন্ধ্যা কুসংস্কার। ওগুলো অর্থহীন। যখন মন নিজের মধ্যে সত্যিই তথাকথিত ধর্মের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘোষণা করে, তখনই সে সত্যকে খুঁজে পায়।

৫

সৃজনশীল অতৃপ্তি

তোমরা কি কোনোদিন শান্ত হয়ে, একটুও নড়াচড়া না করে, যাকে বলে নিস্পন্দ হয়ে বসা— তেমনভাবে বসেছো? একবার করে দেখো। স্থির হয়ে বসো, মেরুদণ্ড থাকবে সোজা, এবারে লক্ষ্য করো তোমাদের মন কী করছে। একে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করো না। বোলো না, এর— এক চিন্তা থেকে আর এক চিন্তায় অথবা এক আকর্ষণীয় কিছু বা উত্তেজনা থেকে আর এক উত্তেজনায় লাফালাফি করা উচিত নয়। কেবল সচেতন হও— কীভাবে মন এক বিষয় থেকে আর এক বিষয়ে ঘোরাফেরা করছে। যেমনভাবে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে নদীর জল বয়ে যাওয়া দেখো তেমনভাবেই লক্ষ্য করো, অন্য কিছু কোরো না। নদীর এই প্রবাহের মধ্যে মাছ, গাছের পাতা, পশুর শব, কতো অগণিত জিনিস রয়েছে, কিন্তু এরা সবই গতিশীল। মনও ঠিক তেমনই। এটা চিরকাল অস্থির, অনেকটা প্রজাপতির মতো— সবসময় একটা কিছু থেকে আর একটা কিছুতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যখন তোমরা একটা গান শোনো, কেমনভাবে তা শোনো? তোমাদের হয়তো গায়ককে ভালো লাগল, তার হয়তো সুন্দর মুখশ্রী রয়েছে, সে যে গান গাইছে সেই গানের কথার অর্থও হয়তো বুঝতে পারছো। কিন্তু এসবের সাথেও তোমরা সংগীতের সেই অপূর্ব ধ্বনি, এবং সেই ধ্বনিগুলোর অন্তর্বর্তী থাকা এক গভীর নীরবতাকে, এক

পরম শান্তিকেও শোনো, তাই নয় কি? শান্ত হয়ে বসো, অধীর হয়ো না, এমন কী হাত নাড়িও না বা পায়ের গোড়ালিও নাড়িও না— এমন অবস্থায় কেবল নিজের মনকে লক্ষ্য করো। এটা কিন্তু খুব মজার ব্যাপার। যদি এটাকে খেলার মতো করে মজার মতো করে নাও, তবে দেখবে তোমাদের দিক থেকে একে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো চেষ্টা ছাড়াই মন শান্ত হতে শুরু করেছে। তখন সেখানে কোনো বিচারক নেই, কেউ কোনো ব্যাপার মূল্যায়ন করছে না। এমন অবস্থায় মন যখন শান্ত, সহজ-স্থির, তখন তোমরা— আনন্দিত হওয়ার অর্থ কী তা আবিষ্কার করবে। তোমরা কি জানো আনন্দ কী, প্রফুল্লতা কী? এটা হলো এক প্রাণখোলা সহজ হাসি, এটা প্রত্যেক কিছুতে অথবা যখন কিছুই নেই, সব কিছু অনুপস্থিত সেখানেও পল্লবিত হওয়া, বাঁচার আনন্দকে জানা, নির্ভয়ে অন্যের মুখের দিকে তাকানো।

তোমরা কি কোনোদিন সত্যি কারোর মুখের দিকে তাকিয়েছো? তোমাদের শিক্ষকদের বা বাবা-মায়ের, অফিসের কোনো উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বা কোনো গরীব কুলির মুখের দিকে তাকিয়েছো, দেখেছো তখন কি ঘটে? আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগই অন্যের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে ভয় পাই এবং অন্যেরাও সেটা চায় না, কারণ তারাও ভীত। কেউই নিজেকে প্রকাশ করতে চায় না, আমরা সবাই নিজেদেরকে— দুঃখ, যন্ত্রণা, আশা-আকাঙ্ক্ষার অসংখ্য স্তরের নীচে সাবধানে লুকিয়ে রেখেছি। এমন খুব কম ব্যক্তি আছেন যাঁরা সরাসরি আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে আপনার চোখে চোখ রেখে এক নির্মল হাসি হাসতে পারেন। এই হাসি এই সুখী হওয়া খুবই জরুরী। হৃদয়ে এর সঙ্গীত ছাড়া জীবন ধূধূ রুক্ষ হয়ে যায়। কেউ হয়তো এক মন্দির থেকে আর এক মন্দিরে, এক স্বামী বা স্ত্রী ছেড়ে আর এক স্বামী বা স্ত্রীকে, এক গুরু পালটে আরেক গুরুকে গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু অন্তরে যদি সেই আনন্দ সরিৎ না বয় তবে জীবনের অর্থ খুবই

নগণ্য। সেই অন্তরের আনন্দের ধারাকে খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, কারণ আমাদের অতৃপ্তিটা আসলে খুবই উপরভাসা।

তোমরা কি অতৃপ্তি কাকে বলে জানো? আমরা অতৃপ্তিকে অন্য কোনো পথে চালিত করি, এর শিখাকে নিস্তেজ করে দিই, তাই একে উপলব্ধি করা খুবই কঠিন হয়ে যায়। আমরা স্থায়ীভাবে একটা সুরক্ষিত অবস্থা চাই এবং সেখানে লাভ এবং সম্মানও যেন সঠিক মাত্রায় থাকে; আমরা কোনোপ্রকারেই বিক্ষুব্ধ হতে চাই না। এটা বাড়িতে ঘটে, আবার বিদ্যালয়েও ঘটে। শিক্ষকরা নিজেরাও কোনোরকমভাবে বিক্ষুব্ধ হতে চান না, সেইজন্য পুরোনো যেসব রীতিনীতি রয়েছে তাঁরা সেগুলোই অনুসরণ করেন। তার কারণ যে মুহূর্তে কারো মধ্যে সেই অতৃপ্তি, সেই অচরিতার্থতাবোধ দেখা দেবে তখনই সে সন্ধান করতে শুরু করবে, প্রশ্ন করতে শুরু করবে। আর এই অবস্থা একটা আলোড়ন তুলবে। কিন্তু সত্যকার অতৃপ্তির মধ্যে দিয়েই একমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনা আসে।

তোমরা কি এই স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনা বা প্রেরণা কী তা জানো? যখন অন্যের কিছু বলবার অপেক্ষা না রেখেই তুমি ভিতর থেকেই কিছু করো, তখন জেনো প্রেরণা আছে। সে কাজটা কোনো যে বিরাট কিছু হবে তার কোনো মানে নেই, তেমন কাজ পরেও আসতে পারে। যখন তুমি নিজে থেকেই ছোট্ট একটি চারাগাছ রোপন করো, অথবা তুমি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই করুণাময় এবং যে মানুষটা একটা ভারী বোঝা নিয়ে পথ দিয়ে চলেছেন তাঁকে একটা নির্মল হাসি উপহার দাও, যখন পথে পড়ে থাকা কোনো পাথরকে সরিয়ে দাও, পথে যেতে যেতে কোনো প্রাণীকে একটু আদর করে দাও, তখন জেনো তোমার মধ্যে প্রেরণার সে প্রদীপ্ত শিখা জ্বলছে। এ সেই প্রবল প্রেরণার পূর্বাভাস যা সৃজনশীলতার জন্য বড়ো প্রয়োজন। সৃজনশীলতার মূল রয়েছে প্রেরণার ভূমিতে আর গভীর অতৃপ্তিবোধ সে ভূমিকে উর্বরা করে।

অতৃপ্তিকে ভয় পেয়ো না। যতক্ষণ পর্যন্ত এর স্ফুলিঙ্গ এক অকম্পিত শিখায় পরিণত না হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা চিরকালের জন্য একটা চাকরি বা পরিবার অথবা অর্থ, সম্মান, ক্ষমতার পিছনে ছুটে বেড়ানোর পরম্পরাগত অভ্যাসের প্রতি বিতৃষ্ণ না হয়ে ওঠো, ততক্ষণ পর্যন্ত এ অতৃপ্তিকে নিজ সত্তায় লালন কোরো। তখন তোমাদের সঠিকভাবে চিন্তা ও অন্বেষণ দুই শুরু হবে। যতো বয়স বাড়ে— এই অতৃপ্তির বোধকে জাগিয়ে রাখা ততই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তখন তোমাদের ছেলেমেয়েদের ভরণ-পোষণ, কর্মক্ষেত্রের সঙ্কট নিয়ে চিন্তাভাবনা, প্রতিবেশী ও সমাজ তোমাদের কোন ব্যাপার কীভাবে দেখে তার প্রতি খেয়াল রাখা— এইসব মুখ্য হয়ে ওঠে। অতি শীঘ্রই অতৃপ্তির সেই আগুন নিভতে থাকে। সেই সময় যখন বিতৃষ্ণ বোধ করো তখন হয়তো রেডিও খুলে শুনতে থাকো, কোনো গুরুর কাছে যাও অথবা পূজার্চনা নিয়ে বসে পড়ো কিংবা ক্লাবে যাও, মদ্যপান করো, অথবা নারীর সঙ্গসুখের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠো অর্থাৎ সেই বিতৃষ্ণার বোধটার কন্ঠরোধ করো, তাকে কোনোরকমে চাপা দিতে চেষ্টা করো। কিন্তু এই গভীর অতৃপ্তিবোধই এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার জন্ম দেয়। আর সেখান থেকেই শুরু হয় সৃজনশীলতা। সত্য কী— তার সন্ধান করতে হলে পরম্পরাগত যে বিন্যাস রয়েছে, যে রীতি রয়েছে, তার বিরুদ্ধে তোমাদের নিজের মধ্যে এক বিপ্লব আনতে হবে। কিন্তু তোমাদের পিতামাতারা যত বেশী আর্থিকভাবে সম্পন্ন হবেন, তোমাদের শিক্ষকেরা যত বেশী তাঁদের চাকরিতে নিরাপদ থাকবেন, তোমাদের মধ্যে এই বিপ্লব ঘটুক এটা তাঁরা তত কম চাইবেন।

সৃজনশীলতা কিন্তু শুধুমাত্র কিছু চিত্র রচনা বা কবিতা রচনাই নয়, যদিও এগুলো করা ভালো, কিন্তু এগুলো নিজেরা খুবই কম গুরুত্বপূর্ণ। যা প্রয়োজন তা হলো পরিপূর্ণ অতৃপ্তি। এই পূর্ণ অতৃপ্তি থেকেই সত্তায় এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা আসে— সেই প্রেরণা পরিণতি লাভ

করলে তা সৃজনশীল হয়ে ওঠে। এটাই— সত্য কী, ঈশ্বর কী, খোঁজার একমাত্র পথ। আসলে সৃজনশীল অবস্থাই হচ্ছে ঈশ্বর।

এই পূর্ণ অতৃপ্তি প্রয়োজন, কিন্তু তাতে থাকবে আনন্দের সৌরভ। এ কথাটা কি বুঝতে পারছো? পূর্ণ অতৃপ্তি থাকবে, কিন্তু তারমধ্যে দোষারোপ, বা দুঃখ প্রকাশ থাকবে না, সে অতৃপ্তি হবে— আনন্দ, প্রফুল্লতা, আর প্রেমের প্রভায় উজ্জ্বল। সাধারণত অতৃপ্ত লোকেরা ভীষণ একঘেয়েমি সৃষ্টিকারী, অত্যন্ত ক্লান্তিকর হয়ে থাকেন। কোনো-না-কোনো কিছু একটা ঠিক নয় এই দোষারোপ চলতেই থাকে। তাঁরা মনে করেন, যদি তাঁরা কোনোভাবে আর একটু ভালো অবস্থায় থাকতেন, যদি তাঁদের চারপাশের পরিস্থিতিটা একটু ভিন্ন হতো— আসলে তাঁদের অতৃপ্তি খুবই উপরভাসা। আর যাঁরা কোনোভাবেই অতৃপ্ত নয় তাঁরা ইতিমধ্যেই মৃত।

তোমাদের ছোটবেলা থেকে যদি তোমাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব চলতে থাকে, যদি তোমাদের সত্তায় সেই অতৃপ্তির শিখা জ্বলতে থাকে এবং তোমরা যতো বড়ো হবে যদি আনন্দের সাথে, ভালোবাসার সাথে একে এর পূর্ণ জ্যোতিতে জ্বালিয়ে রাখতে পারো, তবে সে শিখার এক অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, তা সৃষ্টি করে, অস্তিত্বে নতুন নতুন জিনিস নিয়ে আসে। কিন্তু এরজন্য তোমাদের সঠিক শিক্ষার প্রয়োজন। সে শিক্ষা কেবল চাকরির জন্য বা সাফল্যের শিখরে উঠবার জন্য তোমাদের তৈরী করে না। সে শিক্ষা তোমাদের চিন্তা করতে সহায়তা করে, তোমাদের একটা পরিসর, একটা অবকাশ দেয়— অবশ্যই সেটা আরো বড়ো শোবার ঘর বা উঁচু ছাদযুক্ত ঘরের পরিসর নয়— এ এমন এক পরিসর যেখানে কোনো বিশ্বাস বা আদর্শ বা ভয়ের চিহ্ন নেই এবং সেখানে মন সহজভাবে প্রস্ফুটিত হতে পারে।

প্রশ্নকারী ঃ *অতৃপ্তিবোধ স্বচ্ছ চিন্তাভাবনায় বাধা দেয়। কী করে এই*

বাধা অতিক্রম করা যায় ?
কৃষ্ণমূর্তি ঃ আমি যা বলছিলাম সেটা মনে হয় শোনোনি, হয়তো তুমি তোমার নিজের প্রশ্নটা নিয়েই ব্যস্ত ছিলে অথবা কীভাবে এই প্রশ্নটা করবে সেই কথা ভাবছিলে। তোমরা সাধারণত বিভিন্নভাবে এটাই করে থাকো। তোমাদের প্রত্যেকের মন আগে থেকেই কোনো-না-কোনো কিছু নিয়ে ব্যস্ত। আমি যা বলছি— সেটা যদি তোমরা যা শুনতে চাও— তা না হয় তাহলে সেই কথাকে তোমরা সরিয়ে রাখো ; কারণ, মনতো নিজের ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত। আমি যা বলেছি তা যদি *সত্যি শুনতে*, অতৃপ্তি-আনন্দ-সৃজনশীলতার মূল প্রকৃতি যদি সত্যিই অনুভব করে থাকতে, তাহলে এই প্রশ্নটা করতে না।

এখন প্রশ্ন হলো অতৃপ্তি কি স্বচ্ছ চিন্তার বাধাস্বরূপ ? স্বচ্ছ চিন্তা কী ? চিন্তার মধ্যে দিয়ে যদি তুমি কিছু লাভ করতে চাও, তবে স্বচ্ছ চিন্তা কি সম্ভব ? তোমার মন যদি ফললাভের ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকে তবে কি স্পষ্ট চিন্তা করা সম্ভব ? নাকি যখন তুমি বিশেষ পরিণাম খুঁজছো না, কোনো লাভ খুঁজছো না তখনই স্পষ্ট চিন্তা সম্ভব ?

তোমাদের যদি আগে থেকেই কিছু বদ্ধমূল ধারণা, কিছু বিশ্বাস থেকে থাকে, যেমন ধরো কোনো ব্যাপারে ভাববার সময় যদি তোমরা হিন্দু, মুসলমান বা খ্রিষ্টান হিসাবে ভাবনা শুরু করো— তবে কি সেই চিন্তা পরিচ্ছন্ন হবে ? মন যখন কোনো বিশ্বাসে বাঁধা নেই (অনেকটা বানরের ঘুঁটিতে বাঁধা থাকার মতো), আগেকার গড়া কতকগুলো ধারণার প্রতি মনের কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই, মন যখন বিশেষ কিছু পরিমাণ অর্থাৎ কোনো ফলাফল খুঁজে বেড়াচ্ছে না— তখন স্বচ্ছ চিন্তা সম্ভব। এই পুরো ব্যাপারটার অর্থ হলো মন যখন কোনোপ্রকার নিরাপত্তা খুঁজছে না এবং তাই মন শঙ্কাহীন— তখনই সে স্পষ্ট ও সোজাসুজিভাবে চিন্তা করতে পারে।

একদিক দিয়ে অতৃপ্তি কিন্তু স্পষ্ট চিন্তাকে বাধা দেয়। যখন তোমরা

অসন্তোষের মাধ্যমে কিছু পাওয়ার চেষ্টা করো, যখন এই অতৃপ্তিকে চাপা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কিছু খুঁজতে থাকো (কারণ মন বিক্ষুব্ধ হতে চায় না) এবং মনের একটু শান্তি, একটু স্থিরতার জন্য তোমরা যেকোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকো— তখন স্বচ্ছ চিন্তা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি তোমরা তোমাদের পুরোনো ধারণা, বিশ্বাস, তোমাদের ভয়— সব কিছুর প্রতিই অতৃপ্ত হও— তখন সেই অতৃপ্তি, চিন্তাকে সচেতন করে তোলে, অবশ্যই সে সচেতনতা কোনো বিশেষ বস্তু সম্পর্কে বা বিশেষ দিশায় নয়; আসলে তখন পুরো চিন্তন প্রক্রিয়াটাই সরল, স্বচ্ছ, এবং খুব সোজাসুজি হয়ে যায়।

বৃদ্ধ বা যুবা সবারই ক্ষেত্রে কিছু একটা চাওয়া থেকেই অতৃপ্তির শুরু। আমরা আরো জ্ঞান, আরো ভালো একটা চাকরি, আরো ভালো গাড়ি, আরো বেশী মাইনে চাই। আমাদের অতৃপ্তির ভিত্তিই হলো 'আরো চাই'। কিন্তু আমি আদৌ তেমন ধরণের অতৃপ্তি নিয়ে কথা বলছি না। এই 'আরো চাই'-এর যে কামনা— সেটাই চিন্তাকে মলিন করে। আমরা কিছু চাইছি বলেই আমরা অতৃপ্ত এমন নয়; সেই চাওয়ার অনুপস্থিতিতেও যদি আমরা অতৃপ্ত থাকি, যদি আমরা আমাদের চাকরি, আমাদের অর্থ সংগ্রহ, পদ ও ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা, পরম্পরাগত সবকিছু, আমাদের যা আছে, ভবিষ্যতে আমাদের যা হতে পারে অর্থাৎ কোনো একটা বিশেষ কিছুতে নয়— সব কিছুতে অতৃপ্ত থাকি, তাহলে সেই অতৃপ্তি— এক স্বচ্ছতা, এক স্পষ্টতা আনে। যখন কোনো কিছুকে স্বীকার করে নেওয়া বা কোনো কিছুর পিছনে দৌড়োনো থাকে না বরং প্রশ্ন, অনুসন্ধান ও গভীরে যাওয়া থাকে, তখন এক অন্তর্দৃষ্টি আসে এবং এর থেকে আসে সৃষ্টিশীলতা ও আনন্দ।

প্রশ্নকারী ঃ *আত্মজ্ঞান কী, আমরা কীভাবে তা লাভ করতে পারি?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ তোমরা কি এই প্রশ্নের পিছনে যে মনোভাব রয়েছে তা

বুঝতে পারছো ? আমি প্রশ্নকর্তাকে অসম্মান করতে চাইছি না ; আসলে এই মনোভাবটাকে দেখা যাক যে প্রশ্ন করে 'কীভাবে আমি এটা পাবো, কতো দিয়ে আমি এটা কিনতে পারবো ? আমাদের কী কী করতে হবে, কতোটা ত্যাগ আমাকে করতে হবে, কী কী নিয়মনিষ্ঠা আমাকে অভ্যাস করতে হবে, কোন কোন ধ্যান করলে আমি আত্মজ্ঞান লাভ করবো ?' যে মন বলে 'ওটা পেতে গেলে আমাকে এটা করতে হবে' সেটা একটা যন্ত্রবৎ অতি সাধারণ মন। তথাকথিত ধার্মিক মানুষেরা কিন্তু এইভাবেই ভাবেন। এ পথে আত্মবোধ কোনোদিন আসে না। কিছু অভ্যাস, কিছু চেষ্টার বিনিময়ে কোনোদিন একে পাবে না। এই আত্মবোধ আসে যখন তুমি নিজেদের সহপাঠীদের সাথে, শিক্ষকদের সাথে, তোমার চারিপাশে যারা আছেন তাদের সাথে তোমার সম্পর্ককে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করো। অন্যের পোশাকের ধরণ, কেমনভাবে সে কথা বলে, তার ভাবভঙ্গি, তার আদবকায়দা, কেমনভাবে সে হাঁটে, তার বিরক্তি অথবা তার তোষামদ এবং এইসব কিছুর প্রতি তোমার প্রতিক্রিয়াই-বা কী, কেমনভাবে তুমি তাতে সাড়া দাও— এইসব কিছুকে যখন লক্ষ্য করো তখন এই আত্মবোধ আসে। যখন তোমরা নিজেদের ভিতর ও বাহিরের সব কিছুকে দেখো অর্থাৎ ঠিক যেমনভাবে আয়নায় নিজেকে দেখো তেমনভাবেই নিজের সমস্ত কিছুকে দেখো, তখনই এই বোধ আসে। যখন আয়নায় নিজেকে দেখো তখন তুমি নিজে যেমন— সেটাই দেখতে পাও। তুমি হয়তো ভাবলে মাথাটা একটু অন্যরকম হলে ভালো হতো, আর একটু বেশী চুল থাকলে ভালো হতো, মুখটা আর একটু সুন্দর হলে ভালো হতো, কিন্তু বাস্তবে তুমি যা— আয়নায় তাই প্রতিফলিত হয়। তুমি বাস্তবটাকে সরিয়ে বলতে পারো না 'আমাকে কী অসাধারণ দেখতে'।

ঠিক যেমনভাবে আয়নায় দেখো, তেমনভাবে যদি তুমি সম্পর্কের আয়নায় নিজেকে ঠিক ঠিক দেখতে পারো তবে দেখবে এই আত্মবোধ

শেষহীন। এ অনেকটা এক অকূল অতল মহাসাগরে প্রবেশের মতো। আমাদের মধ্যে অধিকাংশই কোথাও একটা পৌঁছোতে চাইছি— পৌঁছে গিয়ে আমরা বলবো 'আমি আত্মজ্ঞান লাভ করেছি এবং এখন আমি সুখী', কিন্তু এটা ঠিক এমন নয়। নিজের মধ্যে যেটা দেখছো তাকে কোনোরকম দোষ না দিয়ে, নিজেকে অন্য কারোর সাথে তুলনা না করে, আরো সুন্দর হতে চাই বা আরো সদ্‌গুণসম্পন্ন হতে চাই এমন ভাবনা নিজেদের মধ্যে না রেখে, যদি তোমরা নিজেরা আসলে যা— তাকে গভীরভাবে লক্ষ্য করো, তার সাথে থাকো, তখন দেখবে এক অন্তহীন চলা রয়েছে। তখন সেই চলার কোনো শেষ নেই আর সেটাই তার রহস্য, তার সৌন্দর্য।

প্রশ্নকারী ঃ *আত্মা কী?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ 'আত্মা' শব্দটা আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সভ্যতা আবিষ্কার করেছে। এই সভ্যতা হলো অগণন মানুষের সম্মিলিত কামনা ও ইচ্ছাশক্তির ফল। ভারতীয় সভ্যতার দিকে তাকিয়ে দেখো। এটা কি অসংখ্য মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও আকাঙ্ক্ষার পরিণাম নয়? যে কোনো সভ্যতাই সমবেত ইচ্ছাশক্তির ফল। এখন এই ক্ষেত্রে এই যৌথ ইচ্ছাশক্তি বলেছে ঃ আমাদের এই যে শরীর— যার মৃত্যু আছে, যা ক্ষয় হয়, তার থেকে আরো মহান, আরো ব্যাপক— অক্ষয়, অনশ্বর কিছু থাকা উচিত। সেইজন্য এটা আত্মার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কখনও কখনও কেউ কেউ সেই অসাধারণ অমরতাকে আবিষ্কার করেছেন। এ এমন এক অবস্থা যেখানে মৃত্যু নেই। তখন অন্য সব সাধারণ মন বলেছে 'এটা অবশ্যই সত্য, তিনি যথার্থ বলেছেন', এবং যেহেতু তারা নিজেরাও অমরতা চায় তাই তারা আত্মার ধারণাটাকে আঁকড়ে ধরেছে।

এই ভৌতিক অস্তিত্বের পারেও আরো বেশী কিছু আছে কিনা—

তা তুমিও জানতে চাও, তাই নয় কি ? বছরের পর বছর অফিস যেতে যেতে, যার সাথে তোমার সত্যকার প্রাণের কোনো যোগ নেই এমন কাজ করতে করতে, মনোমালিন্য, পরশ্রীকাতরতায় জর্জরিত হতে হতে, সন্তানের জন্ম দিতে দিতে, প্রতিবেশীর সাথে পরনিন্দা করে ও অসংখ্য অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে তোমরা জানতে চাও— এমন কি কিছু আছে যা এসবের উপরে ? এই 'আত্মা' শব্দটা সেই অবিনশ্বর, সেই সময়াতীত অবস্থার ধারণাকে প্রকাশ করে, তাই নয় কি ? কিন্তু তোমরা কোনোদিন নিজেরা এমন কোনো অবস্থা আছে না-নেই, তা খুঁজে বার করার চেষ্টা করো না। 'আমি— খ্রিস্ট, শঙ্করাচার্য বা অন্যে কে কী বলেছেন বা আমাদের পরম্পরা, আমাদের তথাকথিত সভ্যতা কী বলেছে— সে ব্যাপারে আগ্রহী নই, সময়ের পরিকাঠামোর বাহিরে অর্থাৎ সময়াতীত কোনো অবস্থা আছে কি না তা আমি নিজে খুঁজে বার করবো'— তোমরা কিন্তু এমন কোনোসময় বলো না। তোমরা সেই সভ্যতা, সেই সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে যাও না, কোনো বিপ্লব করো না, অপরপক্ষে তোমরা বলো 'হ্যাঁ আত্মার অস্তিত্ব আছে'। তোমরা এই ধারণাটাকে একটা নাম দাও, অন্যজন এই ধারণাটার অন্য এক নাম দেয়। তারপর তোমরা নিজের নিজের এই বিরোধমূলক বিশ্বাস নিয়ে একে অপরের শত্রু হয়ে ওঠো।

যে মানুষ এই সময়ের পরিকাঠামোর বাইরে অর্থাৎ সময়াতীত কিছু আছে কি না তা খুঁজে বার করতে চায় তাকে সভ্যতার এই কাঠামো, সমবেত ইচ্ছাশক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে; তাকে একা দাঁড়াতে হবে। এটাও শিক্ষার একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ; তোমাদের একা দাঁড়াতে শেখানো— যাতে তোমরা সমষ্টির বা কোনো ব্যক্তির ইচ্ছার বন্ধনে বদ্ধ না হও। তবেই তোমরা নিজেদের জন্য সত্য কী খুঁজে বার করতে পারবে।

কারোর উপরেই নির্ভর কোরো না। আমি বা অন্য কেউ সেই

সময়াতীত অবস্থার কথা শোনাতে পারেন, কিন্তু তোমাদের কাছে এর কি-বা মূল্য আছে? যদি তোমরা ক্ষুধার্ত হও তবে তোমাদের সত্যকার খাদ্য প্রয়োজন। শুধু খাদ্যের কথা শুনলে তো চলবে না। যা জরুরী তা হলো নিজেরা খুঁজে বার করা। তোমাদের চারপাশের সব কিছুই ক্ষয় হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে। এই তথাকথিত সভ্যতাকে আর যৌথ ইচ্ছাশক্তি দিয়ে বেঁধে রাখা যাচ্ছে না। এটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। জীবন প্রতি মুহূর্তে এক একটা নতুন চ্যালেঞ্জও পাঠাচ্ছে। যদি অভ্যাসের চৌহদ্দি থেকে এর প্রতি সাড়া দাও, সে সাড়াটা আসলে পুরোনোকে স্বীকার করে তার থেকে সাড়া দেওয়া— সেটার সত্যিই কোনো মূল্য নেই। যখন তোমরা বলো 'আমি (পুরোনো জিনিসগুলোকে) মেনে নেব না, আমিই সন্ধান করবো, আমিই খুঁজে বার করবো'— যার অর্থ তোমরা সব পুরোনো প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে একা দাঁড়াতে ভীত নও, একমাত্র তখন তোমরা সময়াতীত অবস্থা বলে কিছু আছে কি না, যেখানে 'বেশী' বা 'কম' বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই, এমন এক অবস্থা আছে কি না— তা খুঁজে পাবে।

৬

জীবনের সমগ্রতা

আমাদের মধ্যে অধিকাংশই— জীবনের এক একটা ক্ষুদ্র অংশকে আঁকড়ে ধরে থাকি আর ভাবি এরই মাধ্যমে কোনো একদিন পূর্ণতাকে তথা অখণ্ডতাকে খুঁজে পাবো। আমরা ঘর ছাড়তে চাই না, অথচ আশা করি নদীর পূর্ণ আয়তি, তার ব্যাপ্তিকে আবিষ্কার করবো, আর সেই বয়ে চলা জলধারার দুই পারের সবুজের অপরিমিততাকে দেখতে পাবো। আমরা একটা ছোটো ঘরে থাকি, কোনো ছোটো পটে একটা চিত্র রচনা করি, আর ভাবি এই তো জীবন আমার হাতের মুঠোয় অথবা এইতো আমরা মৃত্যুর মমার্থকে উপলব্ধি করেছি। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না। এরজন্য অবশ্যই বাহিরে আসতে হবে। নিজের ক্ষুদ্র জানালাটা ছেড়ে বাইরে আসা আর প্রত্যেক কিছুকে কোনো বিচার না করে, তাকে দোষ না দিয়ে অর্থাৎ ‘আমি এটা পছন্দ করি, আমি ওটা পছন্দ করি না’ এইসব না বলে যেটা ঠিক যেমন সেটাকে তেমনভাবে দেখা খুবই কঠিন। আমরা মনে করি খণ্ডকে দিয়েই অখণ্ডকে উপলব্ধি করবো। আমাদের আশা একটা অরকে দিয়ে পুরো চাকাটাকেই বুঝে ফেলবো। কিন্তু একটা অরকে দিয়ে তো আর সমগ্র চাকাটি তৈরী হয় না, হয় কি? একটা কেন্দ্র আর অনেকগুলো অর আর একটি বেড় এই নিয়ে যে চাকা তাকে বুঝতে গেলে আমাদের সবগুলিকে অর্থাৎ পুরো চাকাকেই দেখতে হবে। একইভাবে যদি সত্যই জীবনকে

উপলব্ধি করতে চাই তবে এর সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে বুঝতে হবে।

আমার মনে হয় তোমরা এই ব্যাপারটা বুঝতে পারছো যে শিক্ষার কাজ তোমাদের একটা চাকরি পেতে সাহায্য করা এবং বিবাহ, সন্তান, বীমা, পূজার্চনা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতা— এই পুরোনো পথে জীবনকে চালনা করা নয়, বরং তোমাদের জীবনের অখণ্ডতাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করা। এ ধরণের শিক্ষার জন্য প্রয়োজন গভীর বোধ আর অন্তর্দৃষ্টি। তাই শিক্ষকদের উচিত জীবনের এই অখণ্ড প্রবাহটিকে উপলব্ধি করার জন্য নিজেদেরও শিক্ষিত করে তোলা। তাঁরা কোনো পুরোনো বা নতুন পদ্ধতিতে তোমাদের পঠন পাঠনে সহায়তা করবেন, সেটাই কিন্তু সব নয়।

জীবন এক অসাধারণ রহস্য— অবশ্য যে রহস্য বইতে পাও বা লোকেরা যে রহস্য নিয়ে আলোচনা করে সেই রহস্য নয়। এ রহস্যকে নিজেকেই আবিষ্কার করতে হয় আর সেইজন্যই তোমাদের এই ক্ষুদ্রকে, সংকীর্ণতাকে, এই সাধারণকে বুঝতে হবে এবং তাদের অতিক্রম করে যেতে হবে।

এই যুবাবস্থায় যদি জীবনকে না বুঝতে শুরু করো, তবে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হবে তখন ভিতরে ভিতরে এক কিম্ভূতকিমাকার মানুষে পরিণত হবে। বাইরে হয়তো অর্থ থাকবে, দামি গাড়ি থাকবে, এক মিথ্যা অভিমানও থাকবে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে এক নিশ্চেতনা, এক অন্তঃসারহীনতা থেকেই যাবে। সেই কারণে নিজের ক্ষুদ্র গৃহকোণ ছেড়ে বাহিরে এসে, এই নিঃসীম শূন্যের সমগ্র বিস্তারকে দেখা বড়ো দরকার। কিন্তু তোমাতে যদি প্রেম না থাকে, তাহলে তা সম্ভব নয়। এ কোনো দৈহিক প্রেম বা দিব্যপ্রেম নয়— নিরলংকার প্রেম, যার অর্থ— এই গাছেদের, পাখীদের, ফুলেদের, যাঁরা তোমাদের শিক্ষা দেন তাঁদের ও পিতামাতাকে ভালোবাসা এবং পিতামাতা বা সব নিকট সম্পর্কগুলোকে অতিক্রম করে সমগ্র মানবকে ভালোবাসা।

যদি তোমরা নিজেরাই প্রেম কী তা খুঁজে না পাও, তবে সেটা কি এক চরম দুঃখবহ ঘটনা হবে না? যদি এখনই না জানতে পারো প্রেম কী, কোনোদিনও জানতে পারবে না। কারণ বয়স যতো বাড়বে, প্রেম তার সমস্ত শ্রী হারাবে। তখন তা হবে এক অধিকার, এক স্বামিত্বের বিষয়, তা হয়ে উঠবে এক পণ্য— যাকে কেনা যায়, যাকে বিক্রী করা যায়। কিন্তু যদি এখন হৃদয়ে প্রেমের সে উৎসমুখ খুলে যায় অর্থাৎ যে চারা রোপন করেছো তাকে ভালোবাসো, পথে ঘোরা প্রাণীকে আদর করো, তবে যখন বড়ো হবে, তখন তোমরা ক্ষুদ্র গৃহকোণ আর তার এক ক্ষুদ্র জানালা আঁকড়েই পড়ে থাকবে না, তোমরা বেরিয়ে আসবে আর জীবনের সমগ্রতাকে ভালোবাসবে।

ভালোবাসা একটা বাস্তব সত্য। এটা ভাবাবেগ নয়, এর কোনো ঘোষণা থাকে না— এ তরলিত বিহ্বলতা নয়। তোমাদের জীবনের শুরুতেই এ ভালোবাসাকে জানা খুবই প্রয়োজন। হয়তো তোমাদের শিক্ষকরা, তোমাদের পিতামাতারা জানেন না প্রেম কী। তাই তাঁরা এমন এক ভয়ঙ্কর পৃথিবী, এক সমাজ গড়েছেন, যেখানে অবিশ্রান্তভাবে নিজেদের মধ্যে ও অন্যের সাথে যুদ্ধ চলছে। তাঁদের ধর্ম, দর্শন তাঁদের তৈরী মতবাদ, আদর্শ— সব মিথ্যা, কারণ তাঁদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই। তাঁরা সর্বদা একটা ক্ষুদ্র অংশ নিয়েই থাকেন; তাঁদের ক্ষুদ্র জানালা দিয়ে দেখা দৃশ্যটা মনোরম হতে পারে, খানিকটা বিস্তৃতও হতে পারে, কিন্তু সেটা সমগ্র জীবনের বিস্তার নয়। তাই প্রেমের গভীর অনুভূতি যদি অনুপস্থিত থাকে তবে কোনোদিনই অখণ্ডকে দেখতে পাবে না। জীবনে দীনতা, ম্লানতা থেকেই যাবে, আর জীবনের শেষ প্রান্তে গিয়ে দেখতে পাবে পড়ে আছে নিরর্থকতার ছাই আর অনেক অসার শব্দের জঞ্জাল।

প্রশ্নকারী ঃ *আমরা কেন বিখ্যাত হতে চাই?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ কেন বিখ্যাত হতে চাও এ ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কী ? আমি ব্যাখ্যা করতে পারি, কিন্তু তার শেষে কি তোমাদের খ্যাতির তৃষ্ণা মিটে যাবে ? তোমরা খ্যাতি চাও, গণ্যমান্য হতে চাও, কারণ তোমাদের চারপাশে যে সমাজ সেখানেও সবাই তাই চায় । তোমাদের পিতামাতা, তোমাদের শিক্ষকদের, গুরুদের, যোগীদের— সবারই খ্যাতির প্রতি লোভ রয়েছে । তাঁরা প্রত্যেকেই লোকমান্য হতে চান এবং তুমিও তাই চাও ।

এই ব্যাপারটাকে একসঙ্গে দেখা যাক । আমরা কেন বিখ্যাত হতে চাই ? প্রথমতঃ প্রখ্যাত হওয়া লাভজনক । এবং এটা তোমাদের যথেষ্ট সুখানুভূতি দেয়, তাই নয় কি ? তুমি যদি বিশ্ববন্দিত হও, তোমাকে সবাই চেনে, তখন তুমি যে গুরুত্বপূর্ণ তুমি সেটা অনুভব করো ; এটা একটা অমরতার অনুভূতি নিয়ে আসে । তোমরা বিখ্যাত হতে চাও ; তোমরা চাও সবাই তোমাদের চিনুক সবাই তোমাদের নিয়ে কথা বলুক, কারণ ভিতরে তোমরা অন্তঃসারশূন্য এক একজন নগণ্য মানুষ । ভিতরে কোনো ঐশ্বর্য্য নেই, কিছুই নেই, তাই বাহিরের পৃথিবীতে পরিচিতি চাও । কিন্তু যদি ভিতরের সেই ঐশ্বর্যশালিতা থাকে, তাহলে তোমাদের কে চিনল বা চিনল না সেটা কোনো ব্যাপার হয়ে দেখা দেয় না ।

অন্তরের সমৃদ্ধিশালিতা লাভ কিন্তু বাহিরের ঐশ্বর্য ও খ্যাতির লাভের থেকে অনেক বেশী পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার । এটা অনেক যত্ন, এক ঐকান্তিক দৃষ্টি দাবী করে । যদি তোমার মধ্যে স্বল্প প্রতিভাও থেকে থাকে, আর তুমি জানো কীভাবে চতুরতার সাথে তাকে ব্যবহার করা যাবে, তবে তুমি বিখ্যাত হতে পারো । কিন্তু অন্তরের ঐশ্বর্য এভাবে লাভ করতে পারবে না । অন্তরে ঐশ্বর্যশালী হতে গেলে যা যা প্রয়োজনীয় নয়— মনকে তা উপলব্ধি করতে হবে, তাকে বাতিল করতে হবে— যেমন এই বিখ্যাত হওয়ার বাসনা কিন্তু নিষ্প্রয়োজনীয় । অন্তরের

ঐশ্বর্যের অর্থ— একাকী দাঁড়াবার ক্ষমতা, একেবারে একা, কিন্তু যারা বিখ্যাত হতে চায় তারা একা দাঁড়াতে ভয় পাবে; কারণ তারা অন্যের তোষামদ, তাদের সম্পর্কে অন্যের করা ভালো ভালো কিছু মন্তব্যের উপর নির্ভরশীল।

প্রশ্নকারী ঃ *আপনি যখন ছোটো ছিলেন আপনি একটা বই লেখেন। যাতে আপনি বলেছেন 'এগুলো আমার কথা নয় আমার গুরুর বাণী'। তাহলে এখন কেন আপনি আমাদের নিজেদের চিন্তা করতে হবে— এই ব্যাপারে জোর দিচ্ছেন? আপনার গুরুই-বা কে ছিলেন?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ জীবনে সবচেয়ে দুরূহ ব্যাপারগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো কোনো বিশেষ আদর্শে বা চিন্তাধারায় বদ্ধ না থাকা। এই বদ্ধতাকেই বলা হয়— কেউ কোনো ব্যাপারে অটল। যদি তোমাদের অহিংসার আদর্শ থাকে— তোমরা সে আদর্শে অটল থাকার চেষ্টা করো, সেই আদর্শটাকে নিয়ে স্থির হয়ে থাকার চেষ্টা করো। এবার প্রশ্নকারী বলছে 'আপনি এখন আমাদের নিজেদেরই চিন্তা করতে বলছেন, অথচ যখন আপনি ছোটো ছিলেন এর বিপরীত কিছু বলেছেন। আপনি কেন আপনার মতের ব্যাপারে স্থির নন?'

কোনো ব্যাপারে স্থির থাকা বা অটল থাকার অর্থ কী? এই অটল থাকা বা স্থির থাকার মানে— একটা মন অপরিবর্তিত থেকে একটা বিশেষ ধরণের চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে বা কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে চিন্তা করতে থাকে— এর অর্থ হলো স্ববিরোধী কিছু না করা অর্থাৎ আজ একরকম আগামীকাল সম্পূর্ণ তার বিপরীত কিছু না করা। আমরা কিন্তু কোনো কিছুতে অটল থাকা বা কোনো মতামতে স্থির থাকা বলতে কী বোঝায় সেটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করছি। যে মন বলে 'আমি কিছু একটা হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছি এবং আমি আজীবন সেটাই হবার চেষ্টা করবো'— সেই হলো কোনো বিশেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে,

সর্বদা সেই অনুযায়ী চলা একটা অটল মন। কিন্তু আসলে এটা একটা স্থূল মন, কারণ এটা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে এবং জীবনটা সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাটাবার চেষ্টা করছে। এ কেমন জানো— একজন তার চারিদিকে দেওয়াল দিয়ে নিজেকে ঘিরে নিয়েছে আর তার মধ্যেই জীবন কাটাচ্ছে।

এটা কিন্তু একটা জটিল সমস্যা। আমি হয়তো এর খুব সহজ ব্যাখ্যা দিচ্ছি, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি একে আদৌ সহজ মনে করি না। যখন মন এমনভাবেই কোনো সিদ্ধান্তে স্থির বা অটল অর্থাৎ মনটা অপরিবর্তনশীল, তখন এটা যান্ত্রিক হয়ে যায়। সে তার প্রাণসম্পদ, তার দ্যুতি, তার মুক্ত প্রবাহের সৌন্দর্যকে হারায়; এক অন্ধ অবোধ যন্ত্রের মতো বাঁধা কাঠামোর মধ্যে ক্রিয়া করতে থাকে। এটা প্রশ্নটার একটা অংশ।

অন্য অংশটা হলো ঃ গুরু কে? তোমরা এর প্রকৃত অর্থ জানো না। এই ব্যাপারটা গভীর। এমনটি বলা হয়েছে যে আমি যখন বালক ছিলাম তখন কোনো একটি বিশেষ বই লিখেছি। এবং জনৈক ভদ্রলোক সেই বই থেকে একটি লাইন উদ্ধৃত করেছেন, যেটা বলছে— এটা লিখতে গুরু সাহায্য করেছেন। একদল লোক আছেন যেমন থিওজফিস্টরা, তাঁরা মনে করেন গুরুরা হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে বসবাস করেন, সেখান থেকে পৃথিবীকে পথ দেখান ও সাহায্য করেন। এখন জনৈক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করছেন গুরুটি কে। ভালো করে শোনো এটা তোমাদের ক্ষেত্রেও সত্যি।

এটা কি বিরাট কোনো ব্যাপার গুরু কে? আসল কথাটা হলো জীবন। তোমাদের গুরু, দিশারি, শিক্ষক বা নেতা— যাঁরা তোমাদের জন্য জীবনের ব্যাখ্যা করে থাকেন, তাঁরা মোটেই প্রয়োজনীয় নন। তোমাদেরই এ জীবনকে উপলব্ধি করতে হবে; তোমরাই প্রতিপদে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছো, তোমরাই দুঃখ পাচ্ছো, তোমরাই জন্ম-মৃত্যু বা

ধ্যান অথবা দুঃখের অর্থ কী জানতে চাইছো। কেউ তোমাদের এটা বলতে পারবে না। অন্যেরা হয়তো অনেক ব্যাখ্যা দেবেন, কিন্তু কে জানে— হয়তো সেই ব্যাখ্যাগুলো ভুল, সর্বৈব মিথ্যা।

সংশয় থাকা ভালো, কারণ সেটা আদৌ গুরু প্রয়োজন কি না, তা খুঁজে বার করার একটা মানসিক অবস্থা, একটা সুযোগ তৈরী করে দেয়। যা দরকার তা হলো নিজেই নিজের আলোকবর্তিকা হওয়া, নিজেই নিজের গুরুর বেদীতে বসা, নিজেই নিজের শিষ্যের আসন গ্রহণ করা। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেরা নিরন্তর শিখে চলছো ততক্ষণ কোনো শিক্ষকের প্রয়োজন নেই। গুরুর প্রয়োজনীয়তা তখনই দেখা দেয়, যখন তোমরা নিজেরা অন্বেষণ করা ছেড়ে দাও এবং জীবনের অখণ্ড প্রক্রিয়াকে উপলব্ধি করা বন্ধ করো। অবশ্য অমন গুরুরও তেমন কোনো অর্থ নেই। তখন তোমরা নিজেরাও নির্জীব আর তোমাদের গুরুদেরও অবস্থা সেই একইরকম।

প্রশ্নকারী ঃ *মানুষ কেন গর্বিত হয়?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ যখন তুমি নিজে কোনো সুন্দর কিছু একটা লেখো, কোনো খেলায় জিতে যাও, কোনো পরীক্ষা পাশ করো তুমি কি গর্বিত হও না? তুমি কি কোনোদিন কবিতা লিখে বা চিত্র রচনা করে কোনো বন্ধুকে দেখিয়েছো? যদি বন্ধু বলে এ পদ্য অসাধারণ, এ-ছবি তুলনাহীন, তাহলে কি তুমি প্রসন্ন হও না? যখন তুমি কিছু করেছো এবং তা দেখে কেউ প্রশংসা করে তখন তুমি এক সুখের অনুভূতি উপভোগ করো এবং সেই পর্যন্ত এটা ঠিক আছে। কিন্তু পরের বার যখন তুমি কবিতা লেখো, চিত্র রচনা করো বা তোমার ঘরটা পরিষ্কার করো তখন কী ঘটে? তুমি আশা করো কেউ আসুক, কেউ বলুক কী অসাধারণ তুমি, আর যদি কেউ না আসে, কিছু না বলে তখন সেখানে— না কবিতা লেখা, না ছবি আঁকা, না ঘর পরিষ্কার— কোনোটাই থাকে

না। এইভাবে অন্যের প্রশংসা, অন্যের স্তুতি থেকে পাওয়া সুখানুভূতির উপর তোমাদের নির্ভরশীলতা তৈরী হয়। তারপর কী ঘটে? তোমরা যত বড়ো হতে থাকো, তোমরা চাও তোমরা যাই করো না কেন তা যেন স্বীকৃতি পায়। তোমরা হয়তো বলতে পারো 'আমি এটা আমার গুরুর কাজ হিসাবে করছি, আমি দেশের জন্য করছি, মানুষের জন্য করছি অথবা ঈশ্বরের জন্য করছি'— আসলে তোমরা করছো নাম-যশের জন্য, পরিচিতি লাভ করার জন্য, এর ভিতর থেকেই গর্ববোধ আসে। যখন এই মনোভাব নিয়ে কোনো কাজ করো, সে কাজের কোনো অর্থই থাকে না। আমি জানি না তোমরা এইসব বুঝতে পারছো কি না?

গর্ব বা এমন কোনো কিছুকে বুঝতে গেলে তোমাদের যথাযথ ভাবে চিন্তা করতে হবে, তোমাদের দেখতে হবে কীভাবে এটার সূত্রপাত হয়, আর কী ভয়ঙ্কর পরিণাম এটা নিয়ে আসে। সমগ্র ব্যাপারটাকেই দেখতে হবে, এর অর্থ তোমরা এ ব্যাপারে সোৎসুক— তাই একে মাঝপথে ছেড়ে দাও না, একে শেষ অবধি পর্যবেক্ষণ করো। যখন কোনো খেলা তোমাদের সত্যি সত্যি ভালো লাগে, তোমরা মাঝপথে খেলা থামিয়ে নিশ্চয়ই বাড়ী চলে যাও না, শেষ অবধি খেলে যাও। কিন্তু এইভাবে চিন্তা করার জন্য কোনোভাবেই মনকে তৈরী করা হয় না। তাই শিক্ষার কাজ কেবল কয়েকটা বিষয় শেখানো নয় বরং জীবনের অখণ্ড ধারাকে আবিষ্কার করতে সহায়তা করা।

প্রশ্নকারী ঃ *আমাদের ছোটোবেলা থেকেই আমাদের বলা হয়, সুন্দর কী, অসুন্দর কী— ফলত সারা জীবন আমরা সেটারই পুনরাবৃত্তি করি, আর বলে যাই 'এটা সুন্দর, ওটা অসুন্দর'। তাহলে কী করে একজন জানবে সত্যকার সুন্দর বা অসুন্দর কী?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ ধরো তোমাদের কেউ বললো কোনো একটা বিশেষ আর্চ-

এর (ধনুকাকৃতি খিলান) স্থাপত্য শিল্পটি খুব সুন্দর, আর অন্য একজন বললো ওটা মোটেই সুন্দর নয়। এখন যেটা প্রয়োজন সেটা হলো কোনটা সুন্দর বা সুন্দর নয়— এই যে দুটো বিরোধী মতামত রয়েছে সেটা নিয়ে লড়াই না করা; বরং সুন্দর এবং অসুন্দর দুটোর প্রতিই সংবেদনশীল হওয়া। জীবনে পঙ্কিলতা, বিবর্ণতা, দারিদ্রের পীড়ন, অপমান, দুঃখ, কান্না রয়েছে; আবার হাসি, আনন্দ, সূর্যের আলোয় ফুলের সৌন্দর্য আরো গভীর হওয়াও রয়েছে। আসল কথাটা হলো কোনটা সুরূপ, কোনটা কুরূপ এইটা ঠিক করে, সেই মতামতটাকে আঁকড়ে ধরে না থেকে, সব কিছুর ব্যাপারে অনুভূতিসম্পন্ন হওয়া। যদি আমি বলি 'আমি সৌন্দর্যের সাধনা করবো আর যা কিছু অসুন্দর তাকে বর্জন করবো'— তখন কী ঘটে? এই চর্চাই অনুভূতির অসাড়তা নিয়ে আসে। এটা অনেকটা একটা লোক তার ডান হাতটাকে খুব শক্তিশালী সুগঠিত করছে আর বাঁ হাতকে নিষ্ক্রিয় করে তুলছে, ক্ষীণ করে তুলছে। তাই তোমাদের সুন্দর-অসুন্দর দুটোকেই সমান জাগ্রত দৃষ্টিতে দেখতে হবে। তোমাদের, হাওয়ার তালে পাতার নেচে নেচে ওঠা, কোনো সেতুর নীচ দিয়ে জলের তীব্র বেগে বয়ে চলা, কোনো এক সন্ধ্যার সৌন্দর্য দেখতে হবে, এবং পথের ধারে যে ভিক্ষুক বসে আছেন তাঁকে অথবা কোনো দরিদ্র স্ত্রীলোক যিনি কোনো ভারী বোঝা নিয়ে যাচ্ছেন তাঁকেও দেখতে হবে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। এইভাবে যখন তোমরা সব কিছুর ব্যাপারে অনুভূতিসম্পন্ন তখনই তোমরা কাজ শুরু করতে পারবে, তখন কোনো কিছুকে দোষ দেবে না বা বর্জনও করবে না।

প্রশ্নকর্তা ঃ *দয়া করে যদি কিছু মনে না করেন— আপনি বলেননি আপনার গুরু কে ছিলেন?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ এটা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ? যদি তাই হয় তো বইটা জ্বালিয়ে

দিতে পারো, ফেলে দিতে পারো। যদি একটা তুচ্ছ ব্যাপার 'কে গুরু' এটাকে এতো গুরুত্ব দাও,— তাহলে সমগ্র অস্তিত্বকেই তুমি এক তুচ্ছ ব্যাপারে পরিণত করছো। বুঝতে পারছো আমরা সবসময় কে গুরু, কে জ্ঞানী, কোন শিল্পী এই ছবি এঁকেছেন— সেই ব্যাপারে আগ্রহী। শিল্পী যে কেউ হতে পারেন, তাঁর পরিচয়টা বাদ দিয়ে কেবল ছবিটার রূপ, রঙ, রেখা, বিষয়, তার মূল মর্মটা আমরা আবিষ্কার করার চেষ্টা করি না। তোমরা যখন জানতে পারো কবির নাম তখনই সে কবিতার প্রশংসা শুরু হয়। এটা চাটুকারিতা ; এটা অন্যের দেওয়া মতকে নিজের বলে চালানো, তার পুনরাবৃত্তি। এটাতে তোমাদের ঐ বস্তুটি বাস্তবিক যা তাকে দেখার আন্তরিক বোধ নষ্ট হয়। যখন কোনো সুন্দর চিত্র দেখো এবং গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ আসে, তখন সেই ব্যক্তি যিনি এই চিত্র রচনা করেছেন তাঁকে জানা কি খুব জরুরী হয়ে দাঁড়ায়? বিষয়, রেখার ছন্দ, রঙের মুক্তি আরো যা যা নিয়ে সেই ছবি— ছবি হয়ে উঠছে এবং সব কিছুকে অতিক্রম করে তার অন্তর্লীন যে সত্য— তাকে উপলব্ধি করাই যদি তোমার একমাত্র চাওয়া হয়ে থাকে, তবে সে ছবি নিজেই তার মর্মকথা তোমার কাছে প্রকাশ করবে।

৭

উচ্চাকাঙ্ক্ষা

প্রেম থাকা কতোটা জরুরী সেটা আমরা আলোচনা করছিলাম। আমরা দেখেছি একে অধিকার করা যায় না, একে কেনা যায় না। কোনো এক যথাযথ সমাজ যেখানে শোষণ নেই, ভেদাভেদ বা নিয়ন্ত্রণের উগ্রতা নেই, তা গড়বার জন্য যত যোজনাই বানাই না কেন— প্রেম ছাড়া ঐ সবই অর্থহীন হয়ে যায়। আমার মনে হয় যখন তোমরা তরুণ তখনই এই ব্যাপারটা উপলব্ধি করা জরুরী।

পৃথিবীর যেকোনো কোণে যেতে পারো, দেখবে সমাজে নিরন্তর সংঘাত চলছে। একদিকে ক্ষমতাবান, ধনী, সচ্ছল ব্যক্তিরা, অন্যদিকে শ্রমিক ও অন্যরা। প্রত্যেকেই ঈর্ষার মনোভাব নিয়ে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। প্রত্যেকে আরো উচ্চপদ, আরো বেশী মাইনে, আরো ক্ষমতা, আরো মর্যাদার জন্য লড়াই করছে। এটাই পৃথিবীর অবস্থা, তাই আমাদের ভিতরে ও বাহিরে সর্বদা যুদ্ধ চলছে।

এখন যদি তোমরা এবং আমি একসাথে এই সামাজিক বিন্যাসের, এর ব্যবস্থার এক পূর্ণ পরিবর্তন আনতে চাই, তবে সব থেকে আগে ক্ষমতা দখলের যে প্রবৃত্তি— সেটাকে বুঝতে হবে। আমরা অধিকাংশই কোনো-না-কোনোভাবে ক্ষমতা চাই। আমরা দেখি অর্থ আর ক্ষমতাকে ব্যবহার করে আমরা অনেক জায়গায় যেতে পারি, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে দেখা করতে পারি এবং এর মাধ্যমে নিজেরাও বিখ্যাত হতে

পারি অথবা অন্যদিকে, আমরা এক নির্দোষ সমাজ গড়বার স্বপ্ন দেখি। আমরা ভাবি ক্ষমতা দিয়ে, শক্তি দিয়ে, যা কিছু ভালো তা বোধ হয় অর্জন করতে পারবো, কিন্তু এই ক্ষমতা অর্জনের ইচ্ছা, তারজন্য চেষ্টা অশুভ, হানিকারক। সে ক্ষমতা নিজেদের জন্য হতে পারে, দেশের জন্য বা কোনো আদর্শের জন্যও হতে পারে। কারণ এই ক্ষমতা বা শক্তি অর্জনের চেষ্টা সবসময় বিরোধীশক্তির সৃষ্টি করে এবং এই দুই বিরোধী শক্তির মধ্যে সর্বদা সংঘর্ষ চলতে থাকে।

সুতরাং যেখানে ভিতরে ও বাহিরে কোথাও কোনো দ্বন্দ্ব নেই, সংঘর্ষ নেই; যেখানে তুমি, তোমার প্রতিবেশী বা কোনো দলের সাথে দ্বন্দ্বে জড়াও না কারণ দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যেটা আসলে পদ ও ক্ষমতার লিপ্সা তার সমাপ্তি ঘটেছে— তেমনই এক পৃথিবীর গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য শিক্ষার কি তোমাদের সহায়তা করা উচিত নয়? তোমরা যখন বেড়ে উঠছো তখনই এটার প্রয়োজন। সত্যি কি এমন কোনো সমাজ সৃষ্টি সম্ভব, যেখানে কোনো আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দ্বন্দ্ব থাকবে না? সমাজ হলো তোমার সাথে আমার সম্পর্ক, আর যদি আমাদের সম্পর্কই উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করে হয়, তথা আমরা একে অন্যের থেকে বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন হতে চাই তাহলে তো বিরোধ চলতেই থাকবে। তাই, দ্বন্দ্বের যে মূল কারণ তাকে কি সরানো যায়? আমরা কি নিজেদের এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলতে পারি যাতে আমরা অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা না করি, অন্যের সাথে নিজেদের তুলনা না করি, এই পদ বা সেই পদ না চাই— এক কথায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী না হই?

যখন তোমরা তোমাদের পিতামাতার সঙ্গে বাইরে যাও, সংবাদপত্র পড়ো, বা অন্য কোনো লোকের সাথে কথা বলো, তখন নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো প্রত্যেকে এই পৃথিবীতে একটা পরিবর্তন আনতে চায়। এবং আর একটা জিনিসও কি লক্ষ্য করোনি যে এই ব্যক্তিরাই আবার

কোনো একটা আদর্শ হোক বা সম্পত্তি, জাতি, ধর্ম— যা হোক কিছু একটা নিয়ে অন্যের সাথে কলহে লিপ্ত। তোমাদের পিতামাতারা, প্রতিবেশীরা, মন্ত্রীরা, ক্ষমতাসীন আমলারা কি প্রত্যেকেই উন্নতিকামী নন? এরা সকলেই আরো একটু উচ্চপদের জন্য চেষ্টা করছেন, আর সেইজন্যই অন্যের সাথে বিরোধ বাধছে। অবশ্যই যখন এই প্রতিযোগিতামনস্কতার সমাপ্তি ঘটবে, কেবলমাত্র তখনই আমরা সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে, সৃষ্টিশীলভাবে বাঁচতে পারবো।

এখন প্রশ্ন হলো এটা সম্ভব হবে কীভাবে? নিয়ম করে, আইন করে অথবা মন যাতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী না হয়— তারজন্য বিশেষ অনুশীলন করলে কি তাকে শেষ করা যাবে? বাহ্যিক দিক দিয়ে হয়তো উচ্চাকাঙ্ক্ষী না হওয়ার জন্য তোমাদের অভ্যাস করানো যেতে পারে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তোমরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী রয়েই যাবে, নয় কি? এই উচ্চাভিলাষ যেটা মানবীয় জীবনে এতো দুর্দশা নিয়ে আসছে, তাকে কি নিশ্চিহ্ন করা যাবে? তোমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করোনি, কারণ আগে কেউ তোমাদের সাথে এইসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেনি। কিন্তু এখন যখন কেউ আলোচনা করছে, তখন কি তোমরা এই পৃথিবীতে সুখী ও সৃষ্টিশীল হয়ে, উচ্চাভিলাষ ও প্রতিযোগিতার হানিকারক দৌড় ছাড়া বাঁচা যায় কি না তার খোঁজ করবে না? অন্যের জীবনযাত্রাকে পণ্ড না করে, তার চলার পথ অন্ধকার করে না দিয়ে আদৌ বাঁচা যায় কি না— সেটা কি জানতে চাইবে না?

তোমরা ভাবছো এমন কাল্পনিক স্বপ্ন কখনই বাস্তবায়িত হবে না। আমি কিন্তু কোনো অলীক কল্পনা নিয়ে কথা বলছি না, সেটা অর্থহীন। উচ্চাশার দৌড়— ক্ষমতা লাভ, উচ্চপদ লাভ করবার কামনার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে; এখন প্রশ্ন হলো— তোমরা এবং আমি, যারা নিতান্তই সাধারণ মানুষ, তারা কি এই দৌড় থামিয়ে সৃজনশীলতার সাথে বাঁচতে পারি? তোমরা এর উত্তরটা তখনই খুঁজে পাবে যখন

তোমরা যেটা করছো সেটা গভীরভাবে ভালোবাসো বলেই করছো— এমনটি হবে। এর মানে হলো, ধরো তুমি একজন ইঞ্জিনিয়ার, আর তার কারণটা হলো— তোমাকে রোজগার করতে হবে, বা তোমার বাবা-মার আশা বা সমাজের চাপ রয়েছে, তাহলে সেটা কিন্তু তুমি বাধ্য হয়েই করছো, সেখানে বাধ্যবাধকতা আছে। এই বাধ্যবাধকতা, এই জবরদস্তি যে কোনো রূপেই হোক না কেন— একটা বৈপরীত্য, একটা দ্বন্দ্ব নিয়ে আসে। অন্যদিকে যদি তুমি ইঞ্জিনিয়ার বা বৈজ্ঞানিক হতে ভালোবাসো অথবা ধরো একটা গাছ লাগালে বা তুমি ছবি আঁকো, কবিতা লেখো অর্থাৎ যাই করো না কেন, কোনো স্বীকৃতি লাভ করবে বলে নয়— কেবল ভালোবাসো বলেই সেটা করো— তখন দেখো তোমার সাথে অন্যের কোনো প্রতিযোগিতাই সেখানে থাকে না। আমার মনে হয়, যেটা অন্তরের সাথে ভালোবাসো সেটাই কোরো; এটাই আসল চাবি।

কিন্তু তোমাদের ছোটবেলায় তোমরা ঠিক কী করতে ভালোবাসো, অর্থাৎ কোন জিনিসটার সাথে তোমাদের প্রাণের আত্মীয়তা আছে, সেটা আবিষ্কার করা খুবই কঠিন। কারণ তখন তোমরা সব কিছু একসাথে করতে চাও। তোমরা ইঞ্জিনিয়ার হতে চাও, আবার ইঞ্জিন-ড্রাইভার হতে চাও, এরোপ্লেনের পাইলট্ হয়ে নীল শূন্যে বেগে উড়ে যেতে চাও, আবার কখনো সুবক্তা বা রাজনীতিবিদ্ হতে চাও। কখনো-বা আর্টিস্ট অথবা রসায়নতত্ত্ববিদ, কবি বা কাঠের কারিগর— অর্থাৎ যা যা হতে পারে সব কিছুই হতে চাও। কখনো মাথার কাজ করতে চাও, আবার কখনও-বা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে চাও। এগুলির মধ্যে কোনোটা কি তোমরা ভালোবাসো বলে করো, নাকি তোমাদের উৎসাহটা পারিপার্শ্বিক চাপের একটা প্রতিক্রিয়া? কীভাবে খুঁজে বার করবে? এখন, তোমরা যাতে সেটা খুঁজে পাও এবং যতো বড়ো হবে, তোমরা যাতে তোমাদের শরীর-মন-হৃদয় তথা তোমাদের

সমগ্রতা দিয়ে যা ভালোবাসো তা করতে পারো— সেটায় সহায়তা করাই কি শিক্ষার সত্যকার কাজ নয়?

তোমরা, কী ভালোবাসো তা খুঁজে পেতে হলে গভীর বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন। যদি তোমাদের ভিতর ভয় থাকে যে জীবিকার্জন করতে পারবে কি না, বা এই জীর্ণ সমাজের সাথে মানিয়ে নিতে পারবে কি না, তবে তো কখনই খুঁজে পাবে না। যদি ভয় না পাও, যদি তোমাদের পিতামাতা, শিক্ষক, বা সমাজের উপর-ভাসা দাবীগুলোর চাপে এই পুরানো পরম্পরার ফাঁদে আটকে যাওয়াকে অস্বীকার করো, তখনই যার সাথে তোমরা সত্তার সত্যকার সম্পর্ক রয়েছে— সেই কাজকে খুঁজে বার করার সম্ভাবনা থাকে। নিজের অস্তিত্বের সংকট দেখা দিতে পারে, তা লোপ পেতে পারে— এইসব ভয় নিয়ে আবিষ্কারের পথে অগ্রসর হওয়া যাবে না।

আমরা প্রত্যেকে নিজেদের অস্তিত্বের সংকটের ব্যাপারে ভীত। আমরা বলি, ‘‘যদি বাবা-মার কথা না শুনি বা সমাজ যে ধারায় চলছে তার সাথে মানিয়ে চলতে না পারি তাহলে আমার কী হবে?’’ ভয় পেয়ে গিয়ে আমাদের যা বলা হয় আমরা তাই করি; তার সাথে কোনো ভালোবাসা কোনো প্রাণের টান থাকে না— তাই আমাদের মধ্যে এক বিসংগতি দেখা দেয়। যে যে জিনিস সর্বনাশা উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়, তাদের মধ্যে এই আন্তরিক বিসংগতি, এই বৈপরীত্য হলো অন্যতম।

সুতরাং শিক্ষার মূল কাজ হলো যা তোমরা করতে ভালোবাসো তা খুঁজে বার করতে সাহায্য করা; যাতে সেখানে তোমরা তোমাদের মন, তোমাদের হৃদয় উজাড় করে দিতে পারো। সেটাই সমস্ত সাধারণত্ব, মধ্যবিত্ত মানসিকতার ব্যর্থ আবর্জনাকে পরিষ্কার করে আর জীবনও মানবীয় মহত্ত্বের আভায় প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এইজন্য যোগ্য শিক্ষকের ও সঠিক পরিবেশের দরকার; তোমরা যাতে এক ভালোবাসার

পরিমণ্ডলে বড়ো হতে পারো সেটা খুবই প্রয়োজন। তখন তোমরা যাই করো না কেন— সেই ভালোবাসা সব কাজে তার নিজ স্বাক্ষর এঁকে দেবে, সেই ভালোবাসা তোমাদের সব কাজের মধ্যে দিয়ে নিজেকে বারবার প্রকাশ করবে। এই ভালোবাসা ছাড়া তোমাদের সব পরীক্ষা, সব জ্ঞান, সব যোগ্যতা, তোমাদের সব পদ, সব সম্পত্তি অসার ছাই। ওগুলো অর্থহীন। ঐ ভালোবাসা ছাড়া তোমরা আরো যুদ্ধ, আরো ঘৃণা, আরো কপটতা, আরো অবক্ষয় ও বিনষ্টী নিয়ে আসবে।

হয়তো এইসবের কোনো অর্থই নেই তোমাদের কাছে। তোমরা এখন খুব ছোটো। কিন্তু আশা রাখি তোমাদের শিক্ষকদের কাছে এবং তোমাদের কাছেও কোথাও অনেক গভীরে এইসব কিছু কোনো বার্তা বয়ে নিয়ে যাবে।

প্রশ্নকারী ঃ *আপনি এতো লাজুক কেন?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ জানো, জীবনে অপরিচিত, অজ্ঞাত হয়ে থাকার মতো অসাধারণ ব্যাপার খুব কমই আছে— খ্যাতি নয়, মহানতা নয়, জ্ঞানী নয়, বিরাট কোনো সমাজ সংস্কারক বা বিপ্লবী নয়— একেবারে নামগোত্রহীন একজন নগণ্য মানুষ। যখন সত্যকার কেউ তা অনুভব করে এবং হঠাৎ যদি অসংখ্য কৌতুহলীর ভিড়ের সম্মুখীন হয়— সে সাথে সাথে একটু গুটিয়ে যায়। ব্যস, এর মধ্যে এটুকুই রয়েছে।

প্রশ্নকারী ঃ *রোজকার জীবনে কীভাবে সত্যকে উপলব্ধি করা যাবে?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ তোমরা মনে করো সত্য এক জিনিস, আর তোমাদের প্রাত্যহিক জীবন অন্য কিছু। আর যাকে তোমরা সত্য বলে বলছো তাকে প্রাত্যহিক জীবনে উপলব্ধি করতে চাও। সত্য কি প্রাত্যহিক জীবনের থেকে পৃথক কিছু? যখন তোমরা আরো বড়ো হবে, তখন

তোমাদের উপার্জন করতে হবে, তাই নয় কি? মোট কথা সেইজন্যই তোমরা পরীক্ষাগুলো পাশ করো। একটা জীবিকার জন্যই এইসব কিছু। অনেকেই যতক্ষণ টাকা রোজগার করছে, ততক্ষণ কোন ক্ষেত্রে তারা কাজ করছে তা ভেবেও দেখে না। তাদের কাছে টাকাটাই মুখ্য, তা সে যে ধরণের কাজই হোক— সৈনিক বা পুলিশ বা আইনজীবি বা কোনো কপট ব্যবসায়ী।

এখন আমাদের জীবিকা অর্জনের কোন পথটি সঠিক— সেটার সত্যতা খোঁজা খুব প্রয়োজনীয়, তাই নয় কি? কারণ সত্য তোমার জীবনের মধ্যেই আছে, দূরে কোথাও নেই। তুমি কেমনভাবে কথা বলো, কী কথা বলো, কেমনভাবে হাসো, তোমার ব্যবহার প্রতারণাপূর্ণ কি না, অন্যকে উৎপীড়ন করো কি না— এটাই তোমার প্রতিদিনকার জীবনের সত্য। তাই কোনো সৈনিক, পুলিশ, আইনবিদ্ বা পাকা ব্যবসায়ী হওয়ার আগে সেই কাজটার সত্যতা একবার যাচাই করে নেওয়া কি উচিত নয়? যা করছো যদি তার সত্যতা না দেখে নাও, যদি তোমার সকল কাজ সে সত্য দ্বারা চালিত না হয়, তবে জীবন এক অদ্ভুত কিম্ভূতকিমাকার অবস্থাপ্রাপ্ত হয়।

এখন দেখা যাক তোমাদের সৈনিক হওয়া উচিত কি না, কারণ অন্য পেশাগুলো আরো একটু জটিল। এর সম্পর্কে যে ভালো-ভালো কথার প্রচার ও অন্য লোকেরা যা সব বলে থাকেন সেটাকে সরিয়ে রাখলে এই পেশার সত্যতাটা কী? যদি কেউ সৈনিক হয় তবে তার দেশকে বাঁচাতে তাকে যুদ্ধ করতে হবে। তাকে তার মনকে এমনভাবে তৈরী করতে হবে, যাতে সে কোনোক্রমে না-ভাবে, কেবল আজ্ঞা পালন করে। তাকে অন্যকে মেরে ফেলা বা অন্যের হাতে মৃত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে— এখন প্রশ্ন কীসের জন্য? কিছু গণ্যমান্য লোক বা কিছু তুচ্ছ লোক একটা বিশেষ ধারণা থেকে বলেছেন এটা ঠিক কাজ। সুতরাং সৈনিক হয়েছো নিজের বলিদান

দিতে এবং অন্যকে শবে পরিণত করতে। এটা কি কোনো সঠিক পেশা? কাউকে জিজ্ঞাসা কোরো না, নিজে এর সত্যতাটা আবিষ্কার করো। তোমাদের খুন করতে বলা হয়েছে ভবিষ্যতের অসাধারণ কোনো স্বপ্নরাষ্ট্রের জন্য— যেন যে ব্যক্তিটি তোমাদের বলেছেন ভবিষ্যত তাঁর নখদর্পণে। তোমাদের কি মনে হয়, অন্যকে হত্যা করা কি কোনো সঠিক পেশা হতে পারে? এই হত্যা— তোমাদের দেশের জন্যও হতে পারে বা কোনো সংগঠিত ধর্মের জন্যও হতে পারে। হত্যা কি কোনো অর্থেই সঠিক?

তোমাদের জীবন তথা এই বিশাল প্রাণময় প্রক্রিয়ায় যদি তোমরা সত্যকে আবিষ্কার করতে চাও, তোমাদের গভীরে গিয়ে এইসব বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হবে। তোমাদের মন, হৃদয় তাতে ঢেলে দিতে হবে। তোমাদের স্বাধীনভাবে, স্বচ্ছভাবে দেখতে হবে, পুরোনো কোনো ধারণা থাকলে হবে না। সত্য কিন্তু জীবন থেকে অনেক দূরে কোথাও রাখা নেই। তোমাদের প্রাত্যহিক জীবন প্রবাহের মধ্যেই সত্য রয়েছে।

প্রশ্নকারী ঃ *মূর্তি, গুরু বা সাধু মহাত্মারা কি সঠিকভাবে ধ্যান করতে সহায়তা করেন না?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ সত্যকার ধ্যান কী— সেটা কি তোমরা জানো? তোমরা নিজেরা কি এর সত্যতা খুঁজে বার করতে চাও না? যদি সেই ধ্যানের ব্যাপারে কারোর মতকে মেনে নাও, কারো প্রভাবকে স্বীকার করে নাও, তাহলে কোনোদিন কি নিজে তার সত্যতাকে খুঁজে পাবে?

এটা একটা গভীর প্রশ্ন। ধ্যানের শিল্পের সন্ধান পেতে গেলে তোমাদের চিন্তা নামক অসাধারণ প্রক্রিয়ার সমগ্র গভীরতা ও তার ব্যাপ্তিকে উপলব্ধি করতে হবে। যদি কেউ বলেন 'এই পদ্ধতিতে ধ্যান করো' আর তুমি যদি তা মেনে নাও, তাহলে তুমি একজন

অনুসারী মাত্র, তখন তুমি কোনো একটা পদ্ধতির বা মতবাদের অন্ধ দাসত্ব করছো। আর এই ব্যাপারে মেনে নেওয়াটাও আসে কোনো কিছু ফললাভের আশা থেকে, তাই ওটা কখনই ধ্যান নয়।

প্রশ্নকারী ঃ *ছাত্রদের কর্তব্য কী?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ 'কর্তব্য' কথার অর্থ কী? কীসের প্রতি কর্তব্য? কোনো রাজনীতিবিদের বক্তব্য অনুযায়ী দেশের প্রতি কর্তব্য? তোমাদের পিতামাতার খেয়াল, যেমনভাবে তাঁরা চান সেই অনুযায়ী চলার কর্তব্য? তাঁরা বলবেন তাঁরা যা যা বলেন সেইসব করাই হলো তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তাঁদের সমস্ত বলা— তাঁরা যেভাবে অতীত সময়টা কাটিয়েছেন তার দ্বারা ও পুরোনো পরম্পরার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবান্বিত। ছাত্রই-বা কে? এটা কি কোনো ছেলে বা মেয়ে যারা স্কুলে যায়, পরীক্ষায় পাশ করবে বলে কিছু বইপত্র পড়ে? নাকি শিক্ষার্থী হলো সে— যে নিরন্তর শিখে চলেছে— যার কাছে এ প্রক্রিয়া কখনো স্তব্ধ হয় না? খুব পরিষ্কারভাবেই বলা যায়, যে ছাত্র একটা পরীক্ষায় পাশ করবে বলে কিছু বিষয় পড়ে, তারপর সেই সবকে জলাঞ্জলি দেয় সে অবশ্যই ছাত্র নয়। আসল শিক্ষার্থী চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সেই সব শেষ করে না— আজীবন সে পড়ছে, শিখছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে, খুঁজছে।

শিক্ষার্থীর অর্থ হলো প্রতি মুহূর্তে সে শিখছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা শিখছো ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো শিক্ষকের প্রয়োজন নেই, তাই নয় কি? যে মুহূর্তে তোমরা শিক্ষার্থী— তখন বিশেষ কেউ তোমাদের শেখাচ্ছে না, কারণ তোমরা সব কিছু থেকেই শিখছো? হাওয়ায় ওড়া শুকনো পাতা, নদীর পারের শব্দ ছলাৎ ছলাৎ, অনেক উঁচুতে পাখির ওড়া, কোনো দরিদ্র এক মানুষের অনেক ভারী বোঝা বয়ে নিয়ে চলা, অথবা যাঁরা ভাবেন তাঁরা জীবন সম্বন্ধে সব

কিছু জানেন— তোমরা এইসব কিছু ও সবার থেকে শিখছো, তাই তোমাদের বিশেষ কোনো শিক্ষক নেই, তোমরাও কাউকে অনুসরণ করছো না।

তাই শিক্ষার্থীর একমাত্র কর্তব্য হলো শেখা। স্পেনে একজন বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন— নাম ছিল গোইয়া। তার শ্রেষ্ঠতাও ছিল অনস্বীকার্য। বৃদ্ধ শিল্পী একবার এক ছবির নীচে লিখলেন 'আমি এখনও শিখছি'। তোমরা বই থেকেও শিখতে পারো, কিন্তু এটা তোমাদের খুব বেশী দূর নিয়ে যাবে না। কোনো লেখকের কী বলার আছে, লেখক তোমাকে শুধু সেটাই বলেন। কিন্তু যে শেখা আত্মবোধ থেকে আসে তার কোনো সীমান্ত নেই, কারণ আত্মবোধের মাধ্যমে শেখা হলো— জানা, কীভাবে শুনতে হয়, কীভাবে দেখতে হয়, সেইজন্য সবকিছু থেকে শেখা চলতে থাকে। তখন কোনো সঙ্গীত অথবা অন্যে কী বলছে, কেমনভাবে সেটা বলছে, অথবা রাগ, লোভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা— সব কিছু থেকে শেখা চলতে থাকে।

এ পৃথিবী আমাদের। এটা সাম্যবাদী, সমাজবাদী বা পুঁজিবাদীদের পৃথিবী নয়। এখানে সুখে, পূর্ণতায়, দ্বন্দ্বহীনভাবে আমাদের বাঁচতে হবে। কিন্তু জীবনের সেই ঐশ্বর্য সেই আনন্দ এবং এক গভীর বোধ যে 'এই পৃথিবী আমাদের'— এইসব কিন্তু কোনোদিন বাধ্য করে বা জোর করে আনা যাবে না। ঐসব কিছু আমাদের ভিতর থেকে বিকশিত হতে হবে কারণ আমরা পৃথিবীকে ও তার সকল কিছুকে ভালোবাসি; আর ওটাই শিখে চলার অবস্থা।

প্রশ্নকারী ঃ *প্রেম এবং সম্মানের মধ্যে পার্থক্য কী?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ তুমি অভিধান দেখে এর উত্তর পেতে পারো। তুমি কি সেটাই জানতে চাও? তুমি কি ওদের উপরভাসা মানে জানতে চাও, নাকি শব্দগুলোর গভীরে যে তাৎপর্য আছে তা জানতে চাইছো?

যখন কোনো সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা কোনো মন্ত্রী বা রাজ্যপাল আসেন, সবাই তাঁদের কেমনভাবে অভিবাদন জানায় কোনোদিন দেখেছো? তুমি একে সম্মান জানানো বলো, তাই নয় কি? এমন সম্মান জানানো মিথ্যা, কারণ এই অভিবাদনের আড়ালে আছে ভয়, লোভ। তুমি ঐ বেচারা দৈত্যটার থেকে কিছু লাভের আশা করো বলে তার গলায় ফুলের মালা পরাও। ওটা কোনো সম্মান করা নয়, ওটা হলো একটা মুদ্রা, যেটা দিয়ে তুমি বাজারে কিছু কিনবে বা বেচবে বলে ঠিক করেছো। তুমি কিন্তু কখনো তোমার বাড়িতে যিনি কাজ করেন বা কোনো গ্রাম্য লোককে সম্মান করো না। তুমি তাঁকেই সম্মান করো যাঁর কাছ থেকে তুমি কিছু পাওয়ার আশা করো। আসলে এই ধরণের সম্মান ভয়েরই নামান্তর, এটা কোনো সম্মানই নয়। কিন্তু হৃদয়ে যদি প্রেম থাকে তবে রাজ্যপাল, তোমার শিক্ষক, তোমার বাড়ির কাজের লোক বা গ্রাম্য মানুষটি সবাই তোমার কাছে তখন সমান। যেহেতু ভালোবাসা কোনো প্রতিদান আশা করে না, তাই এঁদের সবার জন্য তোমার শ্রদ্ধা, তোমার গভীর অনুভূতি থাকে।

৮

সুসামঞ্জস্য

জীবনের অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে একটা ব্যাপার কি লক্ষ্য করেছো চিন্তায়-ভাবনায়, পোশাকে-পরিচ্ছদে, আমরা যেভাবে কাজ করি, আমাদের আচারে-আচরণে আমরা কেমন যেন এলোমেলো? কেন আমরা সময়নিষ্ঠ নই? কেনই-বা আমরা অন্যের প্রতি সহানুভূতিহীন বা অবিবেচক? এখন প্রশ্ন হলো, সেটা কী— যা আমাদের পোশাকে, চিন্তায়, চলনে-বলনে, যাঁদের ভাগ্য বিড়ম্বিত অথবা যাঁরা আমাদের থেকে কম সৌভাগ্যবান তাঁদের সাথে আচরণে তথা আমাদের সব কিছুর মধ্যে একটা সুসংগতি বা সুসামঞ্জস্য আনবে? কোনো জবরদস্তি ছাড়া বা পরিকল্পনা বা ইচ্ছে করে কোনোভাবে বিশেষ চিন্তার মধ্যে দিয়ে না গিয়ে, সেটা কী— যেটা এই সুশৃঙ্খলা নিয়ে আসে? এটা নিয়ে কি কোনোদিন ভাবনা-চিন্তা করেছো? তোমরা কি জানো এই শৃঙ্খলা বলতে আমি ঠিক কী বোঝাতে চাইছি? এটা হলো— কোনো উদ্বেগ ছাড়া শান্ত হয়ে বসা, সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে কোনো তড়িঘড়ি না করে খাওয়া, কোথাও কোনো ব্যস্ততা না থাকা, এবং প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে যথাযথ দৃষ্টি থাকা, চিন্তা সুস্পষ্ট স্বচ্ছ এবং বিস্তৃত হওয়া। আমার মনে হয় যা এই শৃঙ্খলাকে নিয়ে আসে তাকে আবিষ্কার করার জন্য যদি শিক্ষিত করা হয়, তাহলে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

অবশ্যই এই সুশৃঙ্খলা আসে সদ্‌গুণের মধ্যে দিয়ে। কেবলমাত্র ছোটো ছোটো ব্যাপারগুলোতেই নয়, যদি জীবনের সমস্ত ব্যাপারে সেই সদ্‌গুণের প্রকাশ না থাকে তথা তুমি যদি সদ্‌গুণসম্পন্ন না হও, তখন জীবন এক বিশৃঙ্খল কিছুতে পরিণত হয়, তাই নয় কি? এমনিতে সদ্‌গুণসম্পন্ন হওয়ার অর্থ খুবই কম, কিন্তু যখন সদ্‌গুণ থাকে তখন চিন্তার স্পষ্টতা আসে, সত্তার প্রতি কোণে এক সুশৃঙ্খলা, এক সুসংগতি দেখা যায় আর এটাই সদ্‌গুণের কাজ।

কিন্তু যখন কেউ এই সদ্‌গুণসম্পন্ন হওয়ার চেষ্টা করেন, যখন দয়ালু, কার্যকুশল, বিচারশীল, সুবিচেক হওয়ার জন্য নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকেন, যখন কেউ অন্যকে আঘাত না করার চেষ্টা করতে থাকেন, যখন তিনি সুশৃঙ্খলা আনার জন্য নিজের শক্তি ব্যয় করতে থাকেন অথবা ভালো হবার জন্য চেষ্টা করেন, তখন ঠিক কী ঘটে? তাঁর এই চেষ্টাগুলো তাঁকে সম্মানলাভের দিকে নিয়ে যায়, আর সেটা মনকে অতি সামান্য করে তোলে। তখন কিন্তু তিনি আর সদ্‌গুণ-সম্পন্ন নন।

কোনোদিন অন্তরঙ্গভাবে কোনো ফুলকে দেখেছো? যদিও সৌরভে মাধুর্যে অনন্য সে ফুল অতি কোমল, তবু তার পাপড়ির সজ্জা নিয়ে— তার উপস্থিতিতে, তার অস্তিত্বে এক অভাবনীয় স্পষ্টতা, এক অকপটতা রয়েছে। এখন কোনো ব্যক্তি সেই সুশৃঙ্খলা লাভের জন্য যদি চেষ্টা করেন তাঁর জীবনে হয়তো এক ঋজুতা আসবে; কিন্তু তাতে কোনো বিনম্রতা, কোনো কোমলতার সৌরভ থাকবে না। কারণ, এগুলো তোমাদের অস্তিত্বে তখনই আসে— যখন সেই ফুলের মতোই তোমাদের মধ্যে ঐ সব অর্জনের জন্য আর কোনো চেষ্টা থাকে না।

সুশৃঙ্খলা বা যথাযথতা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টার প্রভাব সংকীর্ণতা নিয়ে আসে। যদি আমি ইচ্ছাকৃত আমার ঘরটাকে ঠিকঠাক রাখতে চেষ্টা করি, যদি প্রতিটা জিনিসকে তার জায়গায় রাখার ব্যাপারে

লক্ষ্য করতে থাকি, যদি নিজেকেও লক্ষ্য রাখতে থাকি কোথায় পা ফেলছি ইত্যাদি ইত্যাদি— তখন ঠিক কী ঘটে? আমি নিজেই নিজের কাছে এবং অন্যের কাছে এক অসহনীয় উপস্থিতিতে পরিণত হই। ব্যাপারটা ভীষণই ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। একজন ক্লান্ত মানুষই সর্বদা অন্য কিছু একটা হওয়ার চেষ্টা করে। হয়তো তাঁর চিন্তার সম্ভার সযত্নে সাবধানে সাজানো থাকে, তিনি একটি চিন্তাকে বাতিল করেন আর একটিকে গ্রহণ করেন। হতে পারে তিনি পরিচ্ছন্ন, স্পষ্ট, তিনি কথাকেও যথাযথভাবে ব্যবহার করেন, হয়তো তিনি খুবই মনোযোগী ও বিবেচনাপূর্ণ; কিন্তু জীবনের সৃষ্টিশীল আনন্দের ধারা থেকে তিনি বহুদূরে কোথাও চলে গেছেন।

এখন প্রশ্ন, কী করে একজন জীবনে— সৃষ্টিশীল আনন্দ, অনুভূতির অমিত ব্যাপ্তি, চিন্তার বিরাট বিস্তার এবং তারই সাথে এক সুনিশ্চিত স্পষ্টতা, সুশৃঙ্খলা লাভ করবে? আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে অধিকাংশই সেরকম নয়, কারণ আমরা কোনো কিছুকেই তীব্রভাবে অনুভব করি না, কোনো কিছুতেই আমাদের হৃদয়ের, মনের সবটুকু ঢেলে দিই না। আমার একদিনের কথা মনে পড়ছে, দুটো লাল রঙের কাঠবেড়ালী— যেমন লম্বা তাদের লোমশ লেজ, তেমনই সুন্দর লোমে ঢাকা ছোট্ট শরীর; মিনিট দশেক একটা মস্ত উঁচু গাছে একজন একজনকে তাড়া করছে, উপরে উঠছে নীচে নামছে— প্রাণের আনন্দ খেলায় মেতেছে। কিন্তু যদি গভীরভাবে সবকিছুকে অনুভব না করি, যদি আমাদের জীবনে এক অভীপ্সা না থাকে, তবে আমরা সে আনন্দে আনন্দিত, আন্দোলিত হতে পারবো না। আমি ভালো কিছু করার, কোনো সংস্কার করার প্রবল ইচ্ছার কথা বলছি না, আমি কিছুকে গভীরভাবে অনুভবের প্রবল অনুরাগের কথা বলছি। তা আসে যখন আমাদের চিন্তায়, আমাদের সত্তায় এক সম্যক বিপ্লব চলতে থাকে।

তোমরা কি লক্ষ্য করেছো আমাদের মধ্যে কতো কম জনের সেই গভীর অনুভূতি রয়েছে? কোনোদিন শিক্ষকদের বা বাবা-মার বিরুদ্ধে কখনো বিদ্রোহ করেছো? এটা তোমরা কিছু অপছন্দ করছো বলে বিদ্রোহ এমন নয়; বরং তোমরা গভীরভাবে অনুভব করো যে বিশেষ কিছু জিনিস তোমরা করতে চাওনা— সেই কারণে এই বিদ্রোহ। যদি কোনো কিছুর সম্পর্কে এমন ঐকান্তিক অনুভূতি থাকে, তবে দেখো এই অনুভব এক অদ্ভুত পথে তোমাদের জীবনে নতুন শৃঙ্খলা ও সুসামঞ্জস্য এনে দেবে।

এমনিতে এই শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা বা চিন্তার স্বচ্ছতার নিজস্ব তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি সব কিছুকে তীব্রভাবে অনুভব করে এবং যাঁর ভিতরের বিপ্লবও বিরামহীনভাবে চলছে তাঁর কাছে ওগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গরীবের ভাগ্য বা বড়োলোকের গাড়ির ওড়ানো ধুলোয় ধূসর কোনো ভিখারীর মলিন মুখ যদি তোমাদের মধ্যে তীব্র অনুভূতি আনে, যদি সব কিছুর জন্য তোমাদের সত্তার দুয়ার উন্মুখ থাকে, তবে সেই সংবেদনা, সেই উন্মুক্ততা— শৃঙ্খলা ও সদ্‌গুণকে নিয়ে আসে। আমার মনে হয় শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই এই ব্যাপারটা বোঝা উচিত।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই এদেশেও আমরা অন্যের প্রতি কতো কম যত্নবান, কোনো কিছুকেই আমরা গভীরভাবে অনুভব করি না। আমাদের অধিকাংশই বুদ্ধিমান, অবশ্য সেটা খুব উপরভাসা অর্থেই, আসলে আমরা খুবই চতুর। কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক, কীভাবে ভাবতে হবে, কী করা উচিত— এইসব অসংখ্য শব্দে আর সিদ্ধান্তে আমাদের ভিতরটা ভর্তি। মানসিক দিক থেকে আমাদের বিকাশ হলেও ভিতরটা অন্তঃসারশূন্যই রয়ে গেছে। কিন্তু অন্তরের সারবত্তাই সঠিক ক্রিয়ার জন্ম দেয় এবং সেই ক্রিয়া আগের গড়া কোনো ধারণা থেকে জন্ম নেয় না।

তোমাদের তীব্রভাবে অনুভব করতে হবে— তীব্র অনুরাগ, তীব্র ক্রোধ— তাদের লক্ষ্য করতে হবে, তাদের নিয়ে খেলতে হবে, তাদের অন্তর্গত সত্য খুঁজে বার করতে হবে। যদি তোমরা ওগুলিকে দমন করো, যদি বলো, 'আমার রেগে যাওয়া উচিত নয়' অথবা 'বল্গাহীন অনুরাগ ঠিক নয়'— তাহলে লক্ষ্য করবে মন ক্রমশ ধারণার গড়া সীমানার বেষ্টনীতে আটকে পড়ছে এবং সেইজন্যই সমস্ত প্রখরতা হারাচ্ছে। তোমরা চতুর হতে পারো, বিশ্বের সকল তথ্যের ভাণ্ডারও হয়ে উঠতে পারো, কিন্তু যদি তীব্র এবং গভীর অনুভবের চেতনাশক্তিই না থাকে, তবে তোমাদের সব জ্ঞান অনেকটা সেই ফুলের মতো— যার ফুটে ওঠা হয়েছে, কিন্তু সৌরভের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠা হয়নি।

যখন তোমরা জীবন শুরু করতে চলেছো, তখনই এই ব্যাপারগুলো উপলব্ধি করতে হবে। তাহলে যখন বড়ো হবে তখন কোনো বইয়ের বা কোনো মতবাদের প্রভাবে পড়ে বিপ্লবী হয়ে উঠবে না— তোমরা হবে সত্যকার বিপ্লবী। সে বিপ্লবী একজন সম্পূর্ণ মানুষ, তার মধ্যে কোথাও কোনো পুরোনোর ছাপ নেই। মন তার তাজা, অতীতের কোনো কালিমায় তা মলিন নয়, সে অকপট— তাই সে মন এক অতুলনীয় সৃষ্টির ক্ষমতায় ধনী। এইসব কিছুর গুরুত্ব এখন না উপলব্ধি করলে, পরে জীবনের পট ধূসর হয়ে উঠবে। কারণ তোমরা তখন সমাজ, পরিবার, স্বামী, স্ত্রী, কতশত আদর্শ, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রবল ঘূর্ণাবর্তে ঘুরতে থাকবে। সেই কারণেই সঠিকভাবে শিক্ষিত হতে হবে। যার অর্থ শিক্ষকরা যেন তথাকথিত সভ্যতার যে প্রাচীর তোমাদের ঘিরে রেখেছে— তাকে ধূলিসাৎ করতে সাহায্য করেন। তোমরা যেন একই কাজের পুনরাবৃত্তি করে এক একটা অবোধ যন্ত্রে পরিণত না হও; তোমরা যাতে এক পূর্ণ সত্তা হয়ে ওঠো সেদিকে যেন তাঁরা লক্ষ্য রাখেন। তবেই অন্তরে থাকবে সঙ্গীত,

জীবন হবে আনন্দিত ও সৃষ্টিশীল।

প্রশ্নকারী ঃ *রাগ কী এবং লোকে রেগে যায় কেন?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ ধরো যদি আমি তোমার পা মাড়িয়ে দিই, তোমাকে খোঁচা দিই, বা তোমার থেকে কিছু নিয়ে নিই, তাহলে কি তুমি রেগে যাবে না? তুমি রাগবে নাই-বা কেন? কেন ভাবছো রাগ খারাপ জিনিস? কেউ তোমাকে বলেছে সেইজন্য কি? সুতরাং যেটা প্রয়োজনীয় সেটা হলো— কেন কেউ রাগ করে এবং রাগ ব্যাপারটার সত্যতা দেখা। শুধু বলার দরকার নেই এটা ভালো কি মন্দ।

এখন প্রশ্ন তুমি কেন রেগে যাও? তুমি আঘাত পেতে চাও না— এটা কিন্তু নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য স্বাভাবিক মানবীয় চাহিদা। কোনো ব্যক্তি বা সমাজ বা সরকার নিজেদের উদ্দেশ্যের জন্য তোমাকে ব্যবহার করুক, শোষণ করুক, পেষণ করুক, নষ্ট করুক— এর কোনোটাই তুমি চাও না। যখন কেউ তোমাকে একটা চড় মারে তুমি আঘাত পাও, অপমানিত হও এবং তুমি অবশ্যই সেই অনুভূতিটা পছন্দ করো না। যদি লোকটা তোমার চেয়ে বড়ো হয় বা ক্ষমতাশালী হয়, তাহলে পালটা আঘাতের প্রশ্নটা আসে না। তখন তুমি— যদি তোমার ভাই, বোন, বাড়ির কাজের লোক ইত্যাদি থেকে থাকে, তাদের কাউকে আঘাতটা ফিরিয়ে দাও, সুতরাং রাগের খেলাটা চলতেই থাকে।

প্রথমতঃ আঘাতকে এড়িয়ে যাওয়া স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। তোমাকে একজন এভাবে ব্যবহার করবে কেন? এখন আঘাত থেকে বাঁচতে তুমি নিজের চারিদিকে এক সুরক্ষার প্রাচীর গড়তে থাকো। অন্তরের দিক থেকে উন্মুক্ত না থেকে, সংবেদনাকে অসাড় করে দিয়ে ভিতরে ভিতরে নিঃশব্দে তোমার প্রাচীর গড়ার কাজ চলতে থকে। এইভাবেই মন— নতুন করে সন্ধান বন্ধ করে, বিরাট ব্যাপ্তির অনুভূতি থেকে

বঞ্চিত হয়। তুমি, রাগ এবং আরো অনেক অনুভূতিকে খারাপ বলো, তাদের দোষারোপ করো ; ধীরে ধীরে ভিতরে শুকনো আর ফাঁকা হয়ে ওঠো এবং গভীরভাবে কোনো কিছুই অনুভব করতে পারো না।

প্রশ্নকারী ঃ *আমরা আমাদের মাকে এতো ভালোবাসি কেন ?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ যদি তুমি তোমার বাবাকে ঘৃণা করো তাহলে কি মাকে ভালোবাসতে পারো ? খুব ভালো করে শোনো। যখন তোমরা কাউকে খুব ভালোবাসো, তখন কি অন্যদের সে ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করতে পারো ? যদি তুমি সত্যিই তোমার মাকে ভালোবাসো, তবে কি তুমি তোমার বাবা, কাকীমা, তোমার প্রতিবেশী, তোমাদের বাড়ির কাজের মানুষটিকে ভালোবাসবে না ? প্রথমে ভালোবাসার সেই অনুভূতিটা— তারপরে তুমি বিশেষ কাউকে ভালোবাসো, তাই নয় কি ? যখন তুমি বলছো, আমি আমার মাকে ভালোবাসি তখন তাঁর প্রতি কি তুমি অধিক যত্নবান হচ্ছো না ? তখন কি তুমি তাঁর জন্য কতোগুলো অর্থহীন বিড়ম্বনার সৃষ্টি করো ? যদি তোমার মায়ের ব্যাপারে তুমি যত্নবান হও, সহানুভূতিপূর্ণ হও, তবে কি তুমি তোমার ভাই, বোন, প্রতিবেশীর প্রতিও সমানভাব রাখবে না ? অন্যথায় তুমি তোমার মাকে ভালোবাসো না— ওগুলো কথার কথা, ওটা স্বার্থপূর্ণ।

প্রশ্নকারী ঃ *আমার ভিতরটা ঘৃণায় ভর্তি। আমাকে, কীভাবে ভালোবাসতে হয় শিখিয়ে দেবেন ?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ কোথাও কেউ তোমাকে কীভাবে ভালোবাসতে হয় শেখাতে পারবে না। যদি কেউ কাউকে এটা শেখাতে পারতো, তবে পৃথিবীর সব সমস্যার সরল সমাধান মিলতো— তাই নয় কি ? গণিত যেমন বই থেকে শিখি, তেমনই যদি কীভাবে ভালোবাসতে হয় কোনো বই থেকে শেখা যেত, তাহলে এটা একটা অন্য পৃথিবী হয়ে যেত। সে

পৃথিবীতে ঘৃণা থাকতো না, নিজের প্রয়োজনে অন্যকে ব্যবহার করা থাকতো না, ধনী দরিদ্রের বিভেদ থাকতো না, আমরা সবাই সবার দিকে মৈত্রীর হাত বাড়িয়ে দিতাম। কিন্তু ভালোবাসা এতো সহজে আসে না। ঘৃণা করা সহজ। ঘৃণা লোকেদের একটা সম্প্রদায়ে পরিণত করে, এটা বহুরকমের উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি করে; ঘৃণা বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতারও জন্ম দেয়, যেমনটি যুদ্ধে দেখা যায়। কিন্তু ভালোবাসা অনেক অনেক বেশী কঠিন। কীভাবে ভালোবাসতে হবে তা শিখতে পারবে না, যেটা পারো সেটা হলো ঘৃণাকে ভালো করে লক্ষ্য করো এবং খুব নম্রভাবে একে পাশে সরিয়ে রাখো। ঘৃণার সাথে লড়াই কোরো না, বলো না লোককে ঘৃণা করা কী জঘন্য, কুৎসিত ব্যাপার। কেবল একে লক্ষ্য করো— এটা আসলে 'কী'। একে নিঃশব্দে ঝরে যেতে দাও, এটা কোনো প্রয়োজনীয় বস্তু নয়। যা জরুরী তা হলো ঘৃণার বীজ যেন মনে অঙ্কুরিত না হয়, তার শিকড় যেন না প্রবেশ করে। মন এক উর্বরা ভূমির মতো, কোনো সমস্যার বীজকে প্রয়োজনীয় সময় দিলেই সে অঙ্কুরিত হবে, মূল চালিয়ে দেবে গভীরে। কিন্তু যদি সেই সমস্যাকে প্রয়োজনীয় সময় না দাও, এ বেড়ে ওঠার ভূমিটাই পাবে না, তাই বীজটা নষ্ট হয়ে যাবে। যদি ঘৃণার বীজটাকে সময়ের প্রশ্রয় দাও— তার অঙ্কুরোদ্গম হবে, তারপর একদিন সেটা সমস্যার মহীরূহে পরিণত হবে। প্রত্যেকবার যখন ঘৃণার ঢেউ উঠছে একে পেরিয়ে যেতে দাও। তখন দেখবে মন আর তরলিত আবেগে বিহ্বল নয়, অপরপক্ষে সে সব কিছুর ব্যাপারে সংবেদনশীল হয়ে উঠছে। তখন সে ভালোবাসাকে জানতে পারে।

মন— ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে পাওয়ার বা কোনো ইচ্ছাকে পূর্ণ করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু ভালোবাসাকে আনতে পারে না। ভালোবাসা স্বয়ংই মনের কাছে আসে। আর যখন ভালোবাসা আসে, তার কোনো দৈহিক বা ইন্দ্রিয়জ বা দৈবী বিভাগ থাকে না, থাকে

শুধুই ভালোবাসা। ভালোবাসার অসাধারণত্ব হলো, এ এমন কিছু— যা, সমগ্র অস্তিত্বের পূর্ণবোধ এনে দেয়।

প্রশ্নকারী ঃ *জীবনে আনন্দ কী?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ যদি কোনো কাজ তোমাকে সুখ দেয়, তুমি ভাবো সেই কাজটা করলে তুমি আনন্দ পাবে। তুমি হয়তো মনে করো সবচেয়ে ধনীকে বা সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে বিবাহ করলে বা কোনো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অথবা কারো কাছ থেকে প্রশংসা পেলে আনন্দকে পাবে। কিন্তু সেটা কি আনন্দ? সকালের ফোটা ফুল সন্ধ্যায় ঝরে যাওয়ার মতো সেই পাওয়া কি বিবর্ণ হয়ে যায় না? তবু এটাই আমাদের জীবন এবং এটাই আমরা সকলে চাই। একটা গাড়ি, একটু নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা, কিছু তুচ্ছ জিনিস নিয়ে আবেগ— এমনই কিছু উপরভাসা জিনিস নিয়েই আমাদের সন্তুষ্টি। এটা অনেকটা কোনো ছোটো ছেলের প্রবল হাওয়ার টানে ঘুড়ি ওড়ানোর আনন্দ পাওয়া, আর কিছু পরেই তার দুটো চোখ জলে ভাসার মতো ব্যাপার। এই আমাদের জীবন, আর এই নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট। কোনোদিন আমরা বলিনা ‘‘আমি আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমগ্র সত্তা দিয়ে, আমার পুরো শক্তিকে ঢেলে দিয়ে খুঁজে বার করবো আনন্দ কী’’। আমাদের মধ্যে আসলে সেই ঐকান্তিকতা নেই, আমরা গভীরভাবে এ ব্যাপারে অনুভব করি না, আমরা কতগুলো তুচ্ছ জিনিস নিয়েই বেশ তৃপ্ত।

আনন্দকে তুমি খুঁজতে পারো না, এটা একটা উপজাত কিছু, একটা কিছুর পরিণাম। আনন্দের জন্যই যদি আনন্দকে খুঁজতে থাকো তবে এর কোনো অর্থ নেই। আনন্দ আসে অনাহুতের মতো এবং যে মুহূর্তে তোমাতে তার উপস্থিতির ব্যাপারে তুমি সচেতন হও, সেই মুহূর্তে আনন্দ অন্তর্হিত হয়। এটা কোনোদিন কি লক্ষ্য করেছো? হঠাৎ যদি অকারণ তুমি আনন্দিত, সেখানে উন্মুক্ত প্রাণের হাসি রইলো,

আর যে মুহূর্তে তুমি এটার সম্পর্কে সচেতন হলে— সেই মুহূর্তেই সে আনন্দ আবার কোথায় হারিয়ে গেলো, তাই নয় কি ? আত্মসচেতন ভাবে আনন্দিত হওয়া বা তার জন্য খুঁজে ফেরা আনন্দের সমাপ্তি আনে। যখন এই 'স্ব' এবং তার চাহিদার জঞ্জাল সরিয়ে রাখো, তখনই সেখানে আনন্দের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে।

তোমাদের গণিতবিদ্যা সম্পর্কে কতো কিছু শেখানো হয়। তোমরা ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতির জন্য দিনের পর দিন ব্যয় করো; কিন্তু জীবনের এই গুরুতর ব্যাপারগুলোর জন্য কি তোমরা এবং তোমাদের শিক্ষকরা কোনো সময় ব্যয় করো ? কখনো কি মেরুদণ্ড সোজা রেখে, নড়াচড়া না করে, শান্ত হয়ে বসে নীরবতার সৌন্দর্যকে অনুভব করো ? কোনোদিন কি মনকে শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েই নয়, বিরাট বিস্তৃতিতে, অতল গভীরতায় বিচরণ করতে দিয়েছো— যাতে সে সন্ধান করতে পারে, আবিষ্কার করতে পারে ?

তোমরা কি জানো এই পৃথিবীতে কী ঘটছে ? বহির্বিশ্বে যা ঘটছে— তা আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে যা ঘটছে— তারই প্রতিফলন। তোমরা অন্তরে যা— সেটাই বাইরের পৃথিবী। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই অশান্তিতে আছে। আমরা লোভী, সব কিছুর অধিকার চাইছি, আমরা ঈর্ষান্বিত এবং অন্যকে আমরা অনবরত দোষারোপ করেই চলেছি। আবার এটাই ঠিক বাইরের পৃথিবীরও চিত্র, কেবল তার মধ্যে আরো বেশী নাটকীয়তা, আরো ক্রূরতা রয়েছে। কিন্তু তোমরা এইসবের জন্য কোনো সময় দাও না। যদি প্রতিদিন সততার সাথে, ঐকান্তিকতার সাথে কিছু সময় এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করো, তবে হয়তো এক পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব ঘটতে পারে, এক নতুন পৃথিবীর জন্ম নিতে পারে। একটা নতুন পৃথিবী গড়তেই হবে। সেটা— পৃথিবীর এই ক্ষয়িত, গলিত সমাজেরই অন্য রূপ নয়, তাকে একেবারে ভিন্ন কিছু হতে হবে। যদি তোমাদের মন সজাগ না হয়, লক্ষ্য না করে, প্রগাঢ়ভাবে

অনুভব না করে, তবে সেই নতুন পৃথিবী গড়া সম্ভব নয়। তাই তোমাদের এই অল্প বয়সেই এইসব গভীর বিষয়ে প্রতিদিন কিছু সময় চিন্তাভাবনা করতে হবে। শুধু কতকগুলো বিষয় পড়া, কতকগুলো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, তোমাদের একটা চাকরি ও পরিশেষে মৃত্যু— এইটুকুই দিতে পারে। সত্যিই ঐকান্তিকভাবে এইসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা কোরো, দেখো— এর থেকে এক অনন্য আনন্দের, এক প্রসন্নতার অনুভব আসছে।

প্রশ্নকারী ঃ *সত্যজীবন কী?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ ''সত্যজীবন কী?'' একটি ছোট্ট ছেলে এ প্রশ্ন করছে। খেলা, ভালো ভালো খাবার খাওয়া, দৌড়ঝাঁপ করা, ঠেলাঠেলি করা— এটাই ওর কাছে বাস্তবিক জীবন। একটা ব্যাপার দেখছো কি, আমরা জীবনকে দুইভাগে ভাগ করে দিই— সত্যজীবন এবং যে জীবন মেকি, যে জীবন মিথ্যা। সত্যজীবন হলো যা অন্তর থেকে ভালোবাসো— সত্তার সবটুকু সামর্থ্য কাজে লাগিয়ে সেটা করা, আর সেখানে তুমি যা করছো, আর তোমার যা করা উচিত বলে তুমি মনে করো— এই দুইয়ের মধ্যে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকবে না। জীবন তখন এক অখণ্ড প্রবাহে পরিণত হবে (যেখানে ঐ অন্তর্দ্বন্দ্ব জীবনকে বার বার খণ্ডিত করে না)। সেখানে অশেষ আনন্দ। আসলে যখন তুমি মানসিকভাবে কোনো ব্যক্তির উপর, সমাজের উপর নির্ভর করো না, যখন ভিতরে ভিতরে এইসব কিছুর প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত, তখনই তুমি যেটাকে সত্যই ভালোবাসো, সেটা করতে পারার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং জীবনের সেই অখণ্ডতা আসে। এই ধরণের সম্পূর্ণ অন্তরের বিপ্লব যদি ঘটে, তাহলে সে তুমি বাগানের মালীই হও বা প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কিছু— তুমি যাই করো তা গভীর ভালোবাসার সাথে করো এবং সেই ভালোবাসা থেকে এক অসাধারণ সৃষ্টিশীলতার অনুভূতি আসে।

৯

মুক্ত মন

'শেখা' কী— জানাটা খুবই আকর্ষণীয় ব্যাপার। আমরা বই বা শিক্ষকের থেকে অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস শিখি। লণ্ডন, মস্কো বা নিউইয়র্ক কোথায় তা জানি, কী করে একটা মেসিন কাজ করে সে সম্পর্কে শিখি অথবা কী করে পাখী বাসা বাঁধে, কীভাবে তার বাচ্চাদের যত্ন নেয়— এইসব কিছু আমরা শিখি। আমরা পড়াশুনা করে বা লক্ষ্য করে করে শিখতে থাকি। এটা একধরণের শেখা।

শেখার কি আরো একটা পথ নেই— যে শেখা অনুভবের মধ্যে দিয়ে আসে? নদীর জল শান্ত, একটা পালতোলা নৌকা ভাসছে আর তার প্রতিবিম্ব সেই শান্ত জলে যখন দেখো, সেটা কি একটা অসাধারণ অনুভূতি নয়? তখন কী ঘটে? মন যেমন জ্ঞানকে সংগ্রহ করে, তেমনই এমন অনুভূতিকেও সে স্মৃতিতে রেখে দেয়। পরের সন্ধ্যায় আমরা আবার সেই নৌকা দেখতে যাই। একটা আশা নিয়ে যাই— যেন আগের দিনের মতোই এক আনন্দের অনুভূতি, শান্তির অনুভূতি যা কখনো-সখনো আমাদের জীবনে আসে তেমনি একটা কিছু পাই। মন খুব যত্নের সাথে অভিজ্ঞতাগুলো সংগ্রহ করতে থাকে, আর এই অভিজ্ঞতা বা অনুভবের সংগ্রহ যা স্মৃতিরূপে থাকে, তাই আমাদের চিন্তা করায়, তাই নয় কি? আমরা যাকে চিন্তা বলি তা স্মৃতির প্রতিক্রিয়া। আমরা নৌকার নদীতে ভেসে থাকা দেখেছি, এক আনন্দের অনুভূতি

পেয়েছি, সেটাকে মস্তিষ্কে স্মৃতিরূপে সংগ্রহ করেছি, তারপর আমরা আবার সেই অনুভূতিটা লাভ করতে চাইছি; এইভাবে আমাদের চিন্তার প্রক্রিয়াও নিরন্তর চলতে থাকে, তাই নয় কি?

আমাদের মধ্যে খুব কম মানুষই জানেন কীভাবে ভাবতে হয়। আমরা বই থেকে যা পড়েছি, অন্যের কাছে যা শুনেছি, সেটাই চিন্তারূপে পুনরাবৃত্তি করতে থাকি; অথবা আমাদের চিন্তা হলো আমাদের নিজেদের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার যে স্মৃতি— তার পরিণাম। আমরা সারা পৃথিবীতে ঘুরি, অসংখ্য অভিজ্ঞতা লাভ হয়, অসংখ্য মানুষের সাথে দেখা হয়; আমরা শুনি তাঁরা কী বলেন, আমরা তাঁদের আচারব্যবহার, ধর্ম, আদবকায়দা সব লক্ষ্য করি এবং সেগুলো স্মৃতিরূপে জমিয়ে রাখি। আর সেখান থেকে চিন্তার সৃষ্টি হয়। এই স্মৃতি দিয়েই আমরা তুলনা করি, কোনো কিছুর বিচার করি, কোনো কিছু বেছে নিই এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা জীবনের প্রতি একটা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করবো মনে করি। কিন্তু এই ধরণের পূর্বঅভিজ্ঞতার স্মৃতি থেকে সৃষ্ট চিন্তা খুবই ক্ষুদ্র সীমার বেষ্টনীতে ঘোরাফেরা করে। আমরা নৌকাকে ভেসে যেতে, কোনো মৃতদেহকে শ্মশানে বয়ে নিয়ে যেতে, অথবা কোনো গ্রামের মহিলাকে খুব ভারী বোঝা বয়ে নিয়ে যেতে দেখি। সেইসব ছবি আমাদের মনে থাকে। কিন্তু আমরা সংবেদনশীল নই, তাই এগুলোর গূঢ় ব্যঞ্জনা আমাদের অন্তর্লোকের গভীরে প্রবেশ করে না, সেখানে কোনো সম্ভবনার সৃষ্টি করে না। আমাদের চারিপাশের সকল কিছুর প্রতি গভীর সংবেদনা, আমাদের মধ্যে একেবারে ভিন্ন ধরণের চিন্তাধারার জন্ম দেয়। আমাদের সংস্কার বা জ্ঞান— সে চিন্তাধারাকে কলুষিত বা সীমাবদ্ধ করতে পারে না।

যদি কোনো বিশ্বাসকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরো বা কোনো আগের গড়া ধারণা দিয়ে বা পুরানো পরম্পরার আলোকে কোনো কিছুকে

দেখো তবে জীবনের যে সত্যতা, জীবনের যে বাস্তবতা— তার সাথে তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। কোনো গ্রামীণ মহিলাকে খুব ভারী বোঝা মাথায় করে শহরের দিকে যেতে দেখেছো? যখন তোমরা এটা দেখো তোমাদের মধ্যে কী ঘটে, কী অনুভব করো? নাকি এ দৃশ্য অনেক দেখেছো, অভ্যাস হয়ে গেছে, এটা আর নতুন করে কোনো অভিঘাত সৃষ্টি করে না। ধরো যদি প্রথমবারের জন্যও কোনো জিনিস দেখো— তখন কী ঘটে? তোমরা আগের কোনো একটা ধারণা দিয়ে একে ব্যাখ্যা করে নাও, তাই নয় কি? তোমরা সাম্যবাদ, সমাজবাদ, বা পুঁজিবাদ বা অন্য কোনো 'বাদ'-এর মাধ্যমে একে দেখো এবং সেইমতো এর অনুভূতি লাভ করো। যদি এমন কোনো সংস্কার বা কোনো পূর্বের গড়া ধারণার পর্দার ভিতর দিয়ে না দেখো এবং ব্যাপারটার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসো তবে দেখবে তোমাদের এবং তোমরা যা দেখছো তার মধ্যে এক অদ্ভুত সম্পর্কের স্থাপনা হয়। যদি এই আগের গড়া ধারণা, পক্ষপাত— এ সবের যবনিকা একবার উঠে যায়, তখন সেই উন্মুক্ততায় দেখো— তোমাদের চারপাশের সবকিছুরই এক অসাধারণ আকর্ষণী ক্ষমতা আছে, সবকিছুই এক উদ্দাম প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত।

তাই তোমরা যখন বয়সে ছোটো, তখনই এইসব কিছুকে লক্ষ্য করা একান্ত প্রয়োজন। নৌকার নদীতে বয়ে চলে যাওয়া, কোনো ট্রেনের যাওয়া অথবা কোনো গ্রাম্য লোকের ভারী বোঝা নিয়ে যাওয়াকে দেখো, ধনীর ধৃষ্টতা, কোনো মন্ত্রী বা বড়ো লোকের গর্বিত ভাব, অথবা যাঁরা মনে করেন তাঁরা অনেক জানেন তাঁদের— লক্ষ্য করো— শুধু লক্ষ্যই করো, সমালোচনা বা নিন্দা কোরো না। যে মুহূর্তে নিন্দা করবে, সেই মুহূর্তে তাঁদের এবং তোমার মাঝে একটা ব্যবধান তৈরী হবে। কিন্তু যদি কেবল গভীরভাবে লক্ষ্য করতে থাকো তাহলে দেখবে তোমাদের সাথে আশেপাশের ব্যক্তি ও বস্তুর এক প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে উঠছে। যদি তোমরা তাঁদের সম্পর্কে কোনো ভালো-

মন্দ, ঠিক-বেঠিক ইত্যাদি বিচার না করে, কোনো সিদ্ধান্তে না পৌঁছে, শুধু খুব সচেতনভাবে লক্ষ্য করতে থাকো, তবে দেখবে চিন্তা আশ্চর্যজনকভাবে সূক্ষ্ম হয়ে যাচ্ছে। তখন তুমি প্রতিক্ষণ শিখেই চলেছো।

তোমাদের চারিপাশে যেদিকে তাকাও দেখবে জন্ম আর মৃত্যু; দেখবে অর্থ, সম্মান, ক্ষমতার জন্য চলছে সংগ্রাম। এই বিরামহীন প্রক্রিয়াকে আমরা জীবন বলি; যদিও তোমরা খুবই ছোটো, তবুও মাঝে মাঝে কি মনে হয় না এগুলো কী? আমাদের মধ্যে অধিকাংশই একটা তৈরী উত্তর চায়, আমরা চাই কেউ আমাদের বলে দিক— এইসব কী? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা কোনো রাজনৈতিক বা কোনো ধর্মীয় বই বেছে নিই অথবা কাউকে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু বই থেকে তো জীবনের সম্পর্কে উপলব্ধি আসবে না; কেউ আমাদের তা বলে দিতেও পারে না। অন্যকে অনুসরণ বা পূজা-প্রার্থনার মধ্যে দিয়েও আমরা এই ব্যাপারটা অনুভব করতে পারবো না। আমাদের নিজেদের এটা উপলব্ধি করতে হবে। যখন আমরা চারিপাশের সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, যখন আমরা লক্ষ্য করছি, সব কিছু যখন আমাদের আকর্ষণ করছে, আমরা যখন জীবন্ত— তখন এই অনুভব আসে। তখনই আমরা সত্যকার আনন্দ কী, তা আবিষ্কার করি।

অধিকাংশ লোকই অসুখী। তারা অসুখী কারণ তাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই। যখন অন্যের আর তোমার মাঝে কোনো প্রাচীর থাকে না, তুমি অন্যের সাথে মিলিত হও, তার বিচার করো না, শুধু তাকে দেখো— তখন ভালোবাসা আসে। যখন একটি পালতোলা নৌকাকে নদীতে ভাসমান দেখো— কেবলমাত্র দেখো, তার সৌন্দর্যকে অনুভব করো— তখন ভালোবাসা আসে। প্রত্যেক কিছু যা— তাকে সেভাবেই দেখার দৃষ্টিকে আগের থেকে গড়া কিছু ধারণা দিয়ে আবিল কোরো না। এই গাছ, পাখী, এই মানুষের চলাচল, তাদের কর্মব্যস্ততা, তাদের

হাসিকে যদি শুদ্ধ, সাধারণ দৃষ্টিতে দেখো, এদের প্রতি যদি সচেতন হও দেখবে— তোমাদের ভিতরে অনির্ণেয় কিছু ঘটছে। হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তা না ঘটলে, প্রেমের জাগরণ না ঘটলে জীবনের খুব স্বল্পই অর্থ থাকে। তাই শিক্ষকদেরও এমনভাবে শিক্ষিত হতে হবে, তাঁরা যেন তোমাদের এইসব ব্যাপারের তাৎপর্য বুঝতে সহায়তা করতে পারেন।

প্রশ্নকারী ঃ *আমরা বিলাসবহুলভাবে বাঁচতে চাই কেন?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ তুমি বিলাসিতা অর্থে কী বোঝাতে চাইছো? পরিচ্ছন্ন পোশাক, নিজের শরীরকে পরিষ্কার রাখা, সঠিক খাবার খাওয়া— একে কি তুমি বিলাসিতা বলছো? যে মানুষ খেতে পায় না, নোংরা ছেঁড়া কাপড় পরে, রোজ স্নান করতে পারে না, তার কাছে এগুলো অবশ্যই বিলাসিতা। সুতরাং বিলাসিতার সংজ্ঞা বা অর্থ এক একজনের চাওয়া অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। এটা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার।

এখন একটা ব্যাপার কি তুমি জানো— যদি তুমি বিলাসপ্রিয় হও, আরামে আসক্ত থাকো, যদি সবসময় সোফা বা কোনো বিরাট গদি-আঁটা চেয়ারে বসতে চাও, তাহলে তোমার কী হয়? তোমার মন ঘুমিয়ে পড়ে। অল্প শারীরিক আরাম ভালো, কিন্তু আরামের উপর জোর দেওয়া, তাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হলো মনকে ঘুমিয়ে যেতে সাহায্য করা। কোনোদিন লক্ষ্য করেছো অধিকাংশ মোটা লোকেরা কী সুখী। তাদের মেদের মোটা চাদর ভেদ করে কিছুই যেন তাদের বিক্ষুব্ধ করতে পারে না। ওটা শারীরিক ব্যাপার। কিন্তু মনও মোটা মেদের চাদর গায়ে দিয়ে নেয়। সেই মন কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে বা কোনো কারণে বিক্ষুব্ধ হতে চায় না, এবং তা ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে। আমরা সাধারণত যাকে শিক্ষা বলি তা কিন্তু ছাত্রদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়। এর কারণ ছাত্র যদি কোনো শাণিত, কোনো গভীর

প্রশ্ন করে, শিক্ষকরা বিব্রত হয়ে পড়েন। তাঁরা তাড়াতাড়ি বলেন, ‘‘আমাদের এই অধ্যায়টা শেষ করতে হবে’’।

সুতরাং মন যখন কোনো অভ্যাসে, কোনো বিশ্বাসে, কোনো বিশেষ জায়গা যাকে ‘আমার বাড়ী’ বলে তাতে বা কোনোপ্রকার আরামে আসক্ত— তখন মন ঘুমাতে শুরু করে। এই ব্যাপারটা বোঝা জরুরী। আমরা বিলাসবহুলভাবে থাকবো না থাকবো-না— এ প্রশ্ন ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে মন সচেতন, সক্রিয় এবং সবসময় লক্ষ্য করছে সেই মন কোনো আরামে আসক্ত নয়। বিলাস তার কাছে একটা অর্থহীন ব্যাপার। অপরপক্ষে খুব অল্পসংখ্যক কিছু কাপড় থাকা মানেই কিন্তু সেই ব্যক্তির মন সজাগ— এমন নয়। সন্ন্যাসী, বাহ্যিকভাবে যিনি অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করেন, অন্তরে হয়তো ভারী জটিল, হয়তো তিনি সদ্‌গুণের উৎকর্ষসাধনের চেষ্টা চালান অথবা ভগবান বা সত্য লাভ করতে চান। আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এক আভ্যন্তরীণ সরলতা, সংযম, অনাড়ম্বরতা। যার অর্থ একটা মন, যেটা কতক বিশ্বাস, কতক ভয় আর রাশি রাশি কামনা দিয়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা নয়। এসব থেকে মুক্ত মনই সঠিক চিন্তা করতে পারে, অনুসন্ধান করতে পারে।

প্রশ্নকারী ঃ *যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরিবেশের সাথে লড়াই করবো আমাদের জীবনে কি শান্তি আসবে ?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ তোমাদের কি পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করা উচিত নয় ? তার বাধাকে কি তোমাদের অতিক্রম করা উচিত নয় ? তোমাদের বাবা-মা যা গভীরভাবে বিশ্বাস করেন, তোমাদের সামাজিক পটভূমি, বহুশতাব্দীর ঐতিহ্য, যে ধরণের খাবার তোমরা খাও এবং তোমাদের চারপাশের বহুকিছু যেমন ধর্ম, পুরোহিত, ধনী, দরিদ্র— এসব নিয়েই তোমাদের পরিবেশ। এই পরিবেশের সত্যতা কতটা তাকে প্রশ্নের

মাধ্যমে, তার বিরুদ্ধে বিপ্লবের মাধ্যমে কি এর বাধাকে ভেদ করে এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়? যদি বিপ্লব না থাকে, যদি এই পরিবেশকে মানিয়ে নাও তবে অবশ্যই এক ধরণের শান্তি থাকবে, তা হলো শবের শীতল শান্তি। কিন্তু এই পরিবেশের যবনিকাকে ভেদ করে, নিজেই যদি সত্য কী তা খুঁজে বার করতে পারো, তাহলে দেখো এক ভিন্ন প্রশান্তি আবিষ্কার করবে। সে প্রশান্তি কোনো বদ্ধতার প্রশান্তি নয়। তোমাদের পরিবেশের সাথে সংগ্রাম জরুরী। অবশ্যই তা করতে হবে। কারণ ঐ মৃতের প্রশান্তির খুব একটা মূল্য নেই। পরিবেশকে উপলব্ধি করা এবং তার বাধাকে ভেদ করা প্রয়োজন; আর সেখান থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এক সহজ শান্তি আসে। কিন্তু পরিবেশকে মানিয়ে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে যদি শান্তি পেতে চাও তাহলে তোমাদের মন ঘুমিয়ে পড়বে, এবং তার মৃত্যু ঘটতে পারে। তাই খুব ছোটো থেকেই তোমাদের মধ্যে সেই বৈপ্লবিক উত্তাপ থাকা উচিত; তা না হলে ক্ষয়িত হয়ে যাবে, তাই নয় কি?

প্রশ্নকারী ঃ *আপনি কি সুখী, না তা নয়?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ জানিনা। কোনোদিন ভাবিনি। যে মুহূর্তে তুমি ভাবো তুমি সুখী— তোমার সুখ মিলিয়ে যায়, তাই নয় কি? যখন উৎফুল্ল হয়ে দৌড়োদৌড়ি করছো, খেলছো, হঠাৎ যদি নিজে সচেতন হও যে তুমি প্রফুল্ল— তখন কী ঘটে? তোমার সেই উচ্ছলতা, তোমার সেই স্ফূর্তি নিমেষেই মিলিয়ে যায়। এটা কি কখনও লক্ষ্য করেছো, আনন্দ সব সময়ই কারোর নিজের প্রতি নিজের সচেতনতার ক্ষেত্রের বাইরে থাকে।

যখন তুমি ভালো হওয়ার চেষ্টা করো তখন কি তুমি ভালো? এই যে ভালো হওয়া এটা কি অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে আসে? নাকি তুমি লক্ষ্য করো, উপলব্ধি করো, তাই এটা সহজে আসে? একইভাবে

যখন তুমি সচেতন যে তুমি সুখী, সুখ ততক্ষণে জানালা দিয়ে উধাও হয়ে গেছে। সুখ খোঁজাটাই একটা অর্থহীন ব্যাপার, কারণ যখন তুমি সুখ খোঁজো না, তখনই এটা থাকে।

তোমরা কি জানো 'নম্রতা' শব্দটার অর্থ কী? কেউ কি নম্র হওয়ার জন্য অভ্যাস করতে পারে, নম্রতার উৎকর্ষসাধন করতে পারে? যদি রোজ সকালে উঠে তুমি বলো 'আমি নম্র হবো', সেটা কি নম্রতা? নাকি যখন গর্ব, অহঙ্কারের মালিন্য থাকে না— নম্রতা নিজেই দেখা দেয়? একইভাবে যখন যা যা সুখের থাকায় বাধা দেয় তা না থাকে, যখন উদ্বেগ, হতাশা, অথবা কীসে কীভাবে একটু নিরাপত্তা পাওয়া যায় তার খোঁজ আর না থাকে, তখন সুখ সেখানে সমাসীন, তোমাকে তার খোঁজ করতে হয় না।

তোমাদের মধ্যে বেশীর ভাগই সব চুপচাপ কেন? আমার সাথে আলোচনা করছো না কেন? তোমাদের চিন্তা, তোমাদের অনুভূতিগুলো প্রকাশ করা জরুরী। সেগুলো খারাপও হতে পারে। কিন্তু এই প্রকাশ করাটা যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে— তার কারণটাও বলছি। যত সংকোচের সাথেই হোক না কেন— যদি তোমরা নিজেদের ভাবনা, নিজেদের অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করতে শুরু করো, তবে যখন বড়ো হবে তোমরা তোমাদের পরিবেশ, পরিস্থিতি, বাবা-মা, সমাজ, পরম্পরার দ্বারা অবদমিত হবে না। জানি, দুর্ভাগ্যজনকভাবেই তোমাদের শিক্ষকরা তোমাদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করেন না, তোমরা যে কী ভাবো, তাঁরা কখনোই তা জিজ্ঞাসা করেন না।

প্রশ্নকারী ঃ *আমরা কাঁদি কেন? দুঃখই-বা কী?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ একটা ছোট্ট ছেলে— আমরা কাঁদি কেন, আর দুঃখ কী— এগুলো জানতে চাইছে। এখন বলো, তুমি কখন কাঁদো? যখন কেউ তোমার খেলনা নিয়ে নেয়, যখন তুমি মনে আঘাত পাও, যখন কোনো

খেলায় হেরে যাও, যখন বাবা-মা তোমাকে তিরস্কার করেন অথবা কেউ তোমাকে শারীরিকভাবে আঘাত করে তখন তুমি কাঁদো। তারপর যত বড়ো হতে থাকো এই কান্নাও কমে আসে, জীবন থেকে আসা কোনো আঘাত যাতে তোমাদের না লাগে তারজন্য তোমরা নিজেদের চারিদিকে একটা শক্ত খোলা গড়ে তোলো। খুব কম প্রাপ্তবয়স্ক লোকই কাঁদেন। আমরা শৈশবের সেই অসাধারণ সংবেদনশীলতাকে হারিয়ে ফেলি। কোনো কিছু হারালে বা জীবনে হঠাৎ থেমে যাওয়া বা হতাশা থেকেই কেবল দুঃখ আসে তা নয়, দুঃখ আরো আরো গভীর কিছু। অবোধ অস্তিত্বের এক গভীর দুঃখ রয়েছে। আবার মন যদি তার সীমানার সংকীর্ণতাকে অতিক্রম না করে, সেখানেও এক গভীর দুঃখ থাকে।

প্রশ্নকারী ঃ *সংঘর্ষ ছাড়া দ্বন্দ্ব ছাড়া, আমরা কী করে অখণ্ডতা লাভ করবো?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ তোমরা কেন এই সংঘর্ষের বিরোধিতা করো? তোমরা সবাই মনে করো এই সংঘর্ষ একটা ভয়ঙ্কর জিনিস। এই মুহূর্তে তোমাদের সাথে আমার তো একটা দ্বন্দ্বই চলছে। আমি তোমাদের কিছু বলতে চাইছি এবং তোমরা বুঝতে পারছ না, সুতরাং এখানে একটা সংঘর্ষের বোধ দেখা দিচ্ছে। এই সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্ব বা বিক্ষুব্ধতার মধ্যে খারাপটা কোথায়? আমাদের কি বিক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়? সংঘর্ষকে এড়িয়ে গিয়ে, দ্বন্দ্ব থেকে পালিয়ে গিয়ে যখন তোমরা অখণ্ডতা খোঁজো তা কখনোই আসে না। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে এবং সেই দ্বন্দ্বকে উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই এই অখণ্ডতা আসে।

এই অখণ্ডতা লাভ কিন্তু খুব সহজ নয়। এর মানে হলো তুমি যা করো, যা বলো, যা ভাবো তথা তোমার সমগ্র সত্তার ঐক্যসাধন করা। সম্পর্ককে না বুঝলে সত্তার এই সমন্বয় আসে না। তোমার সাথে সমাজের, কোনো দরিদ্রের, কোনো গ্রাম্য মানুষের, কোনো লক্ষপতির

অথবা রাজ্যপালের সম্পর্ক কী— সেইসব বুঝতে হবে। পরম্পরা, তোমাদের বাবা-মা, পুরোহিত, ধর্ম বা আর্থসামাজিক পরিকাঠামো দ্বারা নির্ণীত মূল্যগুলোকে প্রশ্ন করতে হবে, শুধুমাত্র তাদের জড়ের মতো মেনে নিলেই চলবে না। তাই বিপ্লব প্রয়োজন। এই বিপ্লব ছাড়া সেই অখণ্ডতা, সেই সমন্বয়কে কখনই খুঁজে পাবে না।

১০

অন্তরের সৌন্দর্য

আমার মনে হয় জীবনের কোনো-না-কোনোসময় আমরা প্রত্যেকেই— বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তর, দিনান্তের শেষ সূর্য, স্তব্ধ জলরাশি, অথবা তুষারাবৃত শিখর থেকে বয়ে আসা শান্তি আর সৌন্দর্যের প্রবাহকে অনুভব করেছি। কিন্তু সৌন্দর্য কী? এটা কি আমরা যা অনুভব করছি তার স্বীকৃতি, নাকি এ ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরের কিছু? যদি পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে তোমার সুরুচি থাকে, যে রঙের পোশাক পরো তা যদি সবের সাথে সমন্বয় সাধন করে, যদি তোমার আচার-আচরণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ হয়, তুমি শান্ত ধীর স্থিরভাবে কথা বলো এবং সোজাভাবে দাঁড়াও বা বসো, তাহলে এইসব এক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, তাই নয় কি? কিন্তু এটা অন্তরের অবস্থার বাহ্যিক প্রকাশ। এটা তোমার লেখা কোনো কবিতা বা তোমার আঁকা কোনো ছবির মতো— অন্তরের অবস্থার বাহ্যিক অভিব্যক্তি। নদীর জলে সবুজ পাড়ের প্রতিবিম্ব তুমি দেখতেও পারো আবার নাও পারো; এক ঝাঁক পাখি যখন জলের বুক ছুঁয়ে উড়ে যেতে থাকে— তা যদি যে জেলেরা রোজ-রোজ ওগুলো দেখতে পায় তাদের মতো করেই তুমি দেখো, তাহলে তার অর্থ খুবই কম। কিন্তু, যদি এমনই সব সৌন্দর্যের প্রতি তুমি উন্মুক্ত থাকো, তাহলে তোমার মধ্যে এমন কী ঘটে— যা তোমাকে দিয়ে বলায়, 'আহা কী সুন্দর'? এই অন্তরের সৌন্দর্যবোধ, তার অনুভবের রহস্যটা

কী? কী অন্তরের এই সৌন্দর্যবোধকে সৃষ্টি করে? অবশ্যই বাহ্যিক সৌন্দর্যের একটা ব্যাপার রয়েছে— যেমন রুচিসম্পন্ন পোষাক, সুন্দর ছবি, মনোহর আসবাবপত্র অথবা একেবারে তাদের অনুপস্থিতি, সুষম দেওয়াল আর নিখুঁত আকৃতির জানালা ইত্যাদি। আমি কেবল সেই সৌন্দর্য নিয়েই কথা বলছি না। আমি বলতে চাইছি— কী সেই আন্তরিক সৌন্দর্যকে জাগিয়ে তোলে?

এই আন্তরিক সৌন্দর্যের জন্য পূর্ণ সমর্পণ প্রয়োজন। নিজের মধ্যে— কোনো কিছুর সাথে বদ্ধ থাকা, কোনো কিছুকে অবদমিত করা বা বাধা দেওয়া থাকবে না। কিন্তু এই সমর্পণ, সংযম ছাড়া বিশৃঙ্খল হয়ে দাঁড়ায়। আমরা কি এই সংযমের অর্থ জানি? আমরা কি স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকা, 'আরো আরো চাই'— এই দৃষ্টিতে চিন্তা না করার অর্থ জানি? আত্মসমর্পণের, গভীর আন্তরিক সংযমের সাথে যোগ থাকতে হবে; সে সংযমের এক অদ্ভুত সরলতা আছে, তার কারণ সেখানে মন অধিকারের জন্য, কিছু লাভ করার জন্য বা আরো বেশী কিছু চাই এইসবের জন্য চিন্তা করে না। এই সংযম আর সমর্পণ থেকে আসা যে সারল্য, তা এক আন্তরিক সৌন্দর্য আনে— যা সৃজনশীল। কিন্তু অন্তরে যদি প্রেম না থাকে তবে সংযম বা সরলতা কোনোটাই আসবে না। তোমরা হয়তো সংযম, সরলতা নিয়ে কথা বলতে পারো, কিন্তু হৃদয়ে প্রেম না থাকলে ওসব বাধ্যতামূলক অভ্যাসে, বন্ধনে পরিণত হয়; আর যেখানে বন্ধন বাধ্যতা সেখানে সমর্পণের ব্যাপারটাই থাকে না। একমাত্র সে-ই ভালোবাসতে পারে— যে নিজেকে বিসর্জন দিতে পারে, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভুলতে পারে, আর তা এমন এক সৌন্দর্যের অবস্থা নিয়ে আসে যা সৃষ্টিশীল।

অবশ্যই সৌন্দর্যের মধ্যে বাহ্যিক সৌন্দর্য, গঠনের সৌন্দর্যও রয়েছে, কিন্তু আন্তরিক সৌন্দর্য ছাড়া, কেবল ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্যবোধ অব্যর্থভাবেই অধঃপতনের পথে নিয়ে যায়। এটা একটা বিচ্ছিন্নতা

নিয়ে আসে। আবার এই অন্তরের সৌন্দর্য তখনই থাকে যখন তোমরা সমস্ত মানুষকে, সমস্ত পৃথিবীকে, তার সকল কিছুকে সত্যকার ভালোবাসো। এই ভালোবাসা অন্যের প্রতি তোমাদের গভীরভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন, বিবেচনাপূর্ণ করে তোলে। তোমরা সব কিছু লক্ষ্য করো, ধৈর্যশীল হয়ে ওঠো। কেউ হয়তো গায়ক হিসাবে বা কবি হিসাবে তাদের কলাকৌশলে দক্ষ, কেউ হয়তো জানে ঠিক কেমন করে শব্দের পর শব্দ সাজাতে হয়, রঙের পর রঙের প্রলেপ দিতে হয়, কিন্তু আমাদের নিজ অস্তিত্বের অন্তঃস্থলে যদি এই সৃষ্টিশীল সৌন্দর্য না থাকে তাহলে ঐসব দক্ষতা বা প্রতিভার আর কোনো অর্থই থাকে না।

আসল কথা বেশীরভাগই আমরা প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে দক্ষকুশল হয়ে উঠছি। আমরা কেবল একটা জীবিকার জন্যই কিছু পরীক্ষা পাশ, বিভিন্ন কারিগরি দক্ষতা লাভ করতে থাকি। কিন্তু অন্তরের অবস্থার দিকে লক্ষ্য না রাখলে এইসব প্রযুক্তিবিদ্যা শেখা, এইসব নিপুণতা অর্জন এক শ্রীহীনতা, এক অব্যবস্থিত অবস্থার সৃষ্টি করে। যদি আমরা অন্তরের সৃষ্টিশীল সৌন্দর্যকে জাগিয়ে তুলি, তবে আমাদের বাহ্যিক সব ব্যাপারেই তা নিজেকে প্রকাশ করবে; তখন সেখানে এক শৃঙ্খলা, এক সুসামঞ্জস্য আসে। কিন্তু কারিগরি দক্ষতা অর্জনের থেকেও তা কিন্তু অনেক বেশী কঠিন কাজ, কারণ এই সৌন্দর্যকে জাগাতে গেলে নিজের মধ্যে কোনো ভয়, নিজেকে গুটিয়ে রাখা, কোনো কিছুকে বাধা দেওয়া, কোনো কিছুকে বাঁচিয়ে রাখা বা কোনো বন্ধন থাকলে হবে না; পূর্ণ সমর্পণ থাকতে হবে। সংযম আর গভীর আন্তরিক সারল্য না থাকলে— ঐ সমর্পণ, সব কিছুর পূর্ণ বিসর্জন সম্ভব নয়। অনেক সময় দেখা যায় বাহ্যিকভাবে আমরা সরল, আমাদের অল্প দু-একটা পোশাক আছে, দিনে আমরা একবার খাবার পেলেই সন্তুষ্ট— এটা কিন্তু আমি যে সংযমের কথা বলছি তা নয়।

সে সংযম তখনই থাকে মন যখন অসংখ্য অনুভব, অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম এবং মন সব অনুভব করলেও— শুদ্ধ, সরল। যখন মন, ভবিষ্যতে 'আরো বেশী' কিছু পেতে চায়, কিছু হতে চায়— এইভাবে চিন্তা করা থেকে মুক্ত, তখন যে সংযমের কথা বলছি— তা মনে দেখা দেয়।

যা বলছি হয়তো তোমাদের বোঝাটা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিন্তু বিষয়টা খুব জরুরী। দেখবে প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ লোকেরা খুব ভালোভাবেই জানেন কী করতে হবে, কীভাবে করতে হবে— কিন্তু তাঁরা সৃষ্টিশীল নন। আমেরিকায় এমন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যেটা কয়েক মিনিটে এমন গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে, যা কোনো লোক যদি রোজ দশ ঘন্টা করে পরিশ্রম করে, তাহলে তার তা সমাধান করতে একশত বৎসর লাগবে। এইসব যন্ত্রের আরো উৎকর্ষসাধন চলছে। কিন্তু যন্ত্রতো আর সৃষ্টিশীল হতে পারে না। আবার দেখা যাচ্ছে মানুষ যেন আরো বেশী যন্ত্রের মতো হয়ে যাচ্ছে। তারা যদি বিদ্রোহও করে, তা সেই যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতা থেকে করে। এটা কোনো বিদ্রোহই বলা যায় না।

সুতরাং সৃজনশীল হওয়া মানে কী— তা খুঁজে বার করা খুবই প্রয়োজন। তোমরা তখনই সৃজনশীল হতে পারবে, যখন সেই আত্মসমর্পণ থাকবে। যার অর্থ সব বন্ধন, নিজ অস্তিত্ব সংকটের ভয়, কোনো লাভের ইচ্ছা, কোনো একটা লক্ষ্যে পৌঁছোতে হবে— মন এইসব আবর্জনানির্মুক্ত। তখন আপনিই সংযম আসবে, সরলতা, সহজতা আসবে। তখনই প্রেমের জাগৃতি সম্ভব হবে। এই সব কিছুকে নিয়েই সৌন্দর্য এবং এটাই এক সৃজনশীল অবস্থা।

প্রশ্নকারী ঃ *মৃত্যুর পরেও কি আত্মার অস্তিত্বটা থেকে যায়?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ যদি এ প্রশ্নের উত্তর সত্যি জানতে চাও তবে কীভাবে

খুঁজবে? বুদ্ধ বা শঙ্করাচার্য বা খ্রিস্ট এই সম্বন্ধে কে কী বলেছেন— সেগুলো পড়ার মাধ্যমে তা খুঁজবে? নাকি তোমাদের বিশেষ নেতা বা গুরু কী বলেন— সে কথা শুনবে? তাঁরা প্রত্যেকেই হয়তো ভুল বলবেন। তুমি যদি— তাঁরা ভুলও হতে পারেন এটাকে মেনে নাও, তবেই তোমার মন সন্ধানের জন্য তৈরী।

তোমাকে প্রথমত খুঁজতে হবে আদৌ যার জীবিত থাকার কথা তুমি বলছো, আত্মা বলে তেমন কিছু আছে কি না। আত্মা কী? তুমি কি নিজে এর সম্বন্ধে কিছু জানো? নাকি তোমার বাবা, মা, পুরোহিত, কোনো বিশেষ গ্রন্থ বা তোমার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এ সম্পর্কে তোমায় কিছু বলেছে আর তুমিও তা স্বীকার করে নিয়েছ?

'আত্মা' অর্থ এই দৈহিক অস্তিত্বের অতীত কিছু, তাই তো? তোমার একটা শরীর রয়েছে, এর সাথে তোমার চরিত্র, তোমার বিশেষ কিছু প্রবৃত্তি, বিশেষ কিছু গুণ আছে। এখন তুমি বলছো এই-সবের অতীত কিছু রয়েছে, যা আত্মা। যদি এমন কোনো অবস্থা থেকেও থাকে তা অলৌকিক, তার এক সময়াতীত গুণ রয়েছে। এখন তোমার প্রশ্ন মৃত্যুর পরও কি এই অলৌকিক সত্তা জীবিত থাকে। এটা প্রশ্নের একটা অংশ।

প্রশ্নের অন্য অংশটা হলো— মৃত্যু কী? তুমি কি জানো মৃত্যু কী? তুমি জানতে চাও মৃত্যুর পরও আমাদের অস্তিত্ব থাকে কি না। এই প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো ঃ যখন তুমি বেঁচে আছো তখন কি মৃত্যুকে জানতে পারো? কেউ তোমাকে বলল মৃত্যুর পরও অস্তিত্ব থাকে বা নেই— তাতে কি এসে গেলো? তখনও কিন্তু তুমি সত্যকার ব্যাপারটা জানো না? তুমি নিজেই— মৃত্যুর পরে নয়, তার অনেক আগেই যখন তুমি প্রাণোচ্ছলতায় পূর্ণ, ভাবতে পারছো, অনুভব করতে পারছো— তখন কিন্তু মৃত্যু কী তা জানতে পারো।

শিক্ষার এটাও একটা কাজ। তোমাদের গণিতে, ভূগোলে বা ইতিহাসে দক্ষ করে তোলাই তার একমাত্র কাজ নয়, শিক্ষিত হবার অর্থ— ওইসব দক্ষতা অর্জন ছাড়াও সেই অসামান্য জিনিস যাকে আমরা মৃত্যু বলি, তাকে বোঝা। যখন দৈহিকভাবেই তোমরা মৃত্যুর খুবই কাছে তখন নয়, এখন— যখন তোমরা বাঁচছো, যখন প্রাণখোলা হাসি হাসছো, যখন গাছের উপরে উঠছো, নৌকা বাইছো বা সাঁতার কাটছো, তখনই তোমাদের এই মৃত্যুকে উপলব্ধি করতে হবে। মৃত্যু অজানা। যখন বেঁচে আছো তখনই সেই অজ্ঞাতকে জানাই হলো মুখ্য ব্যাপার।

প্রশ্নকারী ঃ *যখন আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন কেন আমাদের বাবা-মায়েরা এতো চিন্তা করেন?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ অধিকাংশ বাবা-মায়েরা আংশিকভাবেই তাঁদের সন্তানকে লালনপালন করেন, তাদের খেয়াল রাখেন। কিন্তু যখন তাঁরা চিন্তাই করে যান অর্থাৎ উদ্বেগ আর উদ্বেগ— এমন অবস্থায় থাকেন, তখন তাঁরা নিজেদের সন্তানের থেকে নিজেদের ব্যাপারেই আসলে বেশী চিন্তিত। তাঁরা তোমাদের মৃত্যু চান না, তাঁরা বলেন, 'আমাদের ছেলে বা মেয়ের মৃত্যু হলে আমাদের কী হবে'। যদি বাবা-মা সত্যি তাঁদের সন্তানদের ভালোবাসতেন, তোমরা জানো তাহলে কী হতো? যদি সত্যি তোমাদের ভালোবাসতেন তাহলে তাঁরা অবশ্যই লক্ষ্য রাখতেন তোমাদের ভয় পাওয়ার যেন কোনো কারণ না থাকে, তোমরা যাতে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুখে থাকো, তাঁরা অবশ্যই লক্ষ্য রাখতেন যেন যুদ্ধ না থাকে, দারিদ্র না থাকে, সমাজ যেন তোমাকে বা তোমাদের আশেপাশের কাউকে নষ্ট না করে, সে শহরের হোক বা গ্রামের এবং প্রাণীদেরও যেন কোনো ক্ষতি না হয়। যেহেতু বাবা-মায়েরা তাঁদের সন্তানদের ভালোবাসেন না তাই পৃথিবীতে এত যুদ্ধ, পৃথিবীতে

ধনী ও দরিদ্রের এতো ব্যবধান। তাঁরা নিজেদের স্বার্থকে সন্তানের উপর চাপিয়ে দেন, তাঁদের সন্তানের মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্বকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। তাই তোমরা যখন কঠিনভাবে পীড়িত থাকো তাঁরা চিন্তা করেন, আসলে নিজেদের দুঃখের ব্যাপারেই তাঁরা চিন্তিত। তবে একথা তাঁরা কিন্তু কোনোক্রমেই স্বীকার করবেন না।

আসলে সম্পত্তি, নাম, অর্থ, পরিবার— এগুলো নিজের 'স্ব'কে স্থায়ী করার, নিরন্তর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা, একে অমরতা লাভের চেষ্টাও বলা যায়। তাই যখন সন্তানদের কিছু হয়, তখন বাবা-মায়েরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যান, তাঁরা গভীর দুঃখও পেতে থাকেন; আসলে তাঁরা নিজেদের ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট থাকেন। যদি বাবা-মায়েরা তাঁদের সন্তানদের সত্যি ভালোবাসতেন তাহলে রাতারাতি সমাজটাই বদলে যেতো, আমাদের শিক্ষাও ভিন্ন ধরণের হতো, আমাদের বাড়ি ভিন্ন ধরণের হতো, পৃথিবীতেও যুদ্ধ বলে কিছু থাকতো না।

প্রশ্নকারী : *মন্দিরের দ্বার কি সবার পূজা দেবার জন্য খুলে দেওয়া উচিৎ?*

কৃষ্ণমূর্তি : মন্দির কী? এটা হলো এমন একটা জায়গা, যেখানে ঈশ্বরের প্রতীক রাখা আছে। এই প্রতীক মনের কল্পনাপ্রসূত এবং মানুষের হাত পাথর কুঁদে কুঁদে তা তৈরী করেছে। এই পাথর, এই যে প্রতীক তা কিন্তু ঈশ্বর নয়— তাই নয় কি? এটা একটা প্রতীক মাত্র; এটা অনেকটা ছায়ার মতো— যেমন রৌদ্রে তুমিও চলো, সাথে সাথে তোমার ছায়াও চলে। এই ছায়া কিন্তু তুমি নয়। ঠিক তেমনই মন্দিরের এই প্রতীকগুলো, এই মূর্তিগুলো কিন্তু ঈশ্বর নয়, সত্যও নয়। তাই কে মন্দিরে ঢুকলো, না ঢুকলো সেটা কোনো ব্যাপার নয়। সত্য হয়তো কোনো এক ঝরা পাতার নীচে, পথের পাশে পড়ে

থাকা পাথরে, জলের আয়নায় বিম্বিত সন্ধ্যার রূপে, মেঘমালাতে অথবা বোঝা মাথায় গ্রাম্য মহিলার হাসিতে রয়েছে। এ বিশ্বের প্রতি কোণে পরমের অধিবাস। কেবল মন্দিরেই তা আছে এমন নয়। বরং সেখানে তার থাকার সম্ভাবনাও নেই,কারণ মানুষের ভয়, তার নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষা, তার বিশ্বাস ও সম্প্রদায়ের বিভেদ এই মন্দির তৈরী করে। এ বিশ্ব আমাদের; সব মানুষ মিলে আমরা এখানে একসাথে থাকি। এখানে কোনো মানুষ যদি ঈশ্বরকে খোঁজেন, তিনি মন্দিরের পথে যান না, কারণ এটা মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীরকে তৈরী করে। খ্রিষ্টানদের চার্চ, মুসলমানদের মসজিদ, হিন্দুর মন্দির— এগুলো মানুষকে একে অপরের থেকে আলাদা করে। তাই যিনি ঈশ্বরকে খুঁজতে চান, তিনি এসবের সাথে কোনো সংস্রব রাখেন না। সুতরাং কাকে মন্দিরে প্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়া হবে, আর কাকে দেওয়া হবে না, ওটা রাজনৈতিক ব্যাপার, ওর সাথে পরমের কোনো সংযোগ নেই।

প্রশ্নকারী ঃ *জীবনে নিয়মানুবর্তিতার কী ভূমিকা রয়েছে?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ দুর্ভাগ্যজনকভাবেই এটা একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে, তাই নয় কি? আমাদের জীবনের অনেকটা অংশই নিয়মের নিগড়ে বাঁধা— এটা করো, ওটা করতে পারবে না। তোমাদের বলে দেওয়া হয়েছে কখন ঘুম থেকে উঠতে হবে, কী খাওয়া যাবে, কী খাওয়া যাবে না, কোন কোন জিনিস জানা জরুরী, কোন জিনিস জানার দরকার নেই; তোমাদের বলা হয়েছে পড়াশুনা করতে হবে, ক্লাসে যেতে হবে, পরীক্ষায় পাশ করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তোমাদের পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজ, পরম্পরা, তোমাদের পবিত্র গ্রন্থগুলো তোমাদের কী করতে হবে তা বলে দেয়। ফলত তোমাদের জীবনটা বদ্ধ, কতকগুলো নিয়ম দিয়ে ঘেরা থাকে, তাই নয় কি?

অসংখ্য কর্তব্য আর অকর্তব্যের গারদ দিয়ে তৈরী এক বন্দীশালার তোমরা বন্দী।

এখন আমরা দেখবো, যে মন এইভাবে নিয়মে বন্দী তার সাথে কী ঘটে? অবশ্যই যখন তোমরা কোনো কিছুকে ভয় পেয়ে থাকো, নিজের জীবনে কোনো কিছুকে প্রতিরোধ করতে অর্থাৎ বাধা দিতে চেষ্টা করো, তখন নিজেকে সাহায্যের জন্য অনুশাসনের নিয়ন্ত্রণ চাও। তখন নিজেকে ঠিকমতো মানিয়ে-গুছিয়ে রাখবার জন্য নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন। হয় তুমি নিয়ন্ত্রণ নিজের ইচ্ছেতেই করো অথবা সমাজ— যেটা আসলে তোমাদের পিতামাতা, শিক্ষক, পরম্পরা, পবিত্র গ্রন্থাদি এইসব— সেই সমাজই তোমার জন্য এটা করে দেয়। কিন্তু নির্ভয়ে যদি নিরীক্ষণ করতে থাকো, শিখতে থাকো, উপলব্ধি করতে থাকো, তবে কি নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন রয়েছে? তখন ঐ বোধ, ঐ উপলব্ধি তোমাদের গভীরে এক সুশৃঙ্খলতার জন্ম দেয়, ওটার মধ্যে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, ওটা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো নিয়ম নয়।

একটু ভেবে দেখো, ভয়ের মাধ্যমে তোমাদের যখন অনুশাসনে রাখা হয়, যখন সমাজের জবরদস্তিতে কিছু করতে বাধ্য হও, যখন তোমরা তোমাদের বাবা-মা, শিক্ষকদের শাসনে থাকো, তখন সেখানে কোনো স্বাধীনতা কোনো মুক্তি কোনো আনন্দ থাকে না; সমস্ত উদ্যমটাই চলে যায়। দেখবে যতো পুরোনো তোমাদের ঐতিহ্য, তোমাদের সংস্কৃতি হয়— তার অনুশাসনের বোঝাও ততো ভারী হয়ে ওঠে। সেই পরম্পরা, সেই প্রথা তোমাদের করণীয় আর অকরণীয় নির্ধারণ করে দেয়। এই বিরাট বোঝার চাপে মানসিকভাবে তোমাদের যে অবস্থাটা হয়, সেটা অনেকটা যেন কোনো ষ্টীম-রোলার তার উপর দিয়ে চলে গেছে। ভারতে এই ব্যাপারটাই ঘটেছে। তার ঐতিহ্য, তার সংস্কৃতির বিশাল চাপে সব উদ্দীপনা, সব উৎসাহটাই নষ্ট হয়ে

গেছে, ব্যক্তির অস্তিত্বটাই নেই; সমাজ নামক মহাযন্ত্রের একটা ক্ষুদ্র অংশ হিসাবে থেকেই তোমরা আজ সন্তুষ্ট। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো কি? তোমরা কখনো এর বিরুদ্ধে কোনো বিপ্লব করো না, একে ভেঙ্গে বেরিয়ে আসো না। তোমাদের বাবা-মা বা শিক্ষকরাও তা চান না। তাই, কী করে তোমরা প্রতিষ্ঠিত কাঠামোটার সাথে মানিয়ে নেবে সেইটা দেখাই আজকের শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। এমন অবস্থায় তোমরাও পূর্ণ মানব সত্তা হয়ে উঠতে পারো না। এর কারণ, ভয়ে হৃদয় উৎকন্ঠিত, উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে; আর যতক্ষণ ভয় থাকে ততক্ষণ আনন্দ অথবা সৃজনশীলতা কোনোটাই সেখানে থাকে না।

প্রশ্নকারী : *মন্দির নিয়ে কথা বলার সময় আপনি বললেন : ভগবানের যে প্রতীক সে তো কেবলমাত্র ছায়া। আমরা তো কোনো মানুষের অনুপস্থিতিতে তার ছায়া দেখতে পাই না।*

কৃষ্ণমূর্তি : তোমরা কি ছায়া নিয়েই সন্তুষ্ট? যদি তুমি ক্ষুধার্ত হও তাহলে খাবারের দিকে তাকিয়ে দেখলেই কি তোমার খিদে চলে যাবে? যদি তা নাই হয় তবে মন্দিরের মধ্যের ঐ ছায়া নিয়ে কেন সন্তুষ্ট থাকবে? যদি সত্যিই গভীরভাবে সত্যকে জানতে চাও তবে ঐ ছায়াকে তোমরা ছেড়ে দেবে। আসলে কি জানো তোমরা ছায়া দ্বারা সম্মোহিত, ঐ প্রতীক, ঐ পাথরের মূর্তি দ্বারা অভিভূত। একবার তাকিয়ে দেখো সারা পৃথিবীতে কী ঘটেছে। মানুষ মন্দিরে-গীর্জায়-মসজিদে যেসব ছায়ার আরাধনা করে তাকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে বিভেদ এনেছে, নিজেদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। এই ছায়ার সংখ্যা বাড়তেই পারে, কিন্তু পরম বা সত্য একটাই— তা অখণ্ড, তা বিভাজিত নয়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান বা অন্য কিছু— কোনো পথ দিয়েই সেই পরমে পৌঁছোনো যায় না।

প্রশ্নকারী ঃ *পরীক্ষাগুলো যারা সম্পন্ন পরিবার থেকে এসেছে সেই সব ছাত্র বা ছাত্রীদের জন্য অপ্রয়োজনীয় হতে পারে। কিন্তু যারা দরিদ্র, যাদের কোনো-না-কোনো একটা জীবিকার জন্য নিজেদের তৈরী করতেই হবে, তাদের জন্য কি পরীক্ষা প্রয়োজনীয় নয়? সমাজের পরিকাঠামো যা— তাকে যদি ঠিক সেভাবেই মেনে নেওয়া হয়, তবে তাদের পরীক্ষার প্রয়োজনটা কি কম গুরুত্বপূর্ণ?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ সমাজ যেরকম তাকে তোমরা সেভাবেই স্বীকার করে নিয়েছো। কেন? তোমরা তো দরিদ্র পরিবার থেকে আসোনি। তবে কেন তোমরা বিপ্লব করো না? অবশ্যই কোনো কমিউনিস্ট বা সোসালিস্ট হিসাবে কখনই নয়। এ বিপ্লবকে হতে হবে সমগ্র সামাজিক কাঠামোটার বিরুদ্ধেই একটা বিপ্লব। তোমরা তো এটা করতেই পারো। তবে কেন তোমরা সত্যকে খোঁজার জন্য তোমাদের মেধাকে ব্যবহার করছো না, কেন তোমরা নতুন সমাজ সৃষ্টি করছো না? যারা দরিদ্র তারা বিপ্লব করবে না, কারণ তাদের চিন্তার শক্তি এবং সময় কোনোটাই নেই। তারা কী করে একটা কাজ পাওয়া যাবে, কী করে খাদ্যের সংস্থান হবে— সেই নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু তোমাদের অবকাশ আছে, নিজেদের মেধাকে ব্যবহার করার জন্য কিছুটা খালি সময় আছে, তবে তোমরা কেন বিপ্লব করছো না? তোমরা কেন সঠিক সমাজ কী, সত্য সমাজ কী তা খুঁজে বার করছো না, কেন একটা নতুন সভ্যতা গড়ে তুলছো না? যদি তোমাদের মধ্যে আমি যে বিপ্লবের কথা বলছি তা না জন্ম নেয়, তবে দরিদ্রদের মধ্যে তা কখনই জন্ম নেবে না।

প্রশ্নকারী ঃ *ধনী কি দরিদ্রের সুরাহার জন্য কোনোদিন তাদের সম্পদের অনেকটা দেবার জন্য প্রস্তুত থাকবে?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ ধনীদের, দরিদ্রের জন্য কতোটা ত্যাগ করা উচিত আমরা সেটা নিয়ে কথা বলছি না। তারা যতটাই ছাড়ুন, তা কোনোদিনই

গরীবদের সন্তুষ্ট করতে পারবে না— কিন্তু সমস্যাটা এটা নয়। তোমরা যারা সচ্ছল ফলত যাদের মধ্যে মেধার উন্মেষ ঘটানোর অবকাশ বা সুযোগ রয়েছে, তারা কি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এক নতুন সমাজ সৃষ্টি করতে পারো না? এটা কিন্তু সর্বতোভাবে আমাদের উপরই নির্ভর করছে। এটা ধনী, দরিদ্র বা কমিউনিস্টদের উপর নির্ভর করে না। আমাদের অধিকাংশেরই বিপ্লবের জন্য সেই প্রাণশক্তি, ভেঙ্গে বেরোবার জন্য তীব্র ইচ্ছা, খোঁজার উদ্দীপনাই নেই। আসলে সেই প্রাণশক্তিটাই দরকার।

১১

বশ্যতা ও বিপ্লব

তোমরা কি কখনও চোখ বন্ধ করে শান্ত হয়ে বসে তোমাদের চিন্তার প্রবাহকে লক্ষ্য করেছো? তোমরা কি কোনোদিন তোমাদের মনকে ক্রিয়া করতে দেখেছো অথবা মন কি নিজেই নিজের সক্রিয়তা লক্ষ্য করেছে? কেবল দেখা— তোমাদের চিন্তাগুলো, তোমাদের অনুভূতিগুলো কী, কীভাবে তোমরা কোনো গাছ, ফুল, পাখী বা মানুষকে দেখো; কোনো একটা পরামর্শ কিংবা নতুন কোনো ধারণার প্রতি তোমাদের প্রতিক্রিয়াই-বা কী? এভাবে কি কখনও লক্ষ্য করেছো? যদি না করে থাকো তবে কিন্তু জীবনের একটা অসাধারণ ব্যাপারকে হারাচ্ছো? কীভাবে একজনের মন ক্রিয়া করে, সেটা জানাই হলো শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যে। যদি তোমরা তোমাদের মনের প্রতিক্রিয়াগুলোর ব্যাপারে, বা যদি মন নিজের সব ক্রিয়াকলাপগুলোর ব্যাপারে অসচেতন থাকে, তাহলে কোনোদিন জানতে পারবে না— সমাজ কী? তোমরা সমাজবিদ্যা বা সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক কিছু বইপত্র পড়তে পারো, কিন্তু যদি তোমাদের মন কেমন করে ক্রিয়া করে, তা জানতে না পারো তাহলে সমাজ কী তা জানতে পারবে না, কারণ তোমাদের মন সমাজের একটা অংশ; এমনকী বলতে পারো— এটাই সমাজ। তোমাদের মনের প্রতিক্রিয়াগুলো, বিশ্বাসগুলো, তোমাদের মন্দিরে যাওয়া, তোমাদের বেশভূষার ধরণ, তোমরা যা করো বা করো না, যা ভাবো— সমাজ

এইসব নিয়েই গঠিত। তোমাদের মনের মধ্যে যা যা চলছে তারই এক অবিকল প্রতিরূপ হলো বাহিরের এই সমাজ। তোমাদের মন— এই সমাজ, এই সংস্কৃতি, তোমাদের ধর্ম, জাতি বিভাগ, বহুর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে আলাদা নয়। এইসব নিয়েই সমাজ এবং তোমরা এর একটা অংশ। সমাজ থেকে আলাদা 'তুমি' বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।

এই সমাজ নতুনদের অর্থাৎ তরুণদের চিন্তাকে সবসময় নিয়ন্ত্রণ করতে, তাকে ভেঙেচুরে তার একটা বিশেষ আকার দিতে চায়। যে মুহূর্তে তোমরা জন্মালে— মনের উপর বিভিন্ন প্রভাবের ছাপ পড়তে শুরু করলো। তোমাদের বাবা-মা অনবরত তোমাদের বলবেন, কোনটা করা উচিত, কোনটা করা উচিত নয়, কোনটা বিশ্বাস করা উচিত, কোনটা বিশ্বাস করা উচিত নয়, ঈশ্বর আছেন অথবা নেই, রাষ্ট্রই সব অথবা কোনো স্বেচ্ছাচারী হলো ভগবানের দূত। যখন তোমরা ছোটো, তখন মন যে কোনো প্রভাব গ্রহণ করতে প্রস্তুত, মন অনুসন্ধিৎসু, জিজ্ঞাসু; তখন তোমাদের মধ্যে সমাজের ঐসব কিছুকে ঢেলে দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে তোমাদের মনকে সংস্কারাবদ্ধ করে একটা বিশেষ আকার দেওয়া হয়, যাতে তোমরা সমাজের যে বর্তমান কাঠামোটা আছে তার সাথে ঠিকঠাক মানিয়ে নিতে পারো, কখনো কোনো ধরণের বিপ্লব যেন না করো। সমাজের কাঠামোর মধ্যে থেকে বিশেষ ধরণের চিন্তায়, অভ্যাসে যেহেতু তোমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ো, সেহেতু তোমরা কখনো বিপ্লব করলেও সেটা ঐ বিশেষ পরিকাঠামো অনুযায়ী হয়ে থাকে। এটা অনেকটা কয়েদীরা বিদ্রোহ করছে— কেন— না তাদের আরো ভালো খাবার, সুযোগসুবিধা চাই— কিন্তু সবশেষে তারা কয়েদখানাতেই রয়ে যাচ্ছে। তাই তুমি যখন ঈশ্বরকে খোঁজো বা সঠিক প্রশাসন কী তা জানতে চাও, সেটাও সেই সমাজেরই বিশেষ ছাঁচটাকে অনুসরণ করেই খোঁজা হয়; সে সমাজ বলে ঃ 'এটা ঠিক

ওটা ভুল, এটা ভালো, ওটা মন্দ, ইনি একজন সঠিক নেতা, আর ওনারা হলেন সাধু মহাত্মা'। এইভাবেই কোনো কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী বা চালাক লোকেদের দ্বারা যেসব তথাকথিত বিপ্লবগুলো সংঘটিত হয়েছে, সেগুলোর মতোই তোমাদের বিপ্লবও আসলে অতীত দ্বারাই সীমাবদ্ধ। ওগুলো কোনো বিপ্লবই নয়, ওগুলো সীমার মধ্যের কিছু তীব্র ক্রিয়াকলাপ বা কিছু শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া। সত্যকার সংগ্রাম হল এই কাঠামোটাকে ভেঙ্গে— তার সীমার বাহিরে অনুসন্ধান শুরু করা।

তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করবে— যে কোনো সংস্কারকই হোন না কেন, তাঁরা কিন্তু প্রত্যেকেই এই কারাগৃহের ভিতরের পরিস্থিতিটার পরিবর্তন করতে সচেষ্ট। তাঁরা কোনোদিন তোমাদের মানিয়ে না নিতে বলবেন না, তাঁদের মুখে কোনোদিন একথা উচ্চারিত হয় না 'এই ঐতিহ্যের, এই পরম্পরার প্রাকারগুলো ভাঙো, মনকে আষ্টেপৃষ্ঠে সে সংস্কার জড়িয়ে আছে, এক প্রবল ঝাপ্‌টায় তাকে ঝেড়ে ফেলো'। ওটাই হলো আসল শিক্ষা। তার কাজ তোমাদের কতকগুলো পরীক্ষা পাশ করানো নয়, যেখানে বিষয়গুলোকে কোনোরকমে মগজে ভর্তি করে নিয়ে পরীক্ষার খাতায় সেগুলোকে আবার ঢেলে দেওয়াই মুখ্য ব্যাপার। এই কারার প্রাচীর— যা তোমাদের মনকে বন্দী করে রেখেছে, তার সঙ্গে পরিচয় ঘটানোই শিক্ষার কাজ। সমাজ আমাদের প্রত্যেককেই প্রভাবিত করে, নিরন্তর আমাদের চিন্তাকে একটা বিশেষ ধারায় বইয়ে নিয়ে যেতে চায়, এবং এর চাপ বাহির থেকে ধীরে ধীরে ভিতরে পৌঁছোতে থাকে। কিন্তু যত গভীরেই তা যাক না কেন এটা বাহিরের ব্যাপারই রয়ে যায়। এই যে সংস্কার একে যতদিন না ভেঙে ফেলতে পারছো, একে অতিক্রম করতে পারছো, ততদিন তোমাদের সত্তায় 'আন্তরিক' বলে কিছু থাকে না। কী ভাবছো— সেটার ব্যাপারে তোমাদের সচেতন হতে হবে। তোমরা যে ধর্মাবলম্বী— মানে ধরো হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান— সেই হিসাবে কি তোমরা ভাবছো ? তোমাদের

বিশ্বাস,অবিশ্বাসগুলোর ব্যাপারে সচেতন হও। এই সবই সমাজের কাঠামোর মধ্যেই পড়ে। যতক্ষণ না এই কাঠামোর সম্বন্ধে সজাগ হবে, একে ভাঙতে পারবে, ততক্ষণ তুমি ঐ কয়েদখানাতেই রয়ে যাবে। যদিও সাধারণত তোমরা নিজেদের মুক্ত মনে করো, কিন্তু সেটার আসলে কোনো অর্থই নেই।

তোমরা দেখবে আমাদের অধিকাংশই এই কারাগৃহের মধ্যেই বিপ্লব করি। আরো একটু ভালো খাবার, আরো একটু বেশী আলো, আরো একটু বড়ো জানালা, যাতে তার মধ্যে দিয়ে যে এক টুকরো আকাশ দেখা যায়, সেই টুকরোটা আর একটু বড়ো হয়— আমরা মূলত এইসব চাই। আমাদের চিন্তার বিষয় হলো সমাজচ্যুত কোনো ব্যক্তির কি মন্দিরে ঢোকা উচিত, আমরা কোনো এক বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীকে ভেঙ্গে আরেক উচ্চতর জাতির সৃষ্টি করি এবং এইভাবেই আমরা সেই কয়েদখানা— যেখানে কোনো মুক্তি নেই— সেখানেই থেকে যাই। মুক্তি আছে কারার দেওয়ালের বাইরে খোলা আকাশের নীচে সমাজের পুরোনো ছাঁচটার বাইরে। কিন্তু এই ছাঁচের বাইরে যেতে গেলে, কী কী নিয়ে এই ছাঁচ তৈরী তা জানতে হবে, তাকে বুঝে নিতে হবে। আর তার পথ হলো নিজের মনকে বুঝতে পারা। কারণ এই মনই আসলে বর্তমান সভ্যতার রূপকার, এই মনই পরম্পরার কাঁচামালে এই সমাজ, এই সংস্কৃতির বিশাল ইমারত খাড়া করেছে। তাই নিজেদের সেই মনটাকে না উপলব্ধি করে, শুধু শুধু কম্যুনিস্ট, সোসালিস্ট বা হেন তেন হয়ে বিপ্লব করলে তার খুব অল্পই গুরুত্ব রয়েছে। তাই আত্মোপলব্ধি প্রয়োজন। নিজের মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, নিজের মনের চিন্তাভাবনা, অনুভূতিগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, আর এটাই হলো শিক্ষা, তাই নয় কি? এর প্রধান কারণ হলো, যে মুহূর্তে তুমি তোমার মনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন হবে, সেই মুহূর্তেই তুমি গভীরভাবে সংবেদনশীল ও সজাগ হয়ে উঠবে।

অনেকদিন পরে নয়, কালকে বা আজ বিকালেই এটা একবার করে দেখো। যদি তোমার ঘরে অনেক লোকের আনাগোনা থাকে, যদি বাড়ীতে ভিড় থাকে, চলে যাও একা নির্জনে, কোনো গাছের নীচে বা নদী তটে বসো, শান্ত হয়ে লক্ষ্য করতে থাকো কেমন করে তোমার মন ক্রিয়া করছে। মনকে সংশোধন করতে যেও না; বোলো না— তার এইটা ঠিক, ওটা ভুল; যেভাবে তুমি কোনো ছায়াছবি দেখো তেমনভাবেই একে লক্ষ্য করো। যখন ছায়াছবি দেখতে কোনো প্রেক্ষাগৃহে যাও তখন কি সেই ছায়াছবিতে তোমরা অংশগ্রহণ করো? অভিনেতা অভিনেত্রীরাই তাতে অংশগ্রহণ করেছেন। তুমি কেবল দর্শক হিসাবেই দেখো। একইভাবে লক্ষ্য করো কীভাবে মন ক্রিয়া করে। এটা সত্যি আকর্ষণীয়, যেকোনো ছায়াছবির থেকে ঢের বেশী আকর্ষণীয়। কারণ তোমাদের মন সমগ্র বিশ্বের একটা অংশ, সে মন সমগ্র মানবের অভিজ্ঞতা অনুভবের সঞ্চয়ে পূর্ণ। বুঝতে পারছো কি? তোমাদের মনই সমগ্র মানবের সকল কিছুর সমন্বয়। যখন এটা দেখতে পাবে তখন অসামান্য করুণা অনুভব করবে। এই বোধ থেকে প্রগাঢ় প্রেম আসে, আর তখনই সুন্দর কিছু দেখে বুঝতে পারবে সৌন্দর্য কী।

প্রশ্নকারী ঃ *আপনি যেগুলো নিয়ে কথা বলছেন সেগুলো কী করে জানলেন? আমরাই-বা ওগুলো কী করে জানতে পারবো?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ এটা একটা ভালো প্রশ্ন।

একটু নিজের সম্বন্ধে বলি— আমি কিন্তু এইসব সম্পর্কে কোনো বই পড়িনি। ভগবদ্গীতা বা উপনিষদ বা কোনো মনস্তাত্ত্বিক বইও পড়িনি। কিন্তু তোমাদের একটু আগে যেমন বললাম, যদি তোমরা নিজেদের মনকে লক্ষ্য করো তবে দেখবে সব সেখানে আছে। যখন তুমি আত্মবোধের পথে যাত্রা শুরু করবে, তখন বইয়ের কোনো

গুরুত্ব থাকবে না। এটা অনেকটা একটা অজানা দেশে ঢোকা, তারপর নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করা। কিন্তু এর মধ্যে যদি নিজেকে গুরুত্ব দেবার ব্যাপার এসে পড়ে তাহলে সব নষ্ট হয়ে যায়। যে মুহূর্তে তুমি বলো 'আমি অনেক কিছু আবিষ্কার করেছি, আমি জানি, আমি একজন বিরাট মাপের মানুষ, ইত্যাদি ইত্যাদি', তবে তুমি কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলেছো। যদি অনেক দূর যেতে চাও খুব কম কিছু বহন কোরো, যদি অনেক উঁচুতে উঠতে চাও, তবে নিজেকে নির্ভার কোরো।

প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ নিজের মনের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করার মধ্যে দিয়েই আবিষ্কার ঘটে, বোধ আসে। প্রতিবেশীর সাথে কী কথা বলো, কীভাবে বলো, কেমনভাবে হাঁটো, কেমনভাবে আকাশকে, পাখীকে দেখো, কীভাবে মানুষের সঙ্গে আচরণ করো, কেমনভাবে একটা গাছের ডালকে কাটো— এইসব কিছুর বিরাট গুরুত্ব রয়েছে; কারণ, এগুলো প্রত্যেকটা আয়নার মতো কাজ করে। তা তুমি যা— তা সঠিকভাবে দেখিয়ে দেয়। যদি সচেতনতা থাকে তবে প্রতি মুহূর্তে নতুন কিছু খুঁজে পাবে।

প্রশ্নকারী ঃ *অন্যের সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা উচিত, না উচিত নয়?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ অন্যের সম্পর্কে ধারণা কি গড়া উচিত? অন্যের সম্পর্কে নিজের মধ্যে একটা মতামত গড়ে তোলা কি উচিত? এখন একটা প্রশ্ন করি, যখন তোমার মনে তোমার কোনো শিক্ষক সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকে, তখন কোন জিনিসটা তোমার কাছে প্রধান হয়ে ওঠে? অবশ্যই শিক্ষক নয়, তাঁর সম্পর্কে তোমার ধারণাগুলোই মুখ্য হয়ে ওঠে? জীবনেও এমনটাই ঘটে, তাই নয় কি? আমাদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন মানুষের সম্পর্কে অসংখ্য ধারণা রয়েছে, যেমন 'কেউ ভালো',

'কেউ দাম্ভিক', 'কেউ কপট', 'কেউ কুসংস্কারগ্রস্থ', কেউ এটা করে, কেউ ওটা করে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের ও সেই ব্যক্তির মধ্যে এক ধারণার পর্দা থাকে, তাই আমরা কোনোদিনই সেই আসল মানুষটার সাথে মিলিত হই না। আমরা হয়তো কাউকে কিছু করতে দেখেছি, পরেও আমরা বলি 'এই লোকটাই ওটা করছে', এইভাবে আমাদের কাছে পুরোনো ঘটনাটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। বুঝতে পারছো? তুমি যখন কাউকে কিছু করতে দেখো, যেটা তোমার মনে হয় ভালো বা মন্দ, সেই অনুযায়ী সেই ব্যক্তির সম্পর্কে তুমি একটা ধারণা গড়ে নাও, যেটার আবার স্থায়ী হওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকে। দশদিন বা দশ বছর পর যখন আবার তার সাথে দেখা হয়, তখন তুমি তার সম্পর্কে গড়া পুরোনো ধারণা দিয়েই তাকে দেখো। সেই অনুযায়ী তুমি চিন্তা করো। কিন্তু এই-সময়ের ব্যবধানে সে হয়তো পরিবর্তিত হয়েছে, তাই সে ঐরকম— এটা বলা যায় না। 'সে ফেব্রুয়ারীর অমুক তারিখে অমন ছিল' বরং এটা বলা যায়। কারণ এক বছরের পরে হয়তো সে একজন সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। যদি তুমি কারোর সম্পর্কে এমন বলো যে, 'আমি অমুক লোককে জানি' হয়তো ওটা সম্পূর্ণ ভুল; কারণ তুমি একটা বিশেষ দূর অবধি তাকে জানো, একটা বিশেষ ঘটনা একটা বিশেষ সময়ে ঘটেছে— তুমি সেই সময়ের মানুষটাকে জানো। এর বাইরে কিন্তু তুমি আর কিছুই জানো না। তাই অন্যের সাথে মুক্ত মন নিয়ে, কোনো মতামত বা আগের কোনো ধারণা না নিয়ে মিলিত হওয়াটাই প্রধান ব্যাপার।

প্রশ্নকারী ঃ *অনুভূতি কী, আমরা কেমনভাবে অনুভব করি?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ তোমাদের পড়ার মধ্যে যদি শারীরবিদ্যা থেকে থাকে তাহলে তোমাদের শিক্ষক অবশ্যই কীভাবে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র গঠিত হয় তার ব্যাখ্যা করেছেন। যখন তোমায় কেউ চিমটি কাটে তুমি

ব্যথা অনুভব করো। এর অর্থ কী? তোমার স্নায়ু একটা বার্তাকে মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে যায়, মস্তিষ্ক এর নাম দেয় ব্যথা, তখন তুমি বলো— 'তুমি আমাকে আঘাত করেছো'। এটা হলো অনুভূতি লাভের শারীরিক দিক।

তেমনভাবেই মানসিক অনুভূতি আছে, তাই নয় কি? ধরো তুমি মনে করো তুমি একজন সুন্দর মানুষ। একজন এসে বললো, 'তুমি কুরূপ',ব্যস, তুমি আঘাত পেলে। তুমি কিছু শব্দ শুনলে, মস্তিষ্ক একে বিরক্তিকর ও অপমানজনক এমন কিছু বলে অনুবাদ করলো। সাথে সাথে তোমার মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। অথবা ধরো কেউ তোমাকে প্রশংসা করলো; তখন তুমি বলো ঃ 'এটা শুনে কি-ই না ভালো লাগলো'। সুতরাং এই অনুভব–চিন্তন একটা প্রতিক্রিয়া— কোনো একটা পিন ফোটার, কোনো অপমান বা কোনো প্রশংসা ইত্যাদির একটা প্রতিক্রিয়া। এই পুরো ব্যাপারটাই অনুভব-চিন্তন প্রক্রিয়া, কিন্তু এখানেই এর শেষ নয়; এ আরো অনেক জটিল। তুমি এর আরো গভীরে যেতে পারো।

তোমরা দেখবে যখনই আমরা একটা অনুভূতি লাভ করি আমরা তার একটা নাম দিই, তাই নয় কি? যখন রেগে যাই আমরা সেই অনুভূতিটার একটা নাম দিই, আমরা তাকে রাগ বলি। কোনোদিন একটা ব্যাপার ভেবেছো কি— যদি সেই অনুভূতিটার কোনো নাম না দাও, তবে কী ঘটে? একবার চেষ্টা করে দেখো। পরের বার যখনই রেগে যাবে তাকে রাগ বলে নামকরণ কোরো না। শুধুমাত্র অনুভূতিটার সম্পর্কে পূর্ণসচেতন হও, একে নাম দিও না— দেখো কী ঘটে।

প্রশ্নকারী ঃ *ভারতীয় সংস্কৃতি ও আমেরিকার সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য কী?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ আমরা যখন আমেরিকান সংস্কৃতির কথা বলি আমরা

আসলে ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে বোঝাতে চাই। এই ইউরোপীয় সংস্কৃতিই আমেরিকায় বাহিত হয়েছে। সেই সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়েছে, প্রসারিত হয়েছে, নতুন নতুন সীমান্তকে স্পর্শ করেছে। সেটা বস্তুগত দিক থেকে ও মনস্তাত্ত্বিক দিকে থেকে— উভয়ক্ষেত্রেই ঘটেছে।

এখন প্রশ্ন হলো ভারতীয় সংস্কৃতি কী? তোমাদের এখানকার সংস্কৃতি কী? তুমি সংস্কৃতি শব্দটা কী অর্থে ব্যবহার করছো? যদি তুমি বাগানে কাজ করে থাকো তবে তুমি অবশ্যই জানো বাগান চষা মানে কী, মাটি তৈরী করার মানে কী। তুমি মাটি কোপাও, পাথর থাকলে সরিয়ে দাও, প্রয়োজনীয় সার, পচাপাতা ও বিভিন্ন কিছুর মিশ্রণ, কিছু জৈব পদার্থ মাটিতে মিশিয়ে তাকে উর্বর করো, তারপর চারা রোপন করো। এই উর্বর মাটি চারাটিকে তার বেড়ে ওড়ার জন্য যা যা প্রয়োজন তার অনেক কিছু সরবরাহ করে। সেই চারাটিই পরে গোলাপ নামক এক অসাধারণ কিছু উপহার দেয়।

ভারতীয় সভ্যতাও একই রকমের। লক্ষ লক্ষ মানুষের সংগ্রাম, ইচ্ছাশক্তি, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিরোধ, নিরন্তর চিন্তা, হতাশা, ভয়, পলায়ন, উপভোগ— এইসব কিছু তিলে তিলে এ সভ্যতা গড়েছে। এছাড়া জলবায়ু, খাদ্য, পোশাকেরও এই সভ্যতার উপর প্রভাব রয়েছে। সুতরাং আমাদের একটা উর্বরা মাটি রয়েছে, মাটি অর্থে এখানে মন। এই মন সম্পূর্ণরূপে পরম্পরা দ্বারা একটা আকার পাওয়ার আগে, কিছু অসাধারণ প্রাণশক্তিপূর্ণ সৃজনশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা সমগ্র এশিয়াকে তোলপাড় করে দিয়েছিলেন। তাঁরা তোমাদের মতো বলেননি, 'সমাজের রীতিনীতিগুলো মেনে নিতে হবে, না হলে আমার বাবা কী মনে করবেন'? তাঁরা কিছু খুঁজে পেয়েছিলেন; তাঁদের মধ্যে এই খোঁজের উৎসাহ, উদ্দীপনার উত্তাপ ছিল; উদাসীনতার শীতলতা তাঁদের স্পর্শ করেনি। এখন এইসব কিছু মিলিয়েই হলো ভারতীয় সভ্যতা। তোমরা যা ভাবো, যা খাও, যা যা পোশাক পরো, তোমাদের

আচরণ, তোমাদের ঐতিহ্য, তোমাদের কথা, তোমাদের ললিতকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, তোমাদের ঈশ্বর, পুরোহিত, পূণ্য-পবিত্র গ্রন্থাদি— এইসব নিয়েই ভারতীয় সভ্যতা, তাই নয় কি ?

সুতরাং ভারতীয় সংস্কৃতি, ইউরোপীয় সংস্কৃতির থেকে একদিক দিয়ে আলাদা, কিন্তু উপরের স্তরটা বাদ দিলে তার নীচ দিয়ে যে প্রবাহ বইছে তা কিন্তু এক। এই ধারা হয়তো আমেরিকায় নিজেকে ভিন্নভাবে প্রকাশ করেছে, কারণ তাদের চাহিদাগুলো অন্য, তাদের ঐতিহ্যের বয়স বেশী নয়, এবং তাদের অনেক যন্ত্র তথা রেফ্রিজারেটর, গাড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বেশী আছে। কিন্তু তার নীচেই বইছে একই চেতনার ধারা— আর তা হলো আনন্দের সন্ধান, ঈশ্বরের সন্ধান, পরমের সন্ধান। যে মুহূর্তে এ ধারা ব্যাহত হয়, অব্যর্থভাবে সেই সংস্কৃতি রুগ্ণ হতে শুরু করে। ভারতের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেছে। এই সন্ধানের ধারা যখন কর্তৃত্বের, পরম্পরার, ভয়ের আবর্জনায় গতিহীন হয়— তখন পচন, পতন শুরু হয়। সেটা এক মহৎ ক্ষতি।

ঈশ্বরকে, সত্যকে খোঁজার অভীপ্সাই হলো আসল, অন্য ইচ্ছাগুলো এর সহায়ক। শান্ত জলে পাথর ছুঁড়লে ঢেউয়ের বৃত্ত বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হতে থাকে। ঐ দূর থেকে দূরে যে বৃত্ত তৈরী হলো ওগুলো সহায়ক ক্রিয়া, ওগুলো সামাজিক প্রতিক্রিয়া রূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রকৃত হলো সেই কেন্দ্র। আর সেই কেন্দ্রের চেতনা হলো আনন্দ, ঈশ্বর ও সত্যের সন্ধান। তুমি যতক্ষণ ভয় পাবে ও ক্ষতির আশঙ্কা করবে, ততক্ষণ একে খুঁজে পাবে না। যে মুহূর্ত থেকে কোনো সংস্কৃতিতে ভীতি প্রদর্শন ও ভয় দেখা যায়, তখনই জানতে হবে তা অধঃপতনের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

সেইজন্যই যখন তোমরা নবীন, তখন যেন সংস্কারাবদ্ধ না হও, বাবা-মায়ের, সমাজের ভয়ে সংকুচিত না হও, তাহলেই সত্যকে খোঁজার অনন্ত স্পৃহা তোমাদের মধ্যে জাগ্রত থাকবে। যেসব মানুষ

সন্ধান করছে ঈশ্বর কী, পরম কী— তারাই নতুন সভ্যতা, নতুন সংস্কৃতির উদ্বোধন ঘটাবে, আর যারা মেনে নিয়েছে, অথবা পুরোনো সংস্কারের কয়েদের ভিতরেই বিপ্লব করছে, তাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তোমরা হয়তো সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করলে, এক সম্প্রদায় থেকে আর এক সম্প্রদায়ে যোগদান করলে, এক ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে অথবা মুক্ত হবার জন্য বিভিন্ন পথ অবলম্বন করলে, কিন্তু যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে সত্যকে, পরমকে, প্রেমকে জানবার চেতনা জাগ্রত হচ্ছে, ততক্ষণ তোমাদের সব প্রচেষ্টাই বৃথা। তোমরা হয়তো খুব শিক্ষিত হলে, এমন সব কাজ করলে— সমাজ যাকে ভালো কাজ বলে স্বীকৃতি দিল, কিন্তু সেইগুলো পরম্পরার প্রাচীরে ঘেরা পরিসরে থেকে সব কিছু করা, তার সত্যকার কোনো বৈপ্লবিক মূল্য নেই।

প্রশ্নকারী ঃ *ভারতীয়দের সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ সত্যিই এটা একটা খুব সরল প্রশ্ন। কতগুলো ধারণা ছাড়া বাস্তব স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা এক জিনিস, আবার বাস্তব সম্পর্কে কতকগুলো ধারণা রাখা অন্য জিনিস। লোকেরা ভয়ে সংকুচিত, কুসংস্কারে অন্ধ— এটাকে সোজাসুজি দেখা এক জিনিস, কিন্তু তাকে দেখে তার নিন্দা করা, দোষারোপ করা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। মতামতগুলোর তেমন কোনো মূল্য নেই, কারণ আমার একরকমের মতামত থাকবে, তোমার একরকম থাকবে, তৃতীয় ব্যক্তির আরেক ধরণের মতামত থাকবে। এই মতামতকেই সব কিছু বলে মেনে নেওয়াতে চিন্তার স্থূলতা প্রকাশ পায়। অর্থাৎ এটা স্থূল পদ্ধতিতে চিন্তা করা বলা যেতে পারে। যেটা দরকার তা হলো বাস্তবকে কোনো ধারণার মধ্যে দিয়ে বা কোনো কিছুর সাথে তুলনা না করে, তা ঠিক কী ভুল বিচার না করে— তা যেরকম, তাকে সেরকমভাবে দেখা।

কোনো ধারণা ছাড়া সৌন্দর্যকে অনুভব করাই হলো সত্যকার সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করা। একইভাবে কোনো বদ্ধমূল ধারণা, ভালো-মন্দর বিচার সরিয়ে রেখে, ভারতের মানুষ যা— যদি তাকে সেভাবে দেখো, তাহলে তোমরা যা দেখবে তা সত্য।

ভারতীয়দের নির্দিষ্ট কিছু আচার-বিচার রয়েছে, কিছু রীতি, কিছু প্রথা রয়েছে, কিন্তু মৌলিক দিক থেকে তারা এ পৃথিবীর আর দশটা মানুষের মতোই। তারা ক্লান্ত হয়, বিরক্ত হয়, নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে, ভয়ে সংকুচিত হয়ে যায়, সমাজের কয়েদখানাটার মধ্যেই তাদের যতো বিপ্লব, বিদ্রোহ চলতে থাকে। ঠিক অন্যান্য প্রান্তে পৃথিবীর মানুষের যেমন হয়, তারা যা যা করে এদেরও তাই তাই হয়, এরাও একই জিনিস করে। আমেরিকানদের মতো এরাও আরাম চায়, হয়তো তাদের মতো তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ভারতীয়দের এই প্রাকৃত জগৎকে ছেড়ে সাধু হওয়ার একটা পরম্পরাগত ইচ্ছা আছে। তাদের সন্ন্যাসী হওয়ার চেষ্টা আছে, আবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা-ভণ্ডামি-লোভ-ঈর্ষা এসবও রয়েছে। অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও জাতিভেদ আছে, হয়তো সেই ভেদাভেদটা এখানে কিছুটা বেশী নৃশংস। সারা পৃথিবীতে কী ঘটছে— ভারতে তোমরা তা খুব কাছ থেকে দেখতে পাবে। আমরা ভালোবাসা পেতে চাই কিন্তু আমরা জানিনা ভালোবাসা কী। আমরা অতৃপ্ত, আমরা কোনো সত্য পদার্থের জন্য তৃষ্ণার্ত, আর সে তৃষ্ণা, সে অতৃপ্তি মেটাতে আমরা উপনিষদ-গীতা-বাইবেলের কাছে হাত পাতি, হাতে আসে কিছু শুকনো শব্দ, কিছু দূরকল্পনা। ভারতে, রাশিয়ায় বা আমেরিকায় মানুষ একই, খালি অন্য আকাশের নীচে, অন্য রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় তারা নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করে।

১২

অকপট প্রতীতি

আমরা কয়েদখানার ভিতরে থেকে বিপ্লবের কথা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। যত সংস্কারক, আদর্শবাদী বা যাঁরা কোনো একটা বিশেষ কিছু পরিণামে পৌঁছোনোর জন্য খুব চেষ্টা করছেন, এঁদের বিপ্লব কিন্তু তাঁদের নিজেদের সংস্কারের, যে সমাজে তাঁরা বাস করেন তার ছাঁচের ও অসংখ্য মানুষের সমবেত ইচ্ছা ও চেষ্টার পরিণাম যে সভ্যতা তার সংস্কৃতির চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই চলতে থাকে। এখন আমার মনে হয় অকপট আস্থা বা বিশ্বাস কী, কেমনভাবেই-বা তা আসে—সেটা দেখা জরুরী।

স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনা (initiative) থেকে এক প্রতীতি, এক আস্থা জন্ম নেয়। পুরোনো ছাঁচের মধ্যের উদ্যম এক আত্মবিশ্বাস নিয়ে আসে। এই আত্মবিশ্বাস কিন্তু যে অহংশূন্য অকপট প্রতীতির কথা আমি বলছি তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তোমরা কি এই অহংশূন্য প্রতীতি কী তা জানো? যখন তোমরা নিজ হাতে কিছু করো, ধরো একটা গাছ লাগাও, তাকে বেড়ে উঠতে দেখো, একটা ছবি আঁকো, কবিতা লেখো অথবা বড়ো হয়ে বিরাট ব্রীজ তৈরী করো বা সফলতার সাথে কোনো প্রশাসনের কাজের দায়িত্ব পালন করো, তখন তা তোমাদের মনে এক প্রত্যয় এনে দেয়। মনের ভাবটা এমন থাকে যে তুমি এইসব করতে সমর্থ। কিন্তু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে, এই যে

আত্মবিশ্বাস, তা সর্বদা ঐ কারাগৃহ যা হিন্দু, খ্রিষ্টান বা সাম্যবাদী ইত্যাদি সমাজ দ্বারা নির্মিত— তার মধ্যেই সীমিত থাকে। এই কয়েদখানার ভিতরের উদ্যম এক বিশ্বাস আনে, কারণ তুমি বুঝতে পেরে যাও যে তুমি মোটর-গাড়ি বানাতে পারো, ভালো ডাক্তার হতে পারো, ভালো বৈজ্ঞানিক হতে পারো অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেকে প্রমাণ করতে পারো। এই সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে কোনো সফলতা লাভের অথবা এই সামাজিক কয়েদখানাটার একটু সংস্কার, আরো একটু আলোর ব্যবস্থা, ভিতরের একটু সাজসজ্জা ব্যবস্থা করার সামর্থ্য যদি থাকে তা থেকে যে বিশ্বাসের অনুভূতি আসে তা অহংপূর্ণ বিশ্বাস। তুমি জানো যে তুমি কিছু করতে পারো এবং সেটা করাতে একটা আত্মগৌরবের অনুভূতি আসে। কিন্তু যদি অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে, উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে— যে সামাজিক পরিকাঠামোর তুমিও একটা অংশ তাকে ভেঙে ফেলতে পারো, তার থেকে মুক্ত হতে পারো, তবে এক ভিন্ন ধরনের প্রতীতি আসে। সেই প্রতীতিতে আত্মাভিমানের চিহ্নটুকু থাকে না। যদি আমরা এই অহংপূর্ণ বিশ্বাস ও অহংশূন্য বিশ্বাস এই দুটোর মধ্যের পার্থক্যকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি, তবে তা আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে খুবই অর্থপূর্ণ হবে।

যখন তোমরা খুব ভালো ফুটবল, ক্রিকেট বা ব্যাডমিন্টন খেলো— তখন তোমাদের মধ্যে এক প্রত্যয় জন্ম নেয়, তাই তো? তখন তোমরা অনুভব করতে থাকো যে তোমরা কোনো একটা বিশেষ কাজে দক্ষ। যদি তোমরা অতি দ্রুত গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারো, সেটাও কিন্তু একটা আত্মপ্রত্যয়ের জন্ম দেয়। যখন এই সমাজের পরিকাঠামোর মধ্যের কোনো ক্রিয়া থেকে প্রত্যয় আসে— তারমধ্যে অদ্ভুত এক আত্মগর্ব, এক ঔদ্ধত্য থাকে, তাই নয় কি? যে ব্যক্তির কোনো কাজে দক্ষতা আছে, যে ব্যক্তির সফলতা অর্জনের সামর্থ্য আছে, তার প্রত্যয়ে অহংয়ের এই গর্ব ও ঔদ্ধত্যের রঙ দেখা যায়।

তার মধ্যে একটা অনুভূতি কাজ করে ঃ 'আমিই এটা করতে পারি'। সুতরাং যে কোনো সফলতা অর্জনের মধ্যে, সমাজের ভিতরে কোনো সংস্কার করার মধ্যে— অহংয়ের সেই ঔদ্ধত্য থাকে, সেই অনুভূতি থাকে, যা বলে ঃ 'আমি এটা করেছি', 'আমার চিন্তাধারাটাই গুরুত্বপূর্ণ', 'আমার দল সফলতা পেয়েছে', ইত্যাদি ইত্যাদি। সামাজিক কয়েদের মধ্যে যে প্রত্যয় বার বার নিজেকে প্রকাশ করে তার সাথে 'আমি' এবং 'আমার' এই বোধটা সবসময়ই যুক্ত থাকে।

আদর্শবাদীরা কেমন উদ্ধত হয় কখনো কি লক্ষ্য করেছো? যে রাজনৈতিক নেতা কোনো কাজে সফল হয়েছেন বা সমাজে কোনোপ্রকার সংস্কার করতে গিয়ে সফলতা পেয়ে গেছেন, কোনোদিন দেখেছো তাঁরা কেমন নিজেতেই নিজে ভর্তি হয়ে থাকেন, তাঁদের আদর্শের, তাঁদের সফলতার অভিমানে, গর্বে কেমন স্ফীত হয়ে থাকেন? তাঁরা নিজেরাই নিজেদের বিরাট গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে থাকেন। কিছু রাজনৈতিক বক্তৃতা পড়ে দেখো, যাঁরা নিজেদের বিভিন্ন বিষয়ের সংস্কারক বলে দাবী করেন তাঁদের লক্ষ্য কোরো। দেখবে এই সংস্কারের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তাঁরা নিজেদের অহংকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলেন। তাঁদের এই সংস্কার খুবই ব্যাপক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তা সেই কয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সেটা পরিশেষে দ্বন্দ্ব ও দুর্দশাই নিয়ে আসে।

যদি তোমরা সম্পূর্ণ সামাজিক পরিকাঠামোর সার অর্থটাকে ধরতে পারো, অসংখ্য মানুষের সামগ্রিক ইচ্ছার দ্বারা সৃষ্ট যে সাংস্কৃতিক বিন্যাস— যাকে আমরা সভ্যতা বলি, তাকে বুঝতে পারো এবং হিন্দু, কমিউনিস্ট বা খ্রিষ্টান যে সমাজকারারই বন্দী তুমি হওনা কেন, তার প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারো, দেখো— যে প্রতীতি জন্ম নেয়, তার গায়ে ঔদ্ধত্যের কালিমা লেপা নেই। সেই প্রতীতি অকপট। সে এক শিশুর আস্থা, সে এমনই সরল প্রাণ যে—

সে যেকোনো কিছু করতে পারে। এই অকপট আস্থাই নতুন সভ্যতার জন্ম দেয়। কিন্তু যতক্ষণ তোমরা সমাজের অচলায়তন ছেড়ে না বেরিয়ে আসছো, ততক্ষণ সেই প্রতীতির প্রভা তোমাদের অস্তিত্বকে আভাময় করবে না।

এখানে কে বলছে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কী বলা হচ্ছে সেই কথা-গুলির সত্যতা অনুধাবন করো। কী করে ঐ সামাজিক কাঠামোটার সাথে নিজেদের মানিয়ে নেবে সেটা নয়, বরং তাকে গভীরভাবে, সম্পূর্ণরূপে তোমরা যাতে বুঝতে পারো— শিক্ষার উচিত তাতে সহায়তা করা। তবেই তোমরা সেই সমাজের আবদ্ধ দশা থেকে বেরিয়ে এসে এমন এক সত্তায় পরিণত হবে যার মধ্যে অহংয়ের ঔদ্ধত্য নেই। তোমাদের সত্তায় তখন রয়েছে অন্য এক প্রতীতি, অন্য এক আস্থা, কারণ তোমরা অকপট।

তবে দুঃখের ব্যাপারটা হলো আমরা প্রত্যেকেই— হয় কী করে এই সমাজের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটাবো অথবা কীভাবে সমাজটার সংস্কার করবো তার ব্যাপারেই ব্যস্ত থাকি। তোমরা যে প্রশ্নগুলো করেছো সেগুলোও ঐ মনোভাবই ব্যক্ত করে। 'কী করে বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থাটার সাথে মানিয়ে নেওয়া যাবে, আমার বাবা-মা কী বলবেন, যদি মানিয়ে না নিই তাহলে কী কী ঘটতে পারে'— তোমাদের সব প্রশ্নগুলো এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এমন ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি— তোমাদের যত উৎসাহ বা উদ্যমই থাকুক আর যত দৃঢ় প্রত্যয়ই থাকুক, সেই সবকিছুকেই সারশূন্য করে দেয়। তোমরা স্কুল-কলেজের গণ্ডী যখন পেরোও তখন তোমরা এক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র হয়ে যাও। তোমাদের কোনো বিষয়ে প্রশ্নাতীত দক্ষতা থাকতে পারে, কিন্তু সত্তার গভীরে সৃষ্টিশীলতার আগুন— তার আলো, তার উত্তাপ নিয়ে জ্বলতে থাকে না। এইজন্যই যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আছো তাকে খুব গভীরভাবে বুঝতে

হবে; কারণ, এই বোঝবার যে প্রক্রিয়া তার মধ্যে দিয়েই একজন এর থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

তোমরা দেখবে, এটাই কিন্তু সারা পৃথিবীর সমস্যা। সে রাশিয়া, ইউরোপ বা ভারতে যেখানেই হোক না কেন, যেহেতু পুরোনো চলার পথগুলো সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, মানুষ জীবনে নতুন মূল্য, নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান করছে। জীবন হলো অবিরাম চ্যালেঞ্জ। কেবল কতগুলো উন্নত আর্থিকসংস্কার দ্বারা এই চ্যালেঞ্জ— যা ক্ষণে ক্ষণে নতুন— তার প্রতি পূর্ণ সামগ্রিকতার সাথে সাড়া দেওয়া যাবে না। যখন কোনো সংস্কৃতি, মানুষ এবং সভ্যতা এই নতুন নতুন চ্যালেঞ্জে পূর্ণভাবে সাড়া না দিতে পারে তখন তারা মৃত্যুর আলিঙ্গনে চলে যায়।

যদি প্রকৃত শিক্ষা তোমরা না পাও, যদি সেই অকপট বিশ্বাস না আসে, তবে সমষ্টি তোমাদের আত্মসাৎ করবেই, তোমরাও ভিড়ের যে সাধারণ মানসিকতা— তাতে হারিয়ে যাবে। হয়তো তোমাদের নামের পাশে কিছু শব্দ বসবে বা তোমাদের বিবাহ হয়ে সন্তানাদি হবে, কিন্তু এইগুলোই তোমাদের জীবনের শেষ সীমা হয়ে রয়ে যাবে।

আমরা অধিকাংশই ভীত। তোমরা যদি একটা পূর্ণ-মানবীয় সত্তায় পরিণত হও— এই ভয়ে তোমাদের পিতামাতারা, তোমাদের শিক্ষকরা, রাষ্ট্র ও ধর্ম সব ভীত। তোমরা যেন পারিপার্শ্বিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব যে লক্ষ্মণরেখা টেনেছে, তার মধ্যেই নিরাপদে নিস্তরঙ্গভাবে তোমাদের জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারো, এটাই তাঁদের চাহিদা। কিন্তু সমাজের কাঠামোটার সমগ্র ব্যাপারটা উপলব্ধি করে যে ব্যক্তি বেরিয়ে আসেন তিনি কিন্তু তাঁর নিজের মনের মধ্যে যে সংস্কারগুলো রয়েছে, তার দ্বারা সীমাবদ্ধ নন। এমন ব্যক্তিই নতুন সভ্যতার রূপকার হতে পারেন। যাঁরা মানিয়ে নেন অথবা তাঁদের ছাঁচটার সাথে অন্য ছাঁচটা মিলছে না বলে বিরোধ করেন—

কোনোদিনই, যে নতুন সভ্যতার কথা বলছি তার গঠনে তাঁরা অংশ নিতে পারবেন না। ঈশ্বরই বলো আর সত্যই বলো, এই বন্দীশালার মধ্যে থেকে তা খোঁজা সম্ভব নয় বরং এই কারাগারটাকে চিনতে পারা এবং তার সীমানাচিহ্নকে অতিক্রম করা, তথা এক মুক্তজীবনের দিকে অগ্রসর হওয়ার মধ্যে দিয়েই এক নতুন সংস্কৃতি, এক অন্য ভুবন গড়ে ওঠে।

প্রশ্নকারী ঃ *আমরা কেন সঙ্গী চাই?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করছে আমরা কেন সঙ্গী চাই। কেন কেউ সঙ্গী চায়? তোমরা কি স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু ছাড়া এ পৃথিবীতে একা বেঁচে থাকতে পারবে? অধিকাংশ লোকের কাছে তা স্বপ্নেরও অতীত, তাই তাদের অনেক সঙ্গীর প্রয়োজন। একা থাকার জন্য অপরিমেয় মেধার প্রয়োজন। ঈশ্বর বা পরমকে খুঁজতে গেলেও তোমাকে একা থাকতে হবে। একটা সঙ্গী থাকা, একটা স্বামী বা স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততি থাকা আনন্দের। কিন্তু দেখবে আমরা ধীরে ধীরে একটা পরিবার, একটা চাকরী, একটা ক্লান্তিকর অস্তিত্বের চোরাস্রোতে নিমজ্জিত হতে থাকি। এবং অভ্যাস আমাদের এতো দূর অবধি নিয়ে যায় যে একা থাকার একটু ভাবনাই আমাদের কাছে কেমন বিভীষিকার মতো মনে হয়। একটা পরিবার, একটা উপার্জনের ক্ষেত্রকে জীবনের সীমান্তরেখা জেনে— এতেই আমরা আমাদের সব বিশ্বাস, সব ইচ্ছাকে ঢেলে দিই। এগুলো বাদ দিয়ে আমাদের জীবনে আর কোনো সমৃদ্ধির প্রশ্নই ওঠে না। অর্থ বা জ্ঞানের প্রাচুর্য নয়— সে তো যে কেউই লাভ করতে পারে, কিন্তু যদি কেউ আদি-অন্তহীন পরমের যে বোধ— সেই ঋদ্ধি লাভ করে, তবে সঙ্গীর ব্যাপারটাই তার কাছে গৌণ হয়ে যায়।

তোমাদের কিন্তু একা থাকবার জন্য শিক্ষিত করে তোলা হয়

না। কখনো একা হাঁটতে বেরিয়েছো? এটা দরকার, একেবারে একা বেরিয়ে যাওয়া, কোনো গাছের তলায় বসা— অবশ্যই কোনো বই নিয়ে বা কারোর সঙ্গে নয়, একেবারেই একা। সেখানে কোনো পাতার ঝরে পড়া দেখো, নদীর চলার শব্দকে শুনো, দূরে জেলে মাঝিদের গান শুনো, আর পাখীর ওড়াকে দেখো। নিজের মনের পরিসরে কীভাবে একটা চিন্তা রুদ্ধশ্বাসে আর একটা চিন্তাকে তাড়া করছে তাকেও লক্ষ্য কোরো। যদি একা থাকতে পারো আর এগুলোকে লক্ষ্য করতে পারো, তাহলে যে ঐশ্বর্য লাভ করবে, তারজন্য কোনো রাষ্ট্রকে তোমায় কর দিতে হবে না, কোনো ভিড় তাকে নষ্ট করতে পারবে না। সে ঐশ্বর্য অক্ষয়।

প্রশ্নকারী ঃ *বক্তৃতা দেওয়া কি আপনার একটা সখ? এই ব্যাখ্যা করতে করতে আপনি কি ক্লান্ত হন না? আপনার এটা করার ভিতরের কারণটা কী?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ আমার ভালো লাগছে তুমি এই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করেছো। একটা ব্যাপার জেনো যদি তুমি কোনো কিছু ভালোবাসো তাহলে তা থেকে কোনোদিন ক্লান্তি আসে না— আমি সেই ভালোবাসার কথা বলছি যেখানে উদ্দেশ্য থাকে না, সেখান থেকে কিছু লাভ করবো এমন কোনো কিছুর চিহ্ন থাকে না। যখন তুমি কিছুকে নিবিড়ভাবে ভালোবাসো— সেখানে আত্মতুষ্টির ব্যাপারটা থাকে না, তাই সেখান থেকে নৈরাশ্যও আসে না, আর সে ভালোবাসারও কোনো শেষ নেই। এখন প্রশ্ন কেন আমি এটা করি— জিজ্ঞাসা কোরো গোলাপকে কেন সে ফোটে, জিজ্ঞাসা কোরো বেলফুলকে কেন সে গন্ধ বিলায়, জিজ্ঞাসা কোরো পাখীকে কেন সে ডানা মেলে দেয় হাওয়ায় হাওয়ায়।

জানো, আমি কথা না বলেও দেখেছি। আমি দেখতে চেয়েছিলাম,

যদি না কথা বলি তাহলে আমার সাথে কী ঘটে ? কিন্তু আমার তাতে কোনো কিছুই পরিবর্তন হলো না। সব ঠিকঠাকই রইল। বুঝলে কি ? কিন্তু যদি অর্থ-সম্মান-প্রশংসা-আত্মগৌরব— তোমার কথা বলার কারণ হয়, তবে ক্লান্তি আসবে শ্রান্তি আসবে আর তোমার কথাও অন্য সব কিছুকে নষ্ট করবে। অমন কথা বলা নিজেকে ভর্তি করার চেষ্টা, আত্মতুষ্টির অর্থশূন্যতা। কিন্তু হৃদয়ে যদি মনের ঐসব পঙ্কিলতা না থাকে, যদি প্রেম থাকে, তখন হৃদয় সেই প্রাণঝরনা যা থেকে উচ্ছল-স্বচ্ছ-ধারা অনিবার বইতে থাকে।

প্রশ্নকারী ঃ *আমি যখন কাউকে ভালোবাসি আর সে রেগে যায়, তার রাগে এতো তীব্রতা থাকে কেন?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ প্রথমতঃ তুমি কি কাউকে ভালোবাসো ? তুমি কি জানো কাউকে ভালোবাসা মানে কী ? এর অর্থ হল তোমার মন, তোমার হৃদয়, তোমার সমগ্র সত্তাকে উপহার দেওয়া, আর বিনিময়ে ভালোবাসা পাওয়ার জন্য ভিক্ষাপাত্র তার দিকে এগিয়ে না দেওয়া। বুঝতে পারছো ? এমনভাবে ভালোবাসলে কি রাগ থাকে ? তথাকথিত যে ভালোবাসা, তেমন সাধারণভাবে আমরা যখন কাউকে ভালোবাসি তখন আমরা কেন রেগে যাই ? আমরা সেই ব্যক্তির থেকে যা আশা করি তা পাই না বলে রেগে যাই, নয় কি ? আমরা আমাদের স্ত্রী বা স্বামী বা সন্তান-সন্ততিকে ভালোবাসি। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা 'ভুল' কিছু করে আমরা রেগে যাই। কেন বলতে পারো ?

কেন বাবা তাঁর ছেলে বা মেয়ের উপর রেগে যান ? কারণ তিনি চান তাঁর সন্তান যেন বিশেষ একটা ছাঁচকে মেনে চলে, কিন্তু শিশু তো বিদ্রোহ করে বসে। বাবা-মায়েরা আসলে— তাঁদের সম্পত্তি, তাঁদের ছেলে-মেয়ের মাধ্যমে নিজেদের ইচ্ছাপূরণ, নিজেদের অমরতা চান ; আর যখন তাঁরা যা চান না— সন্তান তাই করে, তখন ভীষণভাবে

রেগে যান। তাঁরা নিজেদের সন্তানকে একটা আদর্শ অনুযায়ী তৈরী করতে চান, এবং সেই আদর্শ দ্বারা নিজেদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে থাকেন, আর সন্তান যখন সেই আদর্শের প্রতিকূল কিছু করে বসে তখন তাঁরা ক্রুদ্ধ হন।

কখনো লক্ষ্য করেছো তোমরা তোমাদের বন্ধুদের উপর কতো রেগে যাও? সেখানেও একই ঘটনা ঘটে। তুমি তার থেকে কিছু আশা করো, আর সেই আশা যখন সেই মানুষটা পরিপূরণ না করে তখন তুমি হতাশ হও— যার অর্থ অন্তরের দিক থেকে, মানসিক দিক থেকে তুমি সেই ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। তাই যেখানেই এই মানসিক নির্ভরতা রয়েছে, সেখানেই হতাশা রয়েছে। এই হতাশা, এই নৈরাশ্য— রাগ, তিক্ততা, ঈর্ষা এবং আরো যেসব দ্বন্দ্বের রূপ আছে তাদের জন্ম দেয়। সেইজন্যই ছোটবেলা থেকেই সবকিছুকে সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালোবাসা দরকার, সে কোনো গাছ বা প্রাণী বা শিক্ষক অথবা বাবা-মা হতে পারে। তাহলে তোমরা দ্বন্দ্বহীনভাবে, নির্ভয়ে বাঁচা কী, তা নিজেরাই খুঁজে পাবে।

কিন্তু দেখবে শিক্ষকেরা নিজেদের পরিবার, নিজেদের টাকা-পয়সা আর সম্মান তথা নিজেদের চিন্তা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। তাঁদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই, আর এটাই শিক্ষার অন্যতম সঙ্কট। হয়তো তোমাদের হৃদয়ে ভালোবাসা আছে, কারণ যখন তোমরা তোমাদের জীবন শুরু করো, সেই সময়ে হৃদয়ে ভালোবাসা থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু খুব শীঘ্রই তোমাদের বাবা-মা, তোমাদের শিক্ষকেরা, সামাজিক পরিবেশ তাকে নষ্ট করে দেয়। সেই সারল্য, সেই প্রেম, যা জীবনের সৌগন্ধ— তাকে বাঁচিয়ে রাখা বড়ো কষ্টের; এর জন্য অপরিমেয় মেধা আর গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন।

প্রশ্নকারী ঃ *মন কী করে এর বাধাগুলোকে অতিক্রম করবে?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ বাধাগুলোকে অতিক্রম করতে হলে সেইগুলো সম্পর্কে আগে সচেতন হতে হবে, নয় কি ? তোমাকে মনের সীমাবদ্ধতা, তার চৌহদ্দিটাকে খুব ভালোভাবে চিনতে হবে। কিন্তু আমরা খুব কম জনই তাকে চিনি। আমরা জানি বলে মুখে অবশ্য বলে থাকি, কিন্তু ওটা কথার কথা। আমরা কখনই বলি না 'এই তো আমার মধ্যে এইখানে বাধা এইখানে বন্ধন, আমি একে জানতে চাই, কী করে এ এলো, এর সম্পূর্ণ প্রকৃতিটাই-বা কী, আমি এইসব কিছুর সাথে পরিচিত হতে চাই'। একজন যখন নিদানটা খুঁজে পায়, তখন তার নিরাময়টাও খুঁজে পাওয়ার সম্ভবনা থাকে। কিন্তু এই ব্যাধিটাকে, তথা মনের এই বিশেষ সীমাবদ্ধতা, তার বাধা তার বন্ধনকে বুঝতে গেলে তাদের দোষ দেওয়া চলবে না। এই ব্যাপারটাকে কোনো আগের ধারণা দিয়ে বা তার সম্পর্কে মতামতের মধ্যে দিয়ে না দেখে, একে নিরীক্ষণ করতে হবে। আর সেটাই কঠিন, কারণ তাকে দোষারোপ করতে হয়— এই কথাটা জেনেই, এই অভ্যাসেই আমরা বড়ো হয়েছি।

একটা শিশুকে বুঝতে গেলে তাকে দোষারোপ করা চলবে না। তাকে দোষারোপ করার কোনো অর্থই হয় না। সে যখন খেলছে, কাঁদছে, খাচ্ছে— তাকে লক্ষ্য করতে হবে, তার সবরকম মানসিক অবস্থায় তাকে লক্ষ্য করতে হবে। আর যদি বলো সে দেখতে ভালো নয়, তার বুদ্ধি মোটা, সে এটা, সে ওটা তাহলে লক্ষ্য করতে পারবে না। মনের উপরিস্তরের এবং গহন অবচেতনের বাধা-বন্ধনগুলোর উপর দোষ না দিয়ে, যদি তাদের শুদ্ধভাবে কেবল নিরীক্ষণ করো, তাহলে মন তাদের অতিক্রম করে। আর এই অতিক্রমের মধ্যে দিয়েই মন সত্যের দিকে অগ্রসর হয়।

প্রশ্নকারী ঃ *ঈশ্বর পৃথিবীতে কেন এতো পুরুষ এবং নারী সৃষ্টি করেছেন ?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ কেন ধরেই নিচ্ছ যে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন? জৈবিক প্রবৃত্তি বলে একটা সহজ ব্যাখ্যা আছে। প্রবৃত্তি-কামনা-অভীপ্সা-লালসা— এই সবকিছুই জীবনের অঙ্গ। এখন তুমি যদি বলো 'জীবনই ঈশ্বর' তাহলে সেটা অন্য ব্যাপার। তখন প্রচুর আসক্তি-লালসা-ঈর্ষা-ভয়— এগুলোও ঈশ্বর। এইসব কারণগুলো থেকে পৃথিবীতে এতো সংখ্যক পুরুষ ও নারী সৃষ্টি হয়েছে তথা এক জনবিস্ফোরণ ঘটেছে। এটা এই দেশেরও অন্যতম একটা অভিশাপ। কিন্তু দেখবে এই সমস্যার এতো সহজে সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন ধরণের উত্তেজনা, উদ্দীপনা, বাধ্যবাধকতা, অবদমন মানুষ জন্মসূত্রেই লাভ করে। এই বিরাট জটিল প্রক্রিয়াটিকে উপলব্ধি না করলে জন্ম নিয়ন্ত্রণের অর্থ খুবই কম। আমরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত-ভাবে এই পৃথিবীকে এক কিম্ভূতকিমাকার জায়গায় পরিণত করেছি। তার কারণ হল বেঁচে থাকা যাকে বলে আমরা সেটাই জানি না। কখনো চটকদার, কখনো উদাসীন, এক নিয়ন্ত্রিত, এক সসীম বস্তু— যাকে আমরা জীবন বলে মেনে নিয়ে বসে আছি— আসলে তা জীবন নয়। জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু। জীবনের বৈভবশালিতা অপরিমিত, জীবন অবিরাম পরিবর্তনশীল। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সেই শাশ্বত প্রবাহকে উপলব্ধি করতে পারবো, ততক্ষণ আমাদের জীবনের নিরর্থকতা রয়েই যাবে।

১৩

সমানতা

শুকনো মাটির বুকে বৃষ্টি নেমে আসা ভারী অদ্ভুত, নয় কি? চারিদিকে গাছের পাতার সব মলিনতা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার, পৃথিবী আবার নতুন প্রাণে স্পন্দিত। আমার মনে হয় ঐ গাছেদের পাতা যেমন বৃষ্টির জলে আরো পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তেমনভাবেই আমাদের মনকেও পরিষ্কার করতে হবে। বহু শতাব্দীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ধুলার আবর্জনায় আমাদের মন ভারী হয়ে আছে। যদি প্রতিদিন এই মনকে গতকালের সঞ্চিত সব ধুলো পরিষ্কার করে, পরিচ্ছন্ন রাখতে পারি, তবে আমরা এক সতেজ, এক অনবসন্ন মন লাভ করবো। সেই মন অস্তিত্বের অসংখ্য সমস্যার সমাধানে সমর্থ হবে।

পৃথিবীতে যে সমস্যাগুলো সবচেয়ে বেশী বিক্ষোভ সৃষ্টি করছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো সাম্যের সমস্যা। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সমানতা বলে কিছু হয় না, তার কারণ হলো আমাদের বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকমের দক্ষতা রয়েছে। আমরা যে সমানতার কথা বলছি তা হলো যে কোনো স্তরের মানুষের সাথে সমান ব্যবহার করা। স্কুলের কথাই ধরো। প্রধানশিক্ষক, শিক্ষক, গৃহপিতা বা গৃহমাতা (house parents), এগুলো হলো কেবল এক একটা পদ এবং এঁদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু দেখবে এই পদ বা ভিন্ন ভিন্ন

ভূমিকাগুলোর সাথে জড়িয়ে আছে পদ-মর্যাদা, সম্মান। পদের সম্মান আছে, কারণ পদের সাথে থাকে ক্ষমতা। সেই ক্ষমতা বলে কেউ অন্যকে চলে যেতে বলতে পারেন, অন্যকে আদেশ করতে পারেন, তাঁর নিজের কোনো বন্ধুকে বা পরিবারের কোনো সদস্যকে চাকুরি দিতে পারেন। সুতরাং যাঁর যা ভূমিকা, তার সাথে জড়িয়ে থাকে সম্মান। কিন্তু আমরা যদি ঐ সম্মান, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা, পরিচিত কাউকে সুবিধা দেওয়া— এইসবকে দূরে সরিয়ে রাখি, তবে কাজের এক ভিন্ন এবং সহজ অর্থ আবিষ্কার করা যাবে, নয় কি? তখন কেউ রাজ্যপাল বা প্রধানমন্ত্রী হোন বা কোনো দরিদ্র শিক্ষক বা রান্নার পাচকই হোন, সবাই সমান সম্মান পাবেন। কারণ তাঁরা সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করছেন।

বলতে পারো, যদি বিশেষত স্কুল থেকে আমরা যাঁর যা কাজ— তার থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমতা এগুলোকে মুছে ফেলতে পারি অর্থাৎ 'আমি হলাম এখানে প্রধান, আমার গুরুত্ব অপরিসীম' এমন ভাবকে যদি মুছে ফেলতে পারি— তাহলে কী ঘটবে? আমরা এক ভিন্ন পরিমণ্ডলে বাস করবো, তাই নয় কি? অর্থাৎ কারো কর্তৃত্ব থাকবে না; কেউ উচ্চপদের, কেউ নিম্নপদের, কেউ বিরাট ব্যক্তি, কেউ সাধারণ ব্যক্তি— এই সব থাকবে না। এইভাবেই সেখানে একটা মুক্তির বাতাবরণ থাকবে। বিদ্যালয়ে এমন পরিবেশ তথা এক মুক্তির পরিবেশ, এক স্বাধীনতার পরিবেশ খুবই প্রয়োজনীয়— যেখানে প্রেম থাকবে, যেখানে একজন নিজের ভিতরের বিশ্বাসকে গভীরভাবে অনুভব করবে। দেখবে যখন তোমরা খুব স্বস্তি এবং নিরাপদ বোধ করো তখনই সেই বিশ্বাস অনুভব করো। যদি তোমাদের বাবা-মা বা দাদু নিরন্তর তোমাদের কী করা উচিত তারই নির্দেশ দিতে থাকেন এবং ধীরে ধীরে তোমরা নিজেরা যে কিছু করতে পারো তার বিশ্বাসটাই হারিয়ে ফেলো, তাহলে বাড়িতেও কি আদৌ স্বস্তিবোধ করবে?

তোমাদের বেড়ে ওঠার সাথে সাথে যেন তোমরা যা ভাবছো তার সত্যতা নিরূপণের জন্য আলাপ-আলোচনা করতে পারো, অনুসন্ধান করতে পারো, সে সত্যে স্থির থাকতে পারো। যা তোমরা সত্য বলে বিবেচনা করেছো তাতে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকতে হবে, তাতে কষ্ট আসতে পারে, হতাশা আসতে পারে, আর্থিক ক্ষতিও হতে পারে। আর এর জন্যই যখন তোমরা ছোটো, তোমরা যে পরিবেশে থাকো, সেখানে যেন তোমরা নিরাপদ বোধ করো, স্বস্তিবোধ করো।

অধিকাংশ তরুণ মন ভীত, তারা নিরাপদ বোধ করে না। তারা তাদের শিক্ষকদের, পিতামাতাদের বিশেষত বয়োজ্যেষ্ঠদের ভয়ে ভীত। তাই তারা কখনই স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বস্তি বোধ করে না। কিন্তু যখনই তোমরা স্বাচ্ছন্দ্য, এক সহজ স্ফূর্তি অনুভব করো, তখন একেবারে অন্য কিছু ঘটে। যখন তোমরা স্বেচ্ছায় নিজের ঘরে যাও, দরজাটা বন্ধ করো, সেখানে অন্য কারোর চোখ তোমাদের লক্ষ্য করে না, কেউ তোমাদের নির্দেশ দেয় না কী করতে হবে এবং তোমরা নিজের সাথে থাকতে পারো, তখন তোমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করো। তখন তোমরা বুঝতে শুরু করো। সত্তার একটা পর একটা স্তরের দরজা তোমাদের জন্য খুলতে থাকে, তোমরা ভিতর থেকে ফুলের মতোই ফুটে উঠতে শুরু করো; সত্তার এই বিভিন্ন স্তরের উন্মীলনে সহায়তা করাই হলো বিদ্যালয়ের কাজ। সে কাজে বিদ্যালয় যদি সহায়ক না হয়, তবে তা বিদ্যালয়ই নয়।

কোনো জায়গায় তোমরা যদি থাকো, যেখানে নিরাপত্তা রয়েছে, কোনো আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, যেখানে বিভিন্ন জিনিস করার ব্যাপারে রক্ত চক্ষুর শাসন নেই, যেখানে তুমি এক স্বচ্ছন্দতা, সম্পূর্ণ সোয়াস্তি, এক স্ফূর্তি অনুভব করো, সেখানে কিন্তু তোমরা দুষ্টুমি করো না, তাই তো? যখন তোমরা সুখী তখন তোমরা কাউকে আঘাত করতে চাও না, কোনো কিছুকে নষ্ট করতে চাও

না। কিন্তু ছাত্রদের সম্পূর্ণরূপে সুখী করা কিন্তু মোটেই সহজ নয়; কারণ— প্রধানশিক্ষক, শিক্ষক, গৃহপিতা বা মাতা (house parents) তাদের বলতে থাকবে তাদের কী করতে হবে এবং সবসময় তাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে— এমনই এক ধারণা নিয়েই তারা স্কুলে আসে। স্বভাবতই তাদের মধ্যে ভয় থাকে।

তোমরা যেসব পরিবার বা বিদ্যালয় থেকে আসো সেখানে তোমাদের পদমর্যাদা, প্রতিষ্ঠাকে সম্মান জানাতে শেখানো হয়। তোমাদের পিতা-মাতাদের পদমর্যাদা আছে। স্কুলের যিনি প্রধানশিক্ষক তাঁরও পদমর্যাদা রয়েছে। তোমরা পদমর্যাদাকে সম্মান করে, ভয় নিয়েই এখানে আসো। কিন্তু আমাদের এমন বিদ্যালয় গড়তে হবে যেখানে একটা মুক্ত পরিবেশ থাকে। যখন স্কুলে আমরা যাঁর যা কাজ সেটার সাথে পদমর্যাদাকে না জুড়ে, নিজেদের ভূমিকা পালন করবো, তখন এক সমানতার অনুভূতি আসবে। শিক্ষার কাজ হলো তোমাদের এক প্রাণবন্ত এবং সংবেদনশীল মানুষে পরিণত করা। তোমরা হবে নির্ভীক; উচ্চপদ, প্রতিষ্ঠার প্রতি তোমরা কোনোদিন মিথ্যা সম্মানজ্ঞাপন করবে না।

প্রশ্নকারী ঃ *কেন আমরা আমাদের খেলার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাই, পড়াশুনায় তা পাই না?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ কারণটা পরিষ্কার— তোমাদের শিক্ষকরা জানেন না তোমাদের কীভাবে পড়াতে হয়। এর অন্য কোনো জটিল কারণ নেই। যদি তোমাদের কোনো শিক্ষক গণিত বা ইতিহাস— যেটাই তিনি পড়ান না কেন, নিজে যদি সেই বিষয়টিকে ভালোবাসেন, তবে তোমরাও সেই বিষয়টিকে ভালোবাসবে। কারণ কোনো কিছুর প্রতি ভালোবাসা ভীষণ সংক্রামক। তোমরা কি এ ব্যাপারটা জানো? যদি কোনো গায়ক গাইতে ভালোবাসেন, যদি তিনি নিজের সবটুকু ঢেলে দিয়ে কিছু গান, তোমরা

যারা শুনছো তাঁর সেই গভীর অনুভূতির বানী কি তোমাদের হৃদয়কে কিছুই শোনায় না? তোমাদের মধ্যে এক উৎসাহ দেখা যায়। কী করে অমন গান গাওয়া যায়— তোমরাও তা শিখতে চাও। আসলে অধিকাংশ শিক্ষকই তাঁর বিষয়টিকে ভালোবাসেন না। ওটা তাঁর কাছে এক ক্লান্তিকর বোঝা। ব্যস, জীবিকার্জনের জন্যই অভ্যাসবশত তিনি ওটা পড়িয়ে যান। যদি শিক্ষকরা পড়াতেই ভালোবাসতেন, তোমাদের কী হতো তা কি তোমরা জানো? তোমরা এক একজন অসাধারণ মানুষে পরিণত হতে। তখন শুধু যে তোমরা তোমাদের খেলা বা পড়াশুনোকেই ভালোবাসতে এমন নয়; ফুল, নদী, পাখী, এই পৃথিবীকেও প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে, কারণ তখন ভালোবাসার উপস্থিতিতে হৃদয় মুখরিত, মথিত। তোমরা সব কিছু আরো তাড়াতাড়ি শিখতে, তোমাদের মন হতো অনন্যসাধারণ।

এইজন্যই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হলো শিক্ষকদের শিক্ষিত করে তোলা। এটা ভারী কঠিন, কারণ তাঁরা অধিকাংশই আগে থেকেই তাঁদের অভ্যাসের আসনে জাঁকিয়ে বসে আছেন। কিন্তু তোমাদের তরুণদের মনে অভ্যাসের আসন এখনও অতোটা পাকা হয়ে ওঠেনি। যদি কোনো একটা বিষয়কে সেই বিষয়টার জন্যই ভালোবাসো (অর্থাৎ অর্থ, খ্যাতি, সম্মানের জন্য নয়) তথা তোমাদের খেলা, গণিত, ইতিহাস, চিত্রবিদ্যা বা সঙ্গীত কোনো কিছুকে তার জন্যই ভালোবাসো, তবে দেখবে বৌদ্ধিক দিক থেকে তুমি অনেক সচেতন ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠছো। তখন অন্য সমস্ত বিষয়গুলোও তোমাদের আয়ত্তে চলে আসে। আসলে মন জানতে চায়, খোঁজে, কারণ মন কৌতুহলী। কিন্তু ভ্রান্ত শিক্ষা এই কৌতুহলটাকে নষ্ট করে দেয়। সেই কারণেই ছাত্রদের সাথে সাথে শিক্ষকদেরও শিক্ষিত করে তুলতে হবে। বেঁচে থাকা— স্বয়ং শিক্ষার একটা প্রক্রিয়া, শিখতে থাকার একটা প্রক্রিয়া। পরীক্ষাগুলো জীবনে কোনো-না-

কোনোদিন শেষ হয়, কিন্তু শিখে চলার কোনো শেষ নেই। যদি মন কৌতুহলী ও সজাগ থাকে তাহলে তুমি সব কিছু থেকে শিখে চলো।

প্রশ্নকারী ঃ *আপনি বলেছিলেন যখন কেউ কোনো কিছুর ভুলটা, তার ব্যর্থতাটা দেখতে পায়, তা আপনেই তার জীবন থেকে চলে যায়। আমি রোজ ধূমপানের ভুল জায়গাটা, তার ব্যর্থতাটা দেখি, কিন্তু ওটা তো আমার জীবন থেকে চলে যাচ্ছে না?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ তুমি কি কোনোদিন তোমার বাবা, শিক্ষক, প্রতিবেশী বা অন্য কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে ধূমপান করতে লক্ষ্য করেছো? এটা তাঁদের একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে, ঠিক তো? তাঁরা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধূমপান করেই চলেছেন। অনেকেই এই অভ্যাসের দাসত্বের স্থূল জায়গাটা বুঝতে পেরে সেই অভ্যাসের সাথে লড়াই করেন। তাঁরা নিয়মের মাধ্যমে এবং আরো হরেকরকম পদ্ধতিতে এর থেকে মুক্তি পেতে চান। অভ্যাস হলো একটা জড় জিনিস, এটা এমন একটা ক্রিয়া যেটা নিজে থেকেই হতে থাকে। এর সাথে একজন যত লড়াই করে ততই সে সেই অভ্যাসকেই আরো বেশী শক্তিশালী করে তোলে। কিন্তু সেই ব্যক্তিকে নিজেকেই নিজের অভ্যাসটা সম্পর্কে সজাগ হতে হবে— যেমন কীভাবে তিনি পকেটে হাত রাখলেন, সিগারেটটা বার করলেন, কীভাবে সেটা হালকা ঠুকে নিলেন, মুখে রাখলেন, সেটা জ্বালিয়ে প্রথম টানটা দিলেন ইত্যাদি। প্রত্যেকবার কোনো দোষ-গুণ না বিচার করে তথা সিগারেট টানা সত্যি ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর, এইসব না বলে— এই অভ্যাসটাকে যদি কেবলমাত্র নিরীক্ষণ করতে থাকেন, তবে তিনি কিন্তু ঐ অভ্যাসটাতে নতুন প্রাণশক্তি যোগ করেন না। কিন্তু যা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এমন কিছুকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করতে হলে, তোমাকে আরো অনেক গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান

করতে হবে। যার অর্থ হলো— মন কেন অভ্যাস পুষে রাখে অর্থাৎ কেন তাকে দিনের-পর-দিন বয়ে নিয়ে চলে অথবা কেন অভ্যাস তৈরী করে, এর অর্থ হলো মন কেন অসতর্ক বা অমনোযোগী থাকে? যদি জানালা দিয়ে বাহিরে দেখতে দেখতে রোজ দাঁত মাজো তাহলে ওটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়; কিন্তু যদি যত্নের সাথে, তোমার পূর্ণ মনোযোগের সাথে দাঁত পরিষ্কার করো তাহলে সেটা কোনো অবোধ পুনরাবৃত্তি হয় না, তথা ওটা কোনো অভ্যাসে পরিণত হয় না।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য কোরো— মন কেমনভাবে অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকতে চায় এবং সেখানে সে কোনো বিক্ষোভ চায় না। অধিকাংশ লোকের মনই অভ্যাসের বাঁধা পথেই চলাচল করে। যতো বয়স বাড়ে এই অবস্থাটা আরো শোচনীয় হয়ে ওঠে। হয়তো তোমরা এর মধ্যেই বেশ কয়েক ডজন অভ্যাসকে নিজেদের সাথে জড়িয়ে নিয়েছো। তোমার বাবা-মা যেমন বলছেন তেমন না করলে কী হবে, তোমার বাবার চাওয়া অনুযায়ী যদি বিবাহ না করো তবে কী হবে— এইভাবে প্রথম থেকেই মন পুরোনো চেনা ছকের মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে থাকে। তোমার বয়স হয়তো দশ কি পনেরো, কিন্তু মন যদি এমনই নির্দিষ্ট পুরোনো রাস্তায় ঘোরাফেরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তখন আসলে তুমি বৃদ্ধ, তোমার মধ্যে ক্ষয়ের ঘুন ধরা শুরু হয়ে গেছে। তোমার শরীর হয়তো হৃষ্টপুষ্ট, কিন্তু সেটার কোনো মূল্য নেই। তোমার শরীর হতে পারে তরুণ, তার মধ্যে এক ঋজুতাও রয়েছে, কিন্তু মন তার নিজের ভারে, পুরোনোর ভারে ন্যুব্জ।

মন কেন অভ্যাসের সীমানার মধ্যে থাকে, কেন সে সীমানার বাহিরে পা রাখতে ভয় পায়, কেন কোনো গাড়ির মতো রাস্তাটুকুর উপর নির্ভর করে চলতে চায়, কেন প্রশ্ন করতে, অনুসন্ধান করতে ভয় পায়— এই সমস্ত ব্যাপারগুলোকে বুঝতে হবে। ধরো তুমি

যদি বলো আমার বাবা শিখ, তাই আমি শিখ, আমি বিরাট চুল রাখবো, পাগড়ি বাঁধবো এবং এগুলোর মধ্যে যদি কোনো অনুসন্ধান না থাকে, এগুলোকে যদি প্রশ্ন না করে, এগুলোকে ভেঙে বেরোবার কথা না ভেবে যদি কেবল মেনে নেওয়া থাকে— তাহলে তুমি অনেকটা যন্ত্রের মতোই। ধূমপানও তোমাকে মেসিনের মতো কিছুতে পরিণত করে, তুমি অভ্যাসের দাসত্ব করো— এ পুরো ব্যাপারটাকে যখন বুঝতে পারো তখন মন তাজা, সক্রিয়, নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়। তখন প্রত্যেকদিন এক নতুন দিন, আর নদীর জলে প্রতিবিম্বিত প্রত্যেক সকাল চেয়ে দেখবার মতো এক আনন্দময় কিছু হয়ে ওঠে।

প্রশ্নকারী ঃ *কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ যখন গম্ভীর হয়ে ওঠেন আমরা কেন ভয় পাই? কী তাঁদের গম্ভীর করে তোলে?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ গম্ভীর হওয়া মানে কী, তোমরা কোনোদিন ভেবে দেখেছো? তোমরা কি কখনো গম্ভীর হও? সবসময়ই কি তোমরা আনন্দিত, হাস্যপরিহাসমুখর, নাকি এমনও কোনো সময় আসে যখন তোমরা শান্ত, গম্ভীর, অবশ্য কোনো বিশেষ ব্যাপারে গম্ভীর— এমন নয়, কেবল ধীর, গম্ভীর? তাহলে যখন বড়োরা গম্ভীর হন, তখন তোমাদের ভয় পাওয়ার কী আছে? নাকি তোমার মধ্যে এমন কোনো জিনিস আছে যা তুমি নিজেই পছন্দ করো না, কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ হয়তো তোমার মধ্যে তা দেখে ফেলতেও পারেন? দেখছো তো, আমরা কিন্তু এইসব ব্যাপার নিয়ে কেউ ভাবি না; কোনো বয়স্ক ব্যক্তি যিনি রাশভারী বা গম্ভীর, তাঁর সান্নিধ্যে আমরা কেন ভয় পাই, আমরা কিন্তু সেটা নিয়ে কোনো অনুসন্ধান করি না। আমরা কিন্তু নিজেদের জিজ্ঞাসা করি না, "কেন আমরা ভীত?"

এখন প্রশ্ন হলো, গম্ভীর হওয়ার অর্থ কী? হয়তো কতকগুলো তুচ্ছ ব্যাপারে তুমি খুবই ঐকান্তিক। যখন একটা শাড়ি কেনার ব্যাপার

আসে, তখন তুমি তোমার পুরো মনোযোগটা দাও, ওটা নিয়ে ভাবো, সুন্দর ডিজাইনের শাড়িটার জন্য সারা সকাল এ দোকান ও দোকান দৌড়োদৌড়ি করো। এটাও এক ধরণের কোনো বিষয়কে গম্ভীরভাবেই দেখা বলে। কিন্তু ব্যক্তির মধ্যে উপরভাসা জিনিসের ব্যাপারে এই ব্যাপারটা দেখা যায়। মন্দিরে যাওয়ার ব্যাপারে, সেখানে ফুলমালা দেওয়ার ব্যাপারে, পুরোহিতকে দক্ষিণা দেবার ব্যাপারেও তোমার মধ্যে ঐ গম্ভীর হাবভাবই লক্ষ্য করা যেতে পারে, কিন্তু এগুলো মিথ্যা গাম্ভীর্য, নয় কি? কারণ সত্য বা ঈশ্বর কোনোদিন মন্দিরে দেওয়ালের ভিতরে থাকে না। কখনও আবার তোমরা জাতীয়তাবাদের মতো কৃত্রিম ব্যাপার নিয়েও গম্ভীর হয়ে যাও।

তোমরা কি জানো জাতীয়তাবাদ কী? 'আমার ভারত, আমার দেশ, তার দোষ গুণ' অথবা ভারতের আধ্যাত্মিকতার অতুল ঐশ্বর্য্য আছে তাই এই দেশ অন্য যে কোনো দেশের থেকে উঁচু— এমনই সব অনুভূতি ও মনোভাবই হলো জাতীয়তাবোধ। কোনো বিশেষ দেশের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে দেখা এবং তার জন্য গর্ব অনুভব করার মধ্যে দিয়েই আমরা স্বাদেশিকতাবোধকে নিয়ে আসি। এই জাতীয়তাবাদকে অনেকে সবচেয়ে উঁচুতে স্থান দেন। কিন্তু এটা একটা মিথ্যা ভগবান। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ এ ব্যাপারটাকে একেবারেই লঘু করে দেখেন না। এটা তাঁদের কাছে বিরাট ব্যাপার, এরজন্য মানুষ যুদ্ধে যায়, ধ্বংস করে, অন্যকে হত্যা করে, নিজে নিহত হয়; আর এই ধরণের মনোভাবকে রাজনীতিবিদরা নিজেদের প্রয়োজনে সুচতুরভাবে ব্যবহার করে চলেন।

সুতরাং অনেক মিথ্যা ব্যাপারকেও তুমি খুব গুরুগম্ভীরভাবে নিতে পারো। কিন্তু গম্ভীরতার অর্থ কী তা যদি সত্যি খুঁজতে যাও তবে দেখবে— এমন এক অলঘুতা, এক গম্ভীরতা রয়েছে, যা কোনো মিথ্যা ক্রিয়ার দ্বারা পরিমাপ সম্ভব নয়, কোনো বিশেষ ছাঁচেও তাকে

ফেলা যাবে না, আর যখন মন কোনো ফললাভের পিছনে দৌড়োচ্ছে না, তখনই এই ধরণের ধীরতা বা গম্ভীরতা আসে।

প্রশ্নকারী ঃ *ভাগ্য কী ?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ তুমি কি সত্যি এই ব্যাপারটার গভীরে যেতে চাও ? যেকোনো একটা প্রশ্ন করা সহজ ব্যাপার। যদি কোনো প্রশ্ন তোমাকে সরাসরি প্রভাবিত করে, সে সম্পর্কে যদি সত্য ঐকান্তিকতার সাথে জানতে চাও তাহলে তেমন প্রশ্নের মূল্য আছে। কতো লোক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর সে ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহটাই চলে যায়— এটা কখনও লক্ষ্য করেছো ? সেদিন একজন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে হাই তুলতে শুরু করলেন, মাথা চুলকোতে শুরু করলেন, তাঁর পাশের ব্যক্তিটির সাথে কথা বলতে শুরু করলেন, তিনি তাঁর কৌতুহলটাই হারিয়েছিলেন। তাই তোমাদের একটা অনুরোধ করি, যে প্রশ্ন করছো তা যদি তোমাদের কাছে জ্বলন্ত প্রশ্ন না হয়, তার খোঁজ করার ব্যাপারে সত্য উৎসাহ যদি না থাকে, কেবল প্রশ্ন করার জন্যই প্রশ্ন কোরো না।

এই ভাগ্যের বিষয়টা ভীষণ জটিল ও কঠিন। দেখবে কোনো কারণ থাকলে ফলাফলও থাকবে। রাশিয়ান, আমেরিকান বা হিন্দুদের, যাদের মধ্যেই হোক— যদি বহু সংখ্যক মানুষ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয় তাহলে ফল কিন্তু যুদ্ধই হবে। যদিও মুখে তাঁরা বলতেই পারেন যে তারা শান্তিকামী, কেবল আত্মরক্ষার কারণেই এতো ব্যবস্থা, আসলে কিন্তু তারা যুদ্ধের কারণ নির্মাণ করে ফেলেছেন, তাতে প্রাণসঞ্চার করে দিয়েছেন, অনিবার্য ফল যুদ্ধ। যখন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লক্ষ কোটি মানুষ কোনো বিশেষ সভ্যতা বা সংস্কৃতির গঠন করে চলে, তারা এমন একপ্রকার গতিময় ধারা সৃষ্টি করে— যাতে ব্যক্তি নিমজ্জিত থাকে, তারই সাথে বইতে থাকে, অবশ্য তারা

সেটা চাইতেও পারে, আবার নাও পারে— সেটা অন্য ব্যাপার। এই বিশেষ ধারার কোনো সভ্যতা বা কৃষ্টির এই বিরাট ধারায় ভেসে চলা, তাতে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জনও একটা ভাগ্য বলা যেতে পারে।

ধরো তুমি কোনো আইনজীবীর সন্তান। তিনি তোমাকে আইনজীবী হওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। যদিও তুমি অন্য কিছু করতে চাও তবু যেহেতু তুমি তাঁর কথা মেনে নিলে, তাই একজন আইনব্যবসায়ী হওয়াই তোমার ভাগ্য হয়ে গেলো। কিন্তু যদি তুমি তা হতে অস্বীকার করো এবং যে জিনিসটা তোমার কাছে ঠিক বলে মনে হয়, যা তুমি প্রাণ ঢেলে করতে ভালোবাসো সেটাই করো, সে তুমি লেখকই হও, চিত্রকরই হও বা বিত্তহীন ভিক্ষুকই হও— তবে কিন্তু তুমি সেই ধারা থেকে বেরিয়ে এসেছো। তোমার পিতা তোমার জন্য যে ভাগ্যটা লিখে রেখেছিলেন তা তুমি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছো। সভ্যতা ও সংস্কৃতির থেকে বেরিয়ে এলেও কিন্তু একই ব্যাপার ঘটে।

সেইজন্যই সঠিক শিক্ষার এতো প্রয়োজন। পরম্পরা দ্বারা সংকুচিত, প্রদমিত হওয়া বা কোনো বিশেষ জাতির সংস্কৃতির বা পারিবারিক গোষ্ঠীর ভাগ্যের যে ধারা— তাকে মেনে নেওয়ার শিক্ষার কথা আমি বলছি না। এমন শিক্ষার কথা বলছি না যেটা তোমাদের এক চলমান যন্ত্রের মতো কিছু একটাতে পরিণত করে, যা অব্যর্থভাবে পূর্বনির্দ্ধারিত কোনো গন্তব্যে পৌঁছে যায়। কেউ যদি এই সম্পূর্ণ ধারাটিকে বুঝতে পেরে তার থেকে বেরিয়ে আসে, একা দাঁড়ায়; তার নিজস্ব গমন শুরু করে, যখন তার প্রতিটি ক্রিয়া অসত্য থেকে মুক্ত হয়ে সত্যের পথে যেতে থাকে, তখন সে গমনই সত্য। এমন মানুষ সমস্ত ভাগ্য ব্যাপারটা থেকেই মুক্ত হয়ে যায়।

১৪

অনুশাসন

কোনোদিন লক্ষ্য করেছো কি আমরা কেন অনুশাসিত হই, অথবা কেন আমরা নিজেরাই নিজেদের অনুশাসনের মধ্যে রাখি? সারা পৃথিবীর রাজনৈতিক দলগুলি তাদের রীতিনীতি মেনে চলার উপর খুব জোর দেয়। তোমাদের বাবা-মা, শিক্ষক বা তোমাদের চারিপাশের সমাজও বলে তোমাদের একটা অনুশাসনের মধ্যে, একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে। কেন? সত্যিই কি এই অনুশাসনের কোনো প্রয়োজন আছে? অবশ্য আমি জানি যে আমরা বেশীর ভাগই ভাবি অনুশাসন থাকা জরুরী। সমাজ, ধর্মীয় গুরু, কোনো নীতিশাস্ত্র অথবা আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা— এই অনুশাসন আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়। কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যিনি সফলতা চান, অনেক অর্থ উপার্জন করতে চান, বা কোনো বিখ্যাত রাজনীতিবিদ হতে চান— তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাকে অনুশাসিত করে। তোমাদের চারপাশের সবাই বলতে থাকে অনুশাসন প্রয়োজন; ঠিক সময়ে ঘুমোতে যাবে, ঠিক সময় ঘুম থেকে উঠবে, পড়াশুনা করবে, পরীক্ষাগুলোয় পাশ করবে, বাবা-মাকে মেনে চলবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন হলো তোমাদের অনুশাসিত হতে হবে কেন? এই অনুশাসনের অর্থ কী? এর অর্থ হলো কোনো কিছুর সাথে নিজেকে

মানিয়ে নিয়ে চলা, অন্য কোনো কিছু অনুযায়ী নিজেকে তৈরী করা, তাই নয় কি? অনুশাসন হলো, অন্যের মতামত অনুযায়ী তোমাদের চিন্তাভাবনাকে মানিয়ে নেওয়া, কতকগুলো ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করা, অন্য ইচ্ছাকে স্বীকার করা, কোনো কাজকে বিশেষ পদ্ধতিতেই করা, অন্যভাবে না করা, নিজেকে দমন করা, অন্যকে অন্ধের মতো অনুসরণ করা এবং তা কেবল মনের উপরে স্তরেই নয়, অনেক গভীর স্তরেও এইসব কিছু চলতে থাকা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুরোহিত, গুরু, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, রাজা, আইনবিদ্, যে সমাজে আমরা বাস করি সেই সমাজ— এই সবাই মিলে আমাদের শুনিয়েছে— অনুশাসন অবশ্যই প্রয়োজন।

সুতরাং আমি নিজেকে এই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করছি এবং আশা করি তোমরাও তোমাদের জিজ্ঞাসা করছো— সত্যি কি অনুশাসনের প্রয়োজন আছে? নাকি এই সমস্যাটার সমাধানের অন্য কোনো পথও রয়েছে? আমি মনে করি অন্য পথ আছে। আর স্কুলই যে শুধু এই অনুশাসনের সমস্যাটার সম্মুখীন হচ্ছে তা নয়, সারা পৃথিবীই এই সমস্যার সম্মুখীন। নিপুণতা বা দক্ষতা অর্জনের জন্য কোনো নৈতিক বিশ্বাস বা রাজনৈতিক বিশ্বাস বা বিশেষ কোনো যান্ত্রিক প্রশিক্ষণ দ্বারা অনুশাসিত হতে হবে বা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু মন যখন প্রতিপদে ভিতরে বাহিরে অনুশাসিত হতে থাকে, সে ভীষণ ভোঁতা হয়ে ওঠে।

এই অনুশাসন কি কখনও তোমাদের মুক্ত করে, না কি কোনো আদর্শের সাথে তোমরা যাতে মানিয়ে নাও তারজন্য তৈরী করে? সে আদর্শ কমিউনিস্টদের অলীক কল্পনাও হতে পারে অথবা নৈতিক বা ধর্মীয় আদর্শ বা অন্য কিছুও হতে পারে কিন্তু ব্যাপারটা একই থাকে। যে কোনো ধরণের অনুশাসনই হোক, একবার যখন তারা তোমাদের শিকল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধে, তারপর কি তারা তোমাদের

ছেড়ে দিতে পারে? কীভাবে তা সম্ভব? নাকি এমন কোনো পথ আছে, যে পথে গেলে অনুশাসনের সমস্যাটার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে এক গভীর অন্তর্দৃষ্টিকে আমরা জাগিয়ে তুলতে পারবো? এরকম কি হতে পারে— কোনো ব্যক্তির একসাথে অনেকগুলো পরস্পরবিরোধী ইচ্ছা না থেকে একটাই ইচ্ছা থাকবে? এর অর্থটা কি বুঝতে পারলে? যে মুহূর্তে দুটো তিনটে বা দশটা ইচ্ছা থাকে তখনই অনুশাসনটা জরুরী হয়ে ওঠে— তাই নয় কি? তোমরা অনেক টাকা, বাড়ি, গাড়ি চাও; আবার অন্যদিকে ভাবো খুব কম থাকা বা কিছু না থাকাটা নৈতিকতা বা ধার্মিকতা। তাহলে এমনভাবে তোমাদের কি শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব যাতে তোমরা এক অখণ্ড সত্তায় পরিণত হও, যেখানে তোমাদের ভিতরে সেই পরস্পরবিরোধী ইচ্ছার সংঘাত চলবে না, তাই কোনো অনুশাসনেরও প্রয়োজন থাকবে না? এই অখণ্ডতাতেই মুক্তির বীজ রয়েছে। আর সত্তায় যখন এই অখণ্ডতার আগমন হয়, তখন অনুশাসনের কোনো প্রয়োজনীয়তাও থাকে না। এই অখণ্ডতার অর্থ হলো কোনো এক বিশেষ সময়ে সব স্তরেই এক থাকা, অখণ্ড থাকা।

যদি তোমাদের ছোটো থেকেই সঠিকভাবে শিক্ষিত করা যায়, তবে এটা এমন এক অবস্থা আনে যেখানে তোমাদের ভিতরে ও বাহিরে কোথাও কোনো বিরোধিতা নেই। সেখানে অন্য কোনো অনুশাসন বা তোমাদের কিছু করতে বাধ্য করানো— এইসব কিছুই থাকে না; কারণ, তোমরা যাই করো— তা মুক্তভাবে, পুরো সত্তা দিয়েই সে কাজ করো। অনুশাসনের প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন বিসংগতি দেখা দেয়। তোমরা একটি বিশেষভাবে চিন্তা করো— সেটাই রাষ্ট্র এবং সব রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠনগুলো চায়, এর কারণ, যদি তারা তোমাদের পুরোপুরিভাবে কমিউনিস্ট, ক্যাথলিক বা আরো যা যা সব হয়— তাতে পরিণত করতে পারে, তাহলে তোমাদের নিয়ে

কোনো সমস্যাই থাকবে না। তোমরা তাদের মতবাদ, তাদের বিশ্বাসগুলোকে বিশ্বাস করবে এবং যন্ত্রের মতো তাদের হয়ে কাজ করে যাবে। সেখানে তুমি কেবল অনুসরণ করো বলে সেখানে আর কোনো ঝঞ্ঝাট থাকে না। কিন্তু সবরকমের অনুসরণই যান্ত্রিক, তাই সবশেষে সেটা বিনাশই আনে। কোনো সৃষ্টিশীল মুক্তি এই অনুসরণের মধ্যে দিয়ে আসে না।

এখন প্রশ্ন হলো আমরা কি ছোটো থেকেই এক সম্পূর্ণ নিরাপত্তার, এক স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ নিয়ে আসতে পারি, যাতে আমাদের ভিতরে 'অমুক কিছু হওয়ার' বা 'তমুক কিছু হওয়ার' সংগ্রাম না চলতে থাকে? যে মুহূর্তে ভিতরের এই সংগ্রাম শুরু হয় তখনই দ্বন্দ্ব আসে, আর এই দ্বন্দ্ব থেকে বেরোবার জন্য নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু যদি সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হও, তাহলে তোমরা যাই করবে সেটা হবে এক সম্পূর্ণ, এক অখণ্ড ক্রিয়া (integrated action), তখন অন্য কিছুর সাথে তার বিরোধিতা বা কোনো বিসংগতি নেই। এক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে বা জোর করে অন্য কোনো ইচ্ছাকে সরিয়ে বা দমন করে বিশেষ কোনো ইচ্ছাকে বলবৎ করতে হবে বা বিশেষ কোনো কাজ করতেই হবে এবং তাকে শেষ করতেই হবে, এই ব্যাপারটা নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সত্তার সেই অখণ্ডতা না আসে ততক্ষণ বিভিন্ন নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুশাসনের ব্যাপারটা চলতেই থাকে। কিন্তু এই নিয়মের নাগপাশ মানুষকে শেষ করে, কারণ এ কোনোদিন মানুষকে মুক্তির পথে নিয়ে যায় না।

সত্তার এই অখণ্ডতার জন্য কিন্তু কোনো নিয়মানুবর্তিতা বা অনুশাসনের প্রয়োজন নেই। অখণ্ডতার অর্থ হলো যখন আমি কিছু করি তা যদি মঙ্গলময় হয়, তার মধ্যে যদি এক সহজ সত্যতা ও সত্যকার সৌন্দর্য থাকে, এবং আমি যদি আমার তনু-মন-প্রাণকে নিঃশেষে উজাড় করে দিয়ে তা করি, তাহলে সেখানে কোনো

বিসংগতি থাকে না। এবং সেখানে আমি কোনো কিছুকে চোখ বন্ধ করে অনুসরণ করি না বা আমি নিজেকে কোনো কিছু করতে বাধ্য করি না। আমি যা করি তা যদি কল্যাণময় হয়, নিজেতেই নিজে সঠিক হয় অর্থাৎ কোনো হিন্দু-পরম্পরা বা কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি বা অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সেই কাজ সঠিক— এমন নয়, বরং সকল সময়ে, সকল পরিস্থিতিতে তা সঠিক হয়— তখন আমি এক অখণ্ড মানবসত্তা; এবং সে সত্তার কোনো নিয়মের, কোনো অনুশাসনের প্রয়োজন নেই। তাহলে, তোমাদের মধ্যে যাতে এক অখণ্ড প্রত্যয়, এক বিশ্বাস জন্মায়, যাতে তোমাদের যা ইচ্ছা হলো সেটাই করলে এমন নয়, বরং যা মূলত যথার্থ, শাশ্বতভাবেই সত্য, তোমরা তাই করো— এই পুরো ব্যাপারটায় সহায়তা করাই কি বিদ্যালয়ের প্রধান ভূমিকা নয়?

যদি তোমরা ভালোবাসো অর্থাৎ তোমাদের সকল কাজ, চিন্তা সবকিছু যদি ভালোবাসা থেকে আসে, তাহলে তোমাদের কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলা, অনুশাসনের প্রয়োজন হয় না। ভালোবাসার নিজস্ব একটা সৃষ্টিশীল উপলব্ধি থাকে, সেখানে কিছুর সাথে লড়াই বা তাকে প্রতিরোধের প্রশ্নটাই আসে না। বিশেষত যখন তোমরা ছোটো, তখন যদি গভীর নিরাপত্তা বোধ করো, সর্বক্ষেত্রে একটা স্বস্তি, একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করো, তাহলেই ধীরে ধীরে তোমাদের সমস্তটা দিয়ে কোনো কিছুকে ভালোবাসার ব্যাপারটা ঘটতে পারে। তাহলে ঐ গভীর নিরাপত্তাবোধ আনার জন্যই স্কুলে শিক্ষক ও ছাত্রদের— একে অপরের প্রতি গভীর বিশ্বাস থাকতে হবে। তা না হলে আমরা এখনকার মতোই একটা সর্বধ্বংসী সমাজ ও সভ্যতার জন্ম দেবো। আমার মনে হয় এই অখণ্ড ক্রিয়া— যাতে কোনো বিসংগতি নেই, অনেক বিপরীত ইচ্ছার দ্বন্দ্ব নেই, সেইজন্যই অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে নিজেকে বাধ্য করার প্রয়োজনও নেই— এই পুরো ব্যাপারটা

বুঝলে এক ভিন্ন সংস্কৃতি, এক ভিন্ন সভ্যতার নির্মাণ সম্ভব। কিন্তু যদি আমরা নিজেদের দমন করি, নিজেদের উপর জবরদস্তি করি, তাহলে যেসব কিছু দমিত হচ্ছে, তারা অন্যভাবে অন্য স্তরে নিজেদের প্রকাশ করতে থাকবে এবং বিভিন্ন বিনাশী ক্রিয়ার বা ঘটনার মিছিলও চলতেই থাকবে।

তাহলে অনুশাসনের এই প্রশ্নটাকে কিন্তু খুব ভালোভাবেই বুঝতে হবে। আমার কাছে এই অনুশাসন, এই শৃঙ্খলার ভার— এই পুরো ব্যাপারটাই জঘন্য, কদর্য ব্যাপার। এটা মোটেই কিছু সৃষ্টি করে না, এটা সব কিছুকে ধ্বংসের গ্রাসে পৌঁছে দেয়। এমন একটা উক্তির বিপজ্জনক দিকটা হলো যেন— নিয়মানুবর্তিতা, অনুশাসনের যখন দরকার নেই, তাহলে এবার যা খুশী করা যাক। কিন্তু ভেবে দেখো যে মানুষের হৃদয়ে সত্যকার প্রেম রয়েছে, সে কিন্তু যা খুশী তাই করতেই উদ্যত হয় না। জানো, এই শুদ্ধ প্রেমই সঠিক ক্রিয়ার জন্ম দেয়। ভালোবাসো, ভালোবাসাকে তার কাজ করে যেতে দাও, দেখবে পৃথিবীতে এক সুব্যবস্থা আসছে।

প্রশ্নকারী ঃ *আমরা গরীবদের ঘৃণা করি কেন?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ সত্যি কি ঘৃণা করো? আমি দোষ দিচ্ছি না, জিজ্ঞাসা করছি মাত্র। যদি সত্যি হয়, তাহলে কেন? নাকি মনে কল্পনা আসে তুমিও একদিন দরিদ্র হতে পারো, তাই নিজের সেই দুদর্শার চিন্তা থেকে তুমি শিউরে উঠে একে দূরে সরিয়ে দিতে চাও? নাকি দারিদ্রের এই ক্লেদময়তা, এই বিবর্ণতা, অপরিচ্ছন্নতা, এই অসুরক্ষিত অস্তিত্বকে তুমি অপছন্দ করো? তুমি— ঐ অশুচিতা, ঐ পঙ্কিলতা, ঐ নিষ্প্রভতাকে চাও না; আর বলো 'আমার এই হীন দরিদ্রের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই'। এটাই কি? কিন্তু এবার বলোতো পৃথিবীতে কে এই দারিদ্র, অব্যবস্থা, এই আবিলতা নিয়ে এসেছে? তুমি, তোমার

বাবা-মা, রাষ্ট্র— এক কথায় সমস্ত সমাজ মিলেই এটা সৃষ্টি করেছে, কারণ আমাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই। কারোর জন্য আমাদের এক বিন্দু ভালোবাসা নেই— না নিজেদের সন্তানদের জন্য, না প্রতিবেশীদের জন্য, না জীবিতদের জন্য, না মৃতদের জন্য। আমাদের কোনো কিছুর প্রতি ভালোবাসা নেই। ধর্ম, রাজনৈতিক নেতা বা বিভিন্ন সংস্কারকদের পক্ষে পৃথিবীর এই কদর্যতাকে এই পীড়াকে দূর করা সম্ভব নয়, তার কারণ তাঁরা কেবল এখানে সেখানে কিছু কিছু টুকরো টুকরো পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যদি তোমাদের হৃদয়ে প্রেম থাকতো, তার স্পর্শে এই কদর্যতা পলকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

তোমরা কি কোনো কিছুকে ভালোবাসো? ভালোবাসার অর্থ কী, সেটা কি জানো? যখন তোমরা সম্পূর্ণভাবে কোনো কিছুকে ভালোবাসো, তখন তুমি আর আবেগপ্রবণ থাকো না, সেখানে কোনো কিছু বাধ্যতামূলক করতেই হবে এমন থাকে না। এটাতে দৈহিক বা দিব্য প্রেম এই সব বিভাগও থাকে না। নিজের সত্তাকে উজাড় করে তোমরা কি কিছুকে বা কাউকে ভালোবাসো— সে তোমাদের বাবা-মা, বন্ধু বা একটা কুকুর বা গাছ হতে পারে? আমার মনে হয় বাসো না। সেই কারণেই তোমাদের সত্তার বিরাট পরিসরে শুধু কদর্যতা, ঘৃণা আর ঈর্ষার আবর্জনা। যার প্রাণে ভালোবাসা আছে, এইসব জিনিসকে ঠাঁই দেবার মতো জায়গা তার নেই। সত্যি কথা বলতে কি এইসব জিনিস নিয়েই আমাদের আলোচনা করা উচিত। আমাদের খোঁজা উচিত, যা মনকে এমন আবর্জনাপূর্ণ করেছে, যা আমাদের ভালোবাসতে বাধা দিচ্ছে, সেই জঞ্জালকে সরাবো কী করে। কারণ যখন আমরা ভালোবাসবো তখনই আমরা আনন্দিত ও মুক্ত হবো। রাজনীতিবিদ, সংস্কারক, কিছু আদর্শবাদী সাধু কিন্তু নতুন বিশ্বের জন্ম দিতে পারবেন না; একমাত্র যাঁদের হৃদয়ে প্রেম,

আনন্দ আর অফুরান প্রাণের সম্পদ আছে, তাঁদের পক্ষেই সেটা সম্ভব।

প্রশ্নকারী ঃ *আপনি সত্য, ভালোত্ব ও অখণ্ডতা নিয়ে কথা বলছেন। যার অর্থ অন্য দিকে মিথ্যা, খারাপ, খণ্ডিত অবস্থা রয়েছে। তাহলে কী করে একজন নিয়মানুবর্তিতা ছাড়া, অনুশাসন ছাড়া সৎ, ভালো ও সম্পূর্ণ হবে?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ অন্যভাবে বললে একজন ঈর্ষান্বিত মানুষ কীভাবে অনুশাসন ছাড়া তার ঈর্ষা থেকে মুক্তি লাভ করবেন। আমার মনে হয় প্রশ্নটাকে বোঝা সবচেয়ে জরুরী, কারণ উত্তরটা প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে, প্রশ্নের বাইরে কোথাও নেই।

ঈর্ষার অর্থ কি তুমি জানো? তুমি দেখতে সুন্দর, খুব ভালো পোশাকে সুসজ্জিত, তোমার সুন্দর মাথার টুপি অথবা শাড়ি আছে— এইসব দেখে আমিও তোমার মতো অমন সুসজ্জিত হতে চাই, কিন্তু কিছুতেই হয়ে ওঠে না, তাই আমি ঈর্ষান্বিত। আমি ঈর্ষান্বিত কারণ, তোমার যা আছে আমিও তাই চাই, আমি নিজে যা— তার থেকে আলাদা কিছু হতে চাই।

আমি ঈর্ষার আগুনে জ্বলি, কারণ, আমি তোমার মতো সুন্দর হতে চাই, তোমার যেমন ভালো পোশাক-আশাক আছে, চমৎকার বাড়ি আর উঁচু পদ রয়েছে, আমিও সেগুলো চাই। আমি নিজে যা— আমি তাতে সন্তুষ্ট নই, তাই আমি তোমার মতো হতে চাই। কিন্তু যদি আমি আমার অসন্তোষকে বুঝতে পারি, তার কারণ অনুধাবন করি, তাহলে কিন্তু আমি কখনই তোমার মতো হতে চাইবো না বা তোমার যা যা আছে তা চাইবো না। অন্যভাবে বলতে পারো একবার যদি ‘আমি কী’ সেটা বুঝতে শুরু করি, তাহলে আমি আর কোনোদিনই অন্যের সাথে নিজের তুলনা করবো না, অথবা

অন্যকে দেখে ঈর্ষাকাতর হবো না। আমি নিজেকে পরিবর্তন করে অন্যের মতো হতে চাই, সেখান থেকেই ঈর্ষা জন্ম নেয়। কিন্তু যদি আমি বলি 'আমি নিজে ঠিক যা, তাকে উপলব্ধি করতে চাই'— ঈর্ষার তখন আর অস্তিত্ব থাকে না; তখন কোনো নিয়মানুবর্তিতার বা অনুশাসনের প্রয়োজন হয় না। আমি কী— তার উপলব্ধি থেকেই আমাদের মধ্যে অখণ্ডতা আসে।

আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, আমাদের শিক্ষা সব কিছু একটা বিষয়ের উপর জোর দেয়, তা হলো আমাদের অবশ্যই অন্য কিছু হতে হবে। আমাদের দর্শন, আমাদের ধর্ম, আমাদের পবিত্র গ্রন্থগুলো সবাই একই কথা বলে। কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিছু হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটার মধ্যে ঈর্ষা জন্ম নেয়। যার অর্থই হলো আমি নিজে যা তাতে আমি অতৃপ্ত। এখন আমি 'নিজে কী' সেটা বুঝতে চাই; আমি জানতে চাই— কেন আমি নিজেকে সবসময় অন্যের সাথে তুলনা করি, কেন আমি অন্য কিছু হতে চাই। নিজেকে উপলব্ধির জন্য কোনো নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন হয় না। এই উপলব্ধির প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই সত্তায় সেই অখণ্ডতার আগমন হয়। অসংগতির সমাপ্তি আত্মবোধ নিয়ে আসে এবং এটা এমন এক ক্রিয়ার জন্ম দেয় যা অখণ্ড, যা পূর্ণতাময়।

প্রশ্নকারী ঃ *শক্তি কী?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ যান্ত্রিক শক্তি বলে একটা ব্যাপার আছে। ইঞ্জিনের মধ্যের কোনো দাহ্য পদার্থ, বাষ্প বা বিদ্যুৎ সে শক্তির উৎপাদক। গাছের মধ্যে একটা শক্তি রয়েছে। সেই শক্তি প্রাণরসকে বিভিন্ন জায়গায় সঞ্চারিত করে, পাতার জন্ম দেয় ইত্যাদি। একইভাবেই আমাদের মধ্যেও— সুস্পষ্টভাবে চিন্তা করার, ভালোবাসার, ঘৃণা করার, স্বেচ্ছাচারিতার, ঈশ্বর-গুরু-দেশের নামে অন্যকে ব্যবহার করার

শোষণ, করার শক্তি রয়েছে। এগুলো হলো শক্তির বিভিন্ন রূপ।

এখন বিদ্যুৎ শক্তি, আলোক শক্তি, আনবিক শক্তি— এই সবই ভালো, তাই নয় কি? অন্যদিকে আগ্রাসন, অত্যাচার বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঐ সকল শক্তিকে ব্যবহার করে যে মন— তার শক্তি যে কোনো স্তরে, যে কোনো পরিস্থিতিতে অশুভ। সমাজের প্রধান বা চার্চের বা কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধান— যাঁর অন্য সবাইকে নিয়ন্ত্রণের শক্তি রয়েছে, সে শক্তি অকল্যাণকর; তিনি অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, গঠন করছেন, পথ দেখাচ্ছেন, অথচ তিনি নিজেই জানেন না তিনি কোথায় যাচ্ছেন। এগুলো কিন্তু আমি বড়ো বড়ো সংগঠনগুলোর সম্বন্ধেই শুধু বলছি না, পৃথিবী ব্যাপী সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। যে মুহূর্তে একজন মানুষের মধ্যে স্বচ্ছতা আসে, যখন তাঁর মধ্যে সকল সংশয়ের অবসান ঘটে, তখন তিনি আর কোনো কিছুর নেতৃত্ব দেন না, তখন কর্তৃত্বের কারণের যে শক্তি তাও থাকে না।

এখন এই প্রশ্নটা বোঝা সবচেয়ে জরুরী— কেন মানুষের মন অন্যের উপর নিজের অধিকার কায়েম করার জন্য শক্তি চায়? পিতা-মাতা বাচ্চার উপর, স্ত্রী স্বামীর উপর বা স্বামী স্ত্রীর উপর কেন অধিকার চায়? পরিবারের ক্ষুদ্র পরিসর থেকে এই অশ্রেয় শক্তি প্রসারিত হতে হতে স্বেচ্ছাচারী প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতা বা ধর্মীয় প্রবক্তাদের অত্যাচারের রূপ নেয়। এখন প্রশ্ন— এই ক্ষমতার ক্ষুধা, অন্যকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার ও অন্যকে প্রভাবিত করার ইচ্ছা; কোনো দেশ, দল, গুরু, সাধু বা নিজের জন্য ক্ষমতা অর্জনের লালসা ছাড়া কি বাঁচা সম্ভব? শক্তির এইসব রূপগুলো বিনাশকারক, এগুলো মানুষের দুর্দশা নিয়ে আসে। অন্যদিকে সত্যকার দয়া, সহানুভূতিসম্পন্নতা, ভালোবাসা এক অদ্ভুত জিনিস, এদের এক সময়াতীত প্রভাব রয়েছে। প্রেম নিজেই সময়ের অতীত; তাই যেখানে প্রেম থাকে, সেখানে

এই অশ্রেয় শক্তির চিহ্নটুকু থাকে না।

প্রশ্নকারী ঃ *আমরা কেন খ্যাতি খুঁজি?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ কোনোদিন কি এটা নিয়ে ভেবেছো? আমরা প্রখ্যাত লেখক, কবি, চিত্রকর, রাজনীতিবিদ, গায়ক বা যা যা হতে পারে, হতে চাই। কেন? তার একটাই কারণ— যেটা করছি সেটার সাথে প্রাণের নিবিড় সম্বন্ধই নেই। যদি সত্যিই গান গাইতে বা ছবি আঁকতে, বা কবিতা লিখতে ভালোবাসতে— লক্ষ্য করো আমি কিন্তু বলছি সত্যিই ভালোবাসতে, তাহলে তুমি খ্যাতির নুড়ি খুঁজে বেড়াতে না। বিখ্যাত হবার ক্ষিদে তুচ্ছ, স্থূল ব্যাপার, এর কোনো অর্থ নেই। যেহেতু আমরা যেটা করছি সেটা করতে ভালোবাসি না, তাই আমরা আমাদের ভিতরটা খ্যাতি দিয়ে ভর্তি করতে চাই। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ঘুণ ধরে গেছে। এটা আমাদের— যা করছি তাকে ভালোবাসতে শেখায় না, সফলতাকে ভালোবাসতে শেখায়। কাজের চেয়ে— ওটা থেকে আসতে পারে যে ফলটা— সেটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে।

একটা জিনিস জেনো— নিজের প্রতিভার দীপ্তি সহজাত বিনয়ের আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকা, নামহীন, পরিচয়হীন একজন সাধারণ মানুষ হওয়া, নিজেকে জাহির না করা, যেটা করছো সেটাকে ভালোবেসে করা খুবই ভালো। নাম ছাড়া করুণা, দয়া সত্যি ভালো জিনিস। এটা তোমাকে খ্যাতি দেয় না, সংবাদপত্রের পাতায় তোমার ছবির ছাপ পড়ে না। রাজনৈতিক নেতারাও তোমার দরজায় কড়া নাড়েন না। এতে তুমি কেবল একজন সৃষ্টিশীল মানুষ, যে খ্যাতি অখ্যাতির সব ঢেউ অতিক্রম করে নামহীন, পরিচয়হীনভাবে সত্যকার বাঁচে। এর মধ্যে অপরিমেয় বিত্ত, অসামান্য সৌন্দর্য রয়েছে।

১৫

সহযোগিতা

আমরা জীবনের কতো দিক নিয়ে আলোচনা করছি, কতো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছি— নয় কি ? কিন্তু আমি ভাবছি সমস্যা জিনিসটা কী সেটা কি আমরা জানি। যে কোনো সমস্যাকে মনের মধ্যে তার মূল চালিয়ে দিতে দিলে সেই সমস্যার সমাধান সত্যি কঠিন হয়ে ওঠে। মন প্রথমে সমস্যা তৈরী করে, তারপর নিজেই মাটি হয়ে যায়, যে মাটিতে সেই সমস্যা তার মূল চালাতে থাকে। এরপর একবার যদি এই মূল পাকাপোক্তভাবে একটু গভীরে চলে যায়, তাহলে তার মূলোৎপাটন খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই প্রথম প্রয়োজনীয় ব্যাপার হলো মনকে নিজেই সমস্যাটা সরাসরি দেখতে হবে, একে বেড়ে উঠবার মাটি দেওয়া যাবে না।

এখন পৃথিবীর মূল সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো সহযোগিতার (co-operation) সমস্যা। সহযোগিতার অর্থ কী ? সহযোগিতা হলো একসাথে কাজ করা, একসাথে কোনো কিছু নির্মাণ করা, একসাথে অনুভব করা, যাতে আমরা একসাথে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারি তারজন্য কোথাও একটা মিল থাকা। কিন্তু মানুষ সহজে, আনন্দের সাথে মিলিত হয়ে কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। তারা কোনো লাভ, ভয়, ধমক বা শাস্তি— এই সবের কারণে একত্রিত হয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়। এটাই সারা পৃথিবীতে কাজের

চিত্র। কোনো অত্যাচারী প্রশাসন তোমাদের নির্মমভাবে একসাথে কাজ করতে বাধ্য করে। যদি তুমি তা না করো তোমাকে লোপাট করে দেওয়া হয় অথবা রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য বানানো জেলে তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এগুলোই সেই তথাকথিত সভ্য রাষ্ট্র। একটা ধারণা 'আমার দেশ' বা কোনো আদর্শ— যেগুলো আবার খুব চতুরতার সাথে খাড়া করা হয়েছে, সেগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে, যাতে তোমরা তা মেনে নাও। এরই দোহাই দিয়ে তোমাদের একসাথে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। অথবা কোনো এক অলীক স্বপ্নরাষ্ট্রের নকশা কারোর মাথায় এসেছে, তারই সেই যোজনা অনুযায়ী তোমরা একসাথে কাজ করে যাও।

সুতরাং একটা যোজনা, একটা আদর্শ, কর্তৃত্বের চাপ মানুষকে প্ররোচিত করে, বাধ্য করে একসাথে কাজ করতে। একেই আমরা সাধারণত সহযোগিতা বলে থাকি। কিন্তু এর সাথে সবসময় জড়িত থাকে কোনো লাভের প্রতিশ্রুতি অথবা ক্ষতির আশঙ্কা, যার অর্থ হলো, এই সহযোগিতার যবনিকার পিছনেই থাকে ভয়। তোমরা দেশ, রাজা, দল, ঈশ্বর, গুরু, শান্তি অথবা এই সংস্কার বা ঐ সংস্কার এমন কোনো-না-কোনোকিছুর জন্য নিরন্তর কাজ করে চলেছো। কোনো একটা বিশেষ ফললাভের জন্য একসাথে কাজ করাই হলো তোমাদের কাছে সহযোগিতা। ধরো তোমাদের সামনে একটা আদর্শ আছে— একটা সম্পূর্ণ স্কুল বানাতে হবে বা অন্য কিছুও হতে পারে, সেইজন্য তোমরা কাজ করছো। তোমরা বলো এই লক্ষ্যে পৌঁছোতে গেলে সহযোগিতা প্রয়োজন। এখানেও কর্তৃত্বের একটা ভাবনা রয়ে যায়। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম— যেন কেউ একজন সবসময় জানেন কোনটা করা সঠিক, আর তোমরা বলো 'আমাদের ঐ কাজটা করার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে হবে'।

আমি কিন্তু একে আদৌ সহযোগিতা বলি না। এটা লোভ, ভয়,

বাধ্যতার একটা রূপ, এর মধ্যে সহযোগিতার কোনো ব্যাপার নেই। কারণ এর পিছনেই চাপা গলায় কেউ শোনাচ্ছে— যদি সহযোগিতা না করো রাষ্ট্র বা প্রশাসন তোমায় স্বীকৃতি দেবে না, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে, রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে জেলে যেতে হতে পারে বা তোমার দেশ যুদ্ধে হেরে যাবে, অথবা স্বর্গের দরজা তোমার জন্য চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। সবসময় যবনিকার পিছন থেকে আসছে কোনো প্ররোচনা। যেখানে প্ররোচনা বা প্রলোভন থাকে— সেখানের সহযোগিতা কোনো সহযোগিতাই নয়।

যখন আমি এবং তুমি কেবল একসাথে কোনো বিশেষ কাজ করবো বলে স্বীকৃত হয়েছি, তখনও আমি তাকে সহযোগিতা বলবো না। এই ধরণের মতৈক্যে পৌঁছোনোর মধ্যে সেই বিশেষ জিনিসটা করার ব্যাপারটাই মূল, একসাথে কাজ করার ব্যাপারটার কোনো জায়গা থাকে না। ধরো তুমি এবং আমি মিলে ঠিক করলাম একটা সেতু বানাবো বা রাস্তা তৈরী করবো বা একসাথে বেশ কিছু গাছের চারা রোপন করবো। এই ধরণের সমঝোতায় মতানৈক্যের ভয় থাকে, আবার এমনও ভয় থাকে যে আমি হয়তো আমার ভাগটা ঠিকমতো করলাম না, তোমাকে দিয়েই কৌশলে পুরোটা করিয়ে নিতে চাইলাম।

তাই কোনো প্রলোভন বা প্ররোচনা বা সমঝোতার জন্য যখন একত্রিত হওয়া থাকে, কাজ করা থাকে— তখন সহযোগিতা থাকে না। কারণ এইসব প্রচেষ্টার পিছনে কোনো কিছু লাভের বা কিছু এড়ানো যাবে এই ব্যাপারটা থাকে।

আমার কাছে এই সহযোগিতা ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। একসাথে থাকা, সাথে সাথে থেকে কাজ করার আনন্দই হলো সহযোগিতা, এর মধ্যে কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ কোনো কাজ করতেই হবে তেমন ব্যাপার নেই। বুঝতে পারছো ? ছোটো বাচ্চাদের দেখবে—

তাদের মধ্যে একসাথে থাকা, একসাথে কাজ করার একটা ভাবনা থাকে। লক্ষ্য করে দেখো। তারা যে কোনো কাজেই সহযোগিতা করে। সেখানে মতের মিল অমিলের কোনো ব্যাপারই নেই, কিছু লাভ হবে বা ক্ষতি হবে তেমন কোনো ব্যাপারই নেই, সহজেই তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ঐ একসাথে থাকা, একসাথে করার আনন্দের জন্যই তারা স্বভাবগতভাবেই সহকারিতার দুহাত এগিয়ে দেয়। কিন্তু বয়স্করা এই সহজতাকে, এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহকে নষ্ট করে দেন। তাঁরা বলেন 'তুমি যদি এটা করো তাহলে আমি তোমাকে ওটা দেবো, যদি তুমি না করো, তাহলে সিনেমা কিন্তু দেখতে নিয়ে যাবো না',— এইভাবেই তাঁরা সেই সহজ সাহায্যশীলতা, সহযোগিতার প্রবাহে বিষাক্ত তরল যোগ করতে থাকেন।

সুতরাং, আমরা একসাথে কোনো বিশেষ কাজ শেষ করবো, এই সম্মতি থেকে সত্যকার সহযোগিতা আসে না। এটা একত্ববোধ থেকে আসে; এর মধ্যে ব্যক্তির নিজের কোনো আদর্শ বা মতামতকে রূপ দিতে হবে, তার প্রতিষ্ঠা করতে হবে— এমন আগ্রহ থাকে না।

এমন সহযোগিতার ব্যাপারটা বুঝতে পারলে কখন সহযোগিতা করা যাবে না তাও তোমরা বুঝতে পারবে। সেটাও কিন্তু সমানভাবে জরুরী। আমাদের মধ্যে সহযোগিতার সেই ভাবনাকে জাগাতে হবে, সেখানে কোনো পরিকল্পনা বা মতৈক্যের জন্যই আমরা একসাথে কাঁধ মিলিয়েছি এমন নয়। সেখানে একাত্মতার বোধ, একসাথে চলা, করার অনাবিল আনন্দ— যার মধ্যে কোনো পুরস্কৃত হওয়ার বা ক্ষতির চিন্তা নেই— সেই ভাবনা থেকে সহযোগের হাতেরা মিলেছে, সেটাই মূল ব্যাপার। আবার অন্যদিকে এও জানব কখন সহযোগিতা করবো না। কারণ আমরা যদি তা না জানি, তাহলে হয়তো আমরা কোনো বোধহীন ব্যক্তিকে বা কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যার অনেক চমৎকার সব যোজনা আছে বা হিটলার বা তারই মতো কোনো

অত্যাচারী নেতাকে তাদের কাজে সাহায্য করবো। আসলে যখন সত্য সহযোগিতার আনন্দের স্রোতের সাথে পরিচিত হবে, তখন কোন সময় সহযোগিতা করা যাবে না সে বোধ আপনিই চলে আসবে।

এটা নিয়ে আলোচনা করা খুবই জরুরী। কারণ যখনই তোমাদের বলা হচ্ছে এক সাথে কাজ করার কথা, তখুনি তোমাদের মনে প্রশ্ন আসছে 'কী জন্য করবো? একসাথে কী কাজ করবো'? অন্যভাবে বললে— যেটা করতে হবে সেই কাজটাই জরুরী হয়ে দেখা দিচ্ছে; কিন্তু একসাথে থাকা এবং করার ভাবটা জরুরী নয়। কিন্তু যখন কোনো পরিকল্পনা, কোনো কাল্পনিক আদর্শের জন্যই একত্রে কিছু করা হয়, যখন সেটাকেই সবচেয়ে উপরে স্থান দেওয়া হয় তখন সত্য সহযোগিতা থাকে না। তখন একটা আদর্শ আমাদের একত্রিত করছে। এর বিপদটা হলো, যখন একটা আদর্শ আমাদের একত্রিত করে, তখন যেকোনো সময় অন্য আদর্শ এসে আমাদের পৃথক করেও দিতে পারে। সুতরাং যেটা জরুরী তা হলো সহযোগিতার ভাবকে জাগানো। যদি বয়স্করা এই ভাব নষ্ট না করেন তাহলে দেখা যায় শিশুদের মধ্যে সহজাতভাবেই এর ভাণ্ডার সদা পূর্ণ থাকে।

প্রশ্নকারী ঃ *যেসব পরিস্থিতিগুলো বা কারণগুলো মানসিক দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করে তাদের এড়িয়ে না গেলে কী করে আমরা মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে পারি?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ তোমাকে ঐ দুশ্চিন্তাগুলোর মুখোমুখি হতে হবে, নয় কি? সাধারণত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তোমরা তাদের থেকে পালিয়ে যাও। যে পথে পালাও সে পথগুলো হলো— হয় মন্দিরে বা সিনেমায় যাও, কোনো একটা পত্রিকা ওলটাতে থাকো, রেডিও চালিয়ে দাও অথবা অন্য কোনোভাবে মনকে সরিয়ে রাখো। এই পলায়ন কোনোদিন সমস্যার সমাধান করে না, কারণ যখন ফিরে

আসো, তখন সেই সমস্যা ঠিক একই জায়গায় থেকে যায়। তবে কেন শুরুতেই এর মুখোমুখি হচ্ছো না?

এখন প্রশ্ন হলো দুশ্চিন্তা কী? তুমি ভয় পাও পরীক্ষায় পাশ করবে, না করবে না এবং তুমি ভাবছো তুমি হয়তো পারবে না। চলে অতিরিক্ত পরিশ্রম, রাত্রির-পর-রাত্রি জাগরণ। যদি পাশ না করতে পারো, তোমার বাবা-মা তো বিরক্ত হবেনই, এরসাথে তুমিও বলতে পারবে না ‘আমি এটা পেরেছি। আমি এই পরীক্ষাটায় পাশ করেছি’। এই কারণেই তুমি পরীক্ষার দিন পর্যন্ত, ফলাফল বেরোবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত চিন্তা করেই যাও। এখন বলোতো এই পরিস্থিতি থেকে কি পালাতে পারবে? পারবে না, তাই তো? তোমাকে মুখোমুখি হতেই হবে। কিন্তু চিন্তার কি আছে? তুমি পড়েছো, যতোটা সম্ভব করেছো, এবারে হয় পাশ করবে, না হয় করবে না। যতো দুশ্চিন্তা করবে ততো ভয় বাড়বে, ততো স্নায়বিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে, চিন্তা করার শক্তি ক্ষীণ হয়ে যাবে, আর যখন পরীক্ষার দিন তোমাকে লিখতে হবে তখন মাথায় কিছুই আসবে না, তুমি কেবলই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকবে। জানোতো আমার সাথে এমনই হয়েছিল।

যখন মন একটা সমস্যা নিয়ে বার বার ভাবে, অবিরাম সেটার ব্যাপারেই লেগে থাকে তখন আমরা তাকে দুশ্চিন্তা বলি, নয় কি? এখন প্রশ্ন হলো এর থেকে মুক্ত হওয়া যাবে কী করে? প্রথম ব্যাপার হলো এই সমস্যাটাকে সানন্দে মূল চালিয়ে দেবার জন্য জমি মন যেন না দেয়।

তোমরা কি জানো মন কী? বড়ো বড়ো দার্শনিকেরা বছরের পর বছর এর প্রকৃতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কাটিয়ে দিয়েছেন, হাজার হাজার বই এর সম্পর্কে লেখা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় কেউ যদি সত্যিই তার পূর্ণ মনোযোগ এটাতে দেয় তবে মন

কী— তা বোঝা খুব সহজ। কোনোদিন নিজের মনকে লক্ষ্য করেছো? এতোদিন পর্যন্ত যা কিছু পড়েছো, তোমাদের সব ছোটো ছোটো অভিজ্ঞতাগুলো, তোমাদের বাবা-মা, তোমাদের শিক্ষকেরা যা বলেছেন, অথবা তোমাদের চারপাশের পৃথিবীতে যা যা দেখেছো— এইসব কিছু নিয়ে হলো তোমার মন। মনই পর্যবেক্ষণ করে, পৃথক করে, সদ্‌গুণের অনুশীলন করে, কোনো মতামতকে প্রকাশ করে, মনই চায়, মনই ভয় পায়। তুমি যে উপরে-উপরে একে দেখছো এ শুধু তাই নয়, এর অনেক নীচের স্তরে গভীর অবচেতনে— জাতিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য, আবেগ, সংঘর্ষ লুকিয়ে রয়েছে। এটাই মন, একে চেতনা বলা হয়।

মন সবসময় কোনো-না-কোনো কাজে ব্যাপৃত থাকতে চায়। এটা অনেকটা, যেমন কোনো মা তার বাচ্চার চিন্তা করতেই থাকেন, বাড়ীর গৃহিনীর রান্নাঘরের চিন্তা চলতেই থাকে, রাজনৈতিক নেতা সংসদভবনে তাঁর পদ, তাঁর জনপ্রিয়তা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, ঠিক তেমনই। কিন্তু যে মন এমন সদাব্যস্ত, সে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে না। এটাকে কি দেখতে পাচ্ছো? একমাত্র অব্যস্ত মনই সতেজ, সে-ই কোনো সমস্যাকে বুঝতে পারে।

নিজের মনকে লক্ষ্য করো। দেখো কেমন অস্থির হয়ে আছে। সবসময় কিছুকে নিয়ে চঞ্চল। কে কালকে তোমায় কী বলেছিল, কোনো কিছু যা তুমি এখুনি শিখছো অথবা কাল তুমি কী করবে, এমন হরেকরকম ব্যাপার নিয়ে তার ব্যস্ততা। মন কখনই শান্ত নয়। আমি কিন্তু মনের স্থবিরতা বা কোনো মানসিক শূন্য ভাবের কথা বলছি না। মন মহান থেকে মহানতম, তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতম কিছু নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে পারে। কিন্তু যে মন এমন ব্যস্ত থাকে সে একটা অতি সাধারণ তুচ্ছ মন। এর কোনো সমস্যা সমাধানের সামর্থ্য নেই, এ ঐসব নিয়ে কেবল ব্যস্ত থাকাতেই অভ্যস্ত। সমস্যাটা যত

বড়োই হোক না কেন, আমাদের মন তা নিয়ে থেকে তাকে একটা তুচ্ছ কিছুতে পরিণত করে। যে মন অব্যস্ত, সে মন প্রচুর প্রাণশক্তিতে পূর্ণ, সে-ই সমস্যাটাকে বুঝতেও পারে এবং তার সমাধানটাও খুঁজে পায়।

কোনো ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত নয়— এমন মন লাভ করাও খুব কঠিন। যদি কখনো কোনো নদীর পাশে বা তোমার ঘরে শান্ত হয়ে বসো, তখন যদি নিজেকে লক্ষ্য করো, দেখবে যে ছোট্ট পরিসরটার ব্যাপারে তুমি সচেতন— যাকে মন বলো, সেটা কতো অসংখ্য চিন্তায় ভর্তি। কী দ্রুত সেইসব চিন্তা একটার পর একটা আসছে। যতক্ষণ মন ভর্তি, অস্থির, সে মন কোনো গৃহবধূর হতে পারে বা কোনো বৈজ্ঞানিকেরও হতে পারে— সেটা একটা সাধারণ মন। সে মন যেকোনো সমস্যাই হোক না কেন তার সমাধান করতে পারবে না। কিন্তু একটা অব্যস্ত মন, যার অবকাশ আছে, সে সমস্যার সমাধান সূত্র খুঁজে বার করে। তার কারণ সে সমস্যাটাকে নতুন চোখে দেখে, তাকে পুরোনো স্মৃতির বা পরম্পরার পর্দার ভিতর দিয়ে দেখে না।

প্রশ্নকারী ঃ *কী করে আমরা নিজেদের জানতে পারবো?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ তুমি তোমার মুখশ্রীর সাথে পরিচিত, তার কারণ তুমি বার বার তাকে আয়নায় প্রতিবিম্বিত অবস্থায় দেখেছো। আর একটা আয়না আছে, সে আয়নায় তুমি তোমার সমস্তটাকে দেখতে পাবে— তোমার মুখ নয়, তুমি যা ভাবো, তোমার সব অনুভূতি, তোমার উদ্দেশ্য, তোমার অতৃপ্ত ইচ্ছা, তোমার আবেগ, তোমার ভয় সমস্ত কিছু। সেই আয়নাটা হলো সম্পর্কের আয়না। সম্পর্ক মানে সব কিছুর সাথে তোমার সম্পর্ক ঃ তোমার বাবা-মায়ের সাথে তোমার সম্পর্ক, তোমার এবং তোমার শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক, তোমার সাথে নদী, গাছেদের, পৃথিবীর সম্পর্ক, তোমার সাথে তোমার চিন্তাগুলোর

সম্পর্ক। এই সম্পর্কের আয়নায় তুমি নিজেকে দেখতে পাবে। তবে যে রূপ তুমি কল্পনা করো তা নয়, তুমি নিজে ঠিক যা তাই দেখতে পাবে। আমি যখন একটা সাধারণ আয়নার নিজেকে দেখি, তখন মনে হয় যদি এটা আমাকে একটু সুন্দর করে দেখাতো, কিন্তু তা সে করে না। সে, আমি যা তাই দেখায়। আমিও নিজেকে— আমি সুন্দর এই বলে ঠকাতে পারি না। ঠিক তেমনই অন্যের সাথে আমার সম্পর্কের আয়নায় আমি যা— তাই প্রতিবিম্বিত হয়। ধরো আমি লক্ষ্য করতে পারি আমি কেমনভাবে অন্যের সাথে কথা বলি ঃ যাঁদের থেকে আমার কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে তাঁদের সাথে কতো নম্রভাবে বিনীতভাবে আর যাঁদের কাছ থেকে সে সম্ভাবনা নেই সেখানে কেমন রুক্ষভাবে, রূঢ়ভাবে কথা বলি। যাঁর প্রতি আমার ভয় রয়েছে, তাঁর ব্যাপারে আমি কতো মনোযোগী, তার কতো খেয়াল রাখি; যখন গণ্যমান্য কেউ আসে আমি উঠে দাঁড়াই, যখন আমার কাজের লোকটি আমার ঘরে ঢোকেন, আমি যেন তাঁকে দেখতেই পাই না। এইভাবেই সম্পর্কের আরশিতে নিজেকে দেখে— লোককে আমি কী মিথ্যা সম্মান জানাই তা খুঁজে পাই, নয় কি? আবার গাছেদের সাথে, পাখীদের সাথে, বইয়ের সাথে, আমার ধারণাগুলোর সাথে আমার সম্পর্কের মধ্যে দিয়েও আমি নিজেকে আবিষ্কার করি।

তোমার হয়তো পৃথিবীর সব বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী আছে, কিন্তু যদি তুমি নিজেকে না জানো তাহলে তুমি হবে সবচেয়ে বুদ্ধিহীন মূর্খ। নিজেকে জানা হচ্ছে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য, তা না হলে কতকগুলো তথ্য জানা, পরীক্ষা পাশের জন্য সেগুলো লিখতে থাকা— নিজের জীবনকে, নিজের অস্তিত্বকে না বোঝার পথে নিয়ে যায়। তুমি হয়তো গীতা, বাইবেল, কোরাণ, উপনিষদ থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিতে পারো, কিন্তু আত্মবোধ ছাড়া ওগুলো তোতাপাখীর

একই কথা বারবার বলে যাবার মতো হয়ে যায়। অপরপক্ষে যেইক্ষণে তুমি আত্মোপলব্ধির পথে চলা শুরু করো এবং সে পদক্ষেপ যতো ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তখনি অনুভব করবে এক অদ্ভুত সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ার ধারা তোমার মধ্যে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। তুমি আসলে যেরকম, মানে লোভী, ঝগড়ুটে, রাগী, পরশ্রীকাতর, বুদ্ধিহীন এগুলোকে হঠাৎ দেখতে পাওয়া যেন একটা আবিষ্কার। যদি আমরা আমাদের বাস্তবিক রূপকে কোনো পরিবর্তনের চেষ্টা না করে শুধু দেখি, সেটাই একটা অদ্ভুত ব্যাপারের উদ্ঘাটন করে। সেখান থেকে তুমি আরো আরো গভীরে যেতে পারো, এর কারণ আত্মোপলব্ধির কোনো শেষ নেই।

এই আত্মবোধের মধ্যে দিয়েই তুমি ঈশ্বর কী, সত্য কী, সময়াতীত অবস্থা কী— এইসব কিছু আবিষ্কার করতে আরম্ভ করো। তোমাদের শিক্ষক, তাঁর শিক্ষকের থেকে যা যা শিখেছেন তা তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারেন, তোমরাও পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারো, ডিগ্রী পেতে পারো, আরো যা যা পাওয়ার সব জড়ো করতে পারো; কিন্তু যেমন করে পরিষ্কার আয়নায় নিজের মুখটিকে দেখে তুমি চেনো, তেমনই সুস্পষ্টভাবে যদি নিজেকে না জানতে পারো, তাহলে অতো শিক্ষা, অতো ডিগ্রী, অতো বিভিন্ন কিছু সঞ্চয় একেবারে মূল্যহীন হয়ে যায়। যে ব্যক্তি শিক্ষিত অথচ নিজেকে জানেন না, তিনি আসলে বুদ্ধিহীন। তিনি জানেনেই না— চিন্তা কী, জীবন কী। তাই শিক্ষকদের শিক্ষিত হতে হবে। আমি সত্য অর্থে শিক্ষিত হওয়ার কথা বলছি। যার অর্থ হলো তাঁদের নিজেদের মনের এবং হৃদয়ের ক্রিয়াকে জানতে হবে। সম্পর্কের আয়নায় তিনি ঠিক যেরকম তেমনভাবে নিজেকে দেখতে হবে। আত্মোপলব্ধি থেকে প্রজ্ঞার জাগরণ হয়। এই আত্মোপলব্ধির মধ্যেই অখিল বিশ্ব বিরাজমান। মানবীয় সকল সমস্যাকে, সকল সংগ্রামকে এ আত্মস্থ করতে পারে।

প্রশ্নকারী ঃ *যিনি প্রেরণা দান করেন এমন কেউ ছাড়া কি আমরা নিজেদের জানতে পারবো ?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ প্রশ্নটা হলো ঃ নিজেকে জানতে হলে তোমাদের কি একজন প্রেরণাদাতা প্রয়োজন, যিনি তোমাদের মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা জাগাবেন, তোমাদের পিছন থেকে আগে এগোবার জন্য ধাক্কা দিতে থাকবেন, তাইতো ? প্রশ্নটা ভালো করে শোনো, ওর ভিতর থেকেই উত্তরটা আবিষ্কার করতে পারবে। যেকোনো ক্ষেত্রে প্রশ্নটাকে যদি ভালো করে শোনো, তাকে বুঝতে পারো দেখবে অর্দ্ধেক সমাধান ওখানেই হয়ে গেছে। কিন্তু যদি তোমার মন উত্তর খোঁজার ব্যাপারে ব্যগ্র থাকে তাহলে প্রশ্নটাকে সম্যকরূপে বুঝতে পারবে না।

প্রশ্নটা শোনো ঃ আত্মোপলব্ধির জন্য কি প্রেরণাদাতার প্রয়োজন নেই, যিনি আমাদের ওটা লাভ করার জন্য উদ্দীপিত করবেন, প্রেরণা দেবেন ?

এখন কথাটা হলো এরকম যদি তোমাদের একজন গুরু বা প্রেরণাদাতা থাকেন, যিনি তোমাদের উদ্বুদ্ধ করবেন, যিনি বলবেন এই তো সঠিক পথে সঠিকভাবে এগোচ্ছো— এর অর্থ তোমরা অন্যের উপর নির্ভর করছো। স্বাভাবিকভাবেই কোনোদিন সেই মানুষটা যদি সরে যায় তোমরা সব কিছুই হারিয়ে ফেলবে, তোমরা পথ হারাবে। যেই মুহূর্তে অনুপ্রেরণার জন্য তোমরা কোনো আদর্শ বা কোনো ব্যক্তির মুখাপেক্ষী হবে, সেখানে ভয়ও থাকবে। এটা কোনো সত্য অনুপ্রাণনা নয়। অন্যদিকে যদি লক্ষ্য করো কোনো মৃতদেহকে কিছু লোক বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, কোথাও কিছু লোক ঝগড়া করছে— ওগুলো কি তোমায় ভাবায় না ? যখন তোমরা দেখো, কেউ অসম্ভব উচ্চাকাঙ্ক্ষী অথবা রাজ্যপাল এলে কেমন করে তোমরা তাঁর পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ো— এগুলো কি তোমাদের ভাবায় না ? তাই ঝরা পাতায়, কোনো পাখীর মৃত শরীর পড়ে থাকাতে

অথবা মানুষের নিজের ব্যবহারে— সব জায়গায় অনুপ্রেরণা রয়েছে। যদি সব কিছুকে লক্ষ্য করতে শুরু করো, দেখবে তুমি অবিরাম শিখে চলেছো। কিন্তু শেখার জন্য যদি কোনো বিশেষ ব্যক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকো, তাহলে সেই ব্যক্তি তোমাদের দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে। এইজন্যই কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে অনুসরণ করা উচিত নয়, কোনো একটা বিশেষ শিক্ষক থাকা উচিত নয়। নদী, ফুল, গাছ, কোনো স্ত্রীলোক যিনি একটি ভারী বোঝা বইছেন, তোমাদের পরিবারের সদস্যদের থেকে, তোমাদের নিজেদের চিন্তা থেকে শেখাটাই দরকার। এই শিক্ষাটা এমন এক শিক্ষা যা কেউ তোমাদের দিতে পারবে না। এটা কোনো মানুষ নিজেকেই নিজে দিতে পারে এবং এখানেই তার সৌন্দর্য। এটা নিরন্তর নিরীক্ষণ দাবী করে, একটা অনুসন্ধিৎসু মন দাবী করে। সে মন যেন সদা জাগ্রত থাকে। তোমাদের— দেখার মধ্যে দিয়ে, সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, আনন্দের ও অশ্রুর মধ্যে দিয়ে শিখে চলতে হবে।

প্রশ্নকারী ঃ *একজনের মধ্যে এতো অসংগতি, এতো স্ববিরোধিতা থাকলে পূর্ণতা নিয়ে থাকা এবং কাজ করা কী করে সম্ভব?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ তুমি কি জানো স্ববিরোধিতা কী? ধরো আমি আমার জীবনে বিশেষ কিছু একটা করতে চাই, আবার একই সাথে আমি আমার বাবা-মাকেও সন্তুষ্ট করতে চাই, যাঁরা কিন্তু আমি অন্য কিছু করি সেটা চান। তখন সেখানে একটা বিরোধিতা দেখা দেয়। এখন প্রশ্ন হলো কী করে আমি এর সমাধান করবো? যদি আমি আমার মধ্যের এই বিরোধিতারই অবসান ঘটাতে না পারি, তাহলে আমার অস্তিত্বে, আমার কর্মে, একতা বা সমগ্রতা আসবে না। তাই প্রথম কথাই হলো এই স্ববিরোধিতা থেকে মুক্ত হতে হবে।

ধরো তুমি চিত্রকলা শিখতে চাও, তোমার জীবনের আনন্দ তুমি

সেখানে খুঁজে পাও। এখন তোমার বাবা বললেন— আইনজীবী হতে হবে, অথবা ব্যবসায়ী হতে হবে, নয়তো সম্পর্ক ছিন্ন হবে, আর তোমার এইসব করার খরচাও তিনি বহন করবেন না। তখন তোমার মধ্যে বিরোধিতা শুরু হলো, তাই নয় কি? কেমনভাবে তোমার ভিতরে যে অসংগতি দেখা দিল, যে বিরোধ শুরু হলো, তাকে সরাবে; কেমন করেই-বা এর সংঘর্ষ, এর পীড়া থেকে মুক্ত হবে? যতক্ষণ তোমার মধ্যে এই সংঘাত চলতে থাকবে, ততক্ষণ তুমি স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে পারবে না। তাই প্রথমেই যা প্রয়োজন তা হলো এই বিসংগতি দূর করা। এক্ষেত্রে হয় তোমাকে এটা করতে হবে, নয়তো অন্যটা করতে হবে। কোনটা করবে? বাবার কথা মেনে নেবে? যদি তেমন হয় তুমি তোমার আনন্দকে সরিয়ে রাখছো, তুমি এমন একটা কিছুর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলছো যা তুমি ভালোই বাসো না। এটা কি নিজের মধ্যের ঐ দ্বন্দ্বকে শেষ করবে? অন্য দিকে দেখো, যদি তুমি মেনে না নিয়ে তোমার বাবাকে বলো ঃ 'দুঃখিত, আমি ভিক্ষা করি বা আমি নিরন্ন হয়ে ঘুড়ে বেড়াই, আমি কিন্তু ছবিই আঁকবো', তখন কিন্তু কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বই থাকলো না। তখন অখণ্ডতা নিয়ে থাকা এবং ক্রিয়াশীল হওয়া— দুই এক সাথে থাকে। কারণ তুমি তোমার পূর্ণসত্তা দিয়ে যা করতে চাও তাই করো। কিন্তু যদি তুমি উকিল বা ব্যবসায়ী হয়ে যাও, আর ভিতরে ভিতরে চিত্রকর হওয়ার চাওয়াটাও জ্বলতে থাকে তাহলে বাকী জীবনটায় এক অদ্ভুত স্থূলতা আসবে আর সারাজীবন তুমি একজন হতাশ, চিন্তিত, ভীত মানুষ হয়ে নিজেকে নষ্ট করবে ও অন্যকেও নষ্ট করবে।

এই সমস্যাটা নিয়ে তোমাদের ভাববার প্রয়োজন রয়েছে। তোমরা যতো বড়ো হবে, তোমাদের বাবা-মা— তোমরা বিশেষ কিছু জিনিস করো, সবসময় সেটাই চাইবেন। তখন তোমরা যদি কী করতে চাও, সে ব্যাপারে পরিষ্কার না থাকো তবে ওটা অনেকটা ভেড়ার কসাইখানা

যাওয়ার মতো হয়ে যাবে। কিন্তু যদি খুঁজে পাও, কী করতে তুমি ভালোবাসো, যদি সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রাণ নিয়ে তাতে প্রবেশ করো, তাহলে সেখানে কোনো বিরোধিতা, কোনো দ্বিধাভিন্নতা থাকে না। সেই অবস্থায় তোমার পূর্ণতা নিয়ে থাকা এবং তোমার ক্রিয়া এক।

প্রশ্নকারী ঃ *আমরা যা করতে ভালোবাসি— তার জন্য কি আমরা বাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্যটাই ভুলে যাবো?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ 'কর্তব্য' অর্থে তুমি কী বোঝাতে চাইছো? কার প্রতি কর্তব্য? তোমার বাবা-মা, সরকার না সমাজ— কার প্রতি? যদি তোমার বাবা-মা বলেন যে তোমার উকিল হয়ে তাদের সাহায্য করা উচিত, আর তুমি ভিতর থেকেই একজন সন্ন্যাসী হতে চাও তাহলে তুমি কী করবে? ভারতে অবশ্য সন্ন্যাসী হওয়াটা নিরাপদ এবং সম্মানীয়ও বটে, তাই হয়তো তোমার বাবা ব্যাপারটা মেনে নিলেও নিতে পারেন। যখনই তুমি সন্ন্যাসীর বস্ত্র ধারণ করবে তখনই সকলের চোখে তুমি হয়ে যাবে এক মহান মানুষ এবং এর দ্বারা তোমার বাবা নিজের বিশেষ কিছু স্বার্থসিদ্ধিও করতে পারেন। কিন্তু তুমি যদি কোনো হাতের কাজ করতে চাও অর্থাৎ খুব সাধারণ কাঠের মিস্ত্রী বা সুন্দর মাটির জিনিস গড়তে চাও, তখন তোমার কর্তব্য কী? কেউ কি তোমায় বলতে পারবে? এখন বলোতো তোমাদের কি অতি যত্নের সাথে এগুলো নিয়ে ভেবে, এগুলোর সাথে জড়িত সব ব্যাপারকে বিবেচনা করা উচিত নয়, যাতে তুমি বলতে পারো 'আমি ভিতর থেকেই জানি এটাই আমার জন্য সঠিক, যাই ঘটুক না কেন আমি এটাই করবো, তাতে আমার বাবা-মা রাজি হতেও পারেন, নাও হতে পারেন'? কেবল সমাজ বা বাবা-মা যেটা বলছে সেটা না করে, খোঁজা— এই 'কর্তব্য' ব্যাপারটার সঙ্গে কী কী জিনিস জড়িয়ে আছে। সত্যটাকে স্পষ্টভাবে দেখা এবং সে সত্য যদি তোমায় অন্নকষ্ট, দুর্দশা

এমনকী মৃত্যুও দেয় তবু সারাজীবন সেই সত্যে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকার জন্য গভীর মেধা ও অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। আর প্রয়োজন ভরা ভালোবাসা। একটা জিনিস দেখো— যদি তুমি তোমার বাবা-মাকে এই ভেবে সাহায্য করো যে সেটা তোমার কর্তব্য, তাহলে তোমার সাহায্যটা যেন একটা বাজারের জিনিস হয়ে গেলো, তার খুব একটা মূল্যও নেই। এর কারণ সেই সাহায্যে কোথাও ভালোবাসার স্পর্শ নেই।

প্রশ্নকারী ঃ *আমি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাই আর বাবা যদি তার বিপক্ষে থাকে, তাহলে তা তো কোনোমতেই আমাকে সাহায্য করবে না। তখন কী করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বো?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ ধরো তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বেই, তুমি তোমার সিদ্ধান্তে অটল, তোমার বাবাও তোমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিলেন। এখন তুমি বলতে চাইছো তুমি ওটা পড়ার কোনো রাস্তা বা উপায় খুঁজে পাবে না, তাই তো? জানো জীবন বড়ো রহস্যময়। যে মুহূর্তে তুমি নিশ্চিত যে তুমি কী করতে চাও, ব্যাপারটা ঘটতে থাকে। জীবন নিজেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। কোনো বন্ধু, কোনো আত্মীয়, কোনো শিক্ষক বা তোমার ঠাকুমা কেউ-না-কেউ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে বলে যদি ভয় পাও তাহলে তুমি নষ্ট হবে। যে ভয় পেয়ে কারো কথা মেনে নেয়, জীবন তাকে সাহায্য করে না। কিন্তু যদি বলো 'এর সাথে আমি আমার প্রাণের আত্মীয়তা অনুভব করি, আমি এটাই করবো', তখন তুমি দেখবে অলৌকিক কিছু ঘটছে। তোমাকে হয়তো পেটে খিদে নিয়ে ঘুরতে হলো, বহু সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হলো, কিন্তু তুমি তখন অন্যের ছাঁচে ফেলা নকল মানুষ নয়, একজন মানুষ যার সত্য মূল্য রয়েছে।

দেখছো তো, আমাদের মধ্যে অধিকাংশই একা দাঁড়াতে ভয়

পাই। আমি জানি, এদেশে যেহেতু ইউরোপ বা আমেরিকার মতো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই, তাই বিশেষ করে তোমরা যখন ছোটো এমন কোনো পদক্ষেপ ওঠানো খুবই কঠিন। এখানে জনসংখ্যা এতো বেশী যে প্রত্যেকেই অস্তিত্বের সংকটের ভয়ে প্রথম থেকেই হার মেনে বসে থাকে। তুমি ভাবো 'আমার কী হবে'? কিন্তু একটা কথা বলি, যদি লেগে থাকো তাহলে কেউ বা কিছু তোমাকে সাহায্য করবে। যখন সমাজের দাবীগুলোর জাল কেটে একলা দাঁড়াবে, তখন তুমি এমন এক সত্তা যাকে সাহায্যের জন্য জীবন এগিয়ে আসে।

জানো জীববিদ্যায় এক ব্যাপার ঘটে তাকে বলে 'স্পোর্ট', যার অর্থ হলো কোনো উদ্ভিদের বা প্রাণীর তার সাধারণ ধরণ থেকে হঠাৎ এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবদিক দিয়ে পৃথক হয়ে যাওয়া। যদি তোমার বাগান থাকে, যদি বিশেষ প্রকারের কোনো ফুলের চাষ করে থাকো, কোনো এক সকালে হঠাৎই দেখবে সেই প্রকার থেকে একেবারে ভিন্ন প্রকারের একটা কিছু এসেছে, যার সাথে বাকীগুলোর কোনো সাদৃশ্য নেই। এই নতুন জিনিসটাকেই বলে স্পোর্ট। যেহেতু সে নতুন, সে ভিড় থেকে আলাদা, মালীও তাকে বিশেষ যত্ন নেয়। জীবনও ঠিক তেমনই। যেই মুহূর্তে তুমি সাহস করে যাত্রা শুরু করো তোমার অন্তরে এবং তোমার চারিপাশে কিছু ঘটতে থাকে। জীবন অনেকভাবে তোমাকে সাহায্য করতে আসে। হতে পারে অনেক সময় যে রূপে সে আসে— নৈরাশ্য, সংঘর্ষ, অন্নকষ্ট— এই সব রূপগুলো তুমি পছন্দ করো না। কিন্তু যখন তুমি স্বয়ং জীবনকে আমন্ত্রণ জানাও, অনেক কিছু ঘটতে শুরু করে। কিন্তু দেখবে আমরা জীবনকে কোনোদিন আমন্ত্রণলিপি পাঠাই না, আমরা নিরাপদে খেলে বেরিয়ে যেতে চাই। যারা নিরাপদ খেলা খেলে তারা নিরাপদ মৃত্যু নিয়েই ফিরে যায়, তাই নয় কি?

১৬

মনের নবীভবন

কাল সকালে দেখলাম এক মৃত শরীরকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাকে দাহ করা হবে। সে শরীর টকটকে লাল কাপড়ে মোড়া। যে চার জীবন্ত মানুষ তাকে বয়ে নিয়ে চলেছে, তাদের চলার ছন্দে সে প্রাণহীন দেহ দুলছে। ভাবছি, ঐ মৃত শরীর কারোর উপর কী প্রভাব ফেলে। কোনোদিন ভেবেছো ক্ষয় কেন হয়? তুমি একটা নতুন মোটরগাড়ি কেনো। কয়েক বছরের মধ্যেই সেটা ভাঙাচোরা হয়ে যায়। শরীরেরও ক্ষয় হয়, কিন্তু আর একটু এগিয়ে গিয়ে কি সন্ধান করবে না, মনের কেন ক্ষয় হয়? আগে আর পরে শরীরের মৃত্যু আছে, কিন্তু আমাদের অধিকাংশেরই মন আগে থেকে মরে যায়। কেন মন ক্ষয় হতে থাকে? শরীরের এমন হয়, তার কারণ শরীরকে আমরা ব্যবহার করি। ভৌতিক অবয়ব ব্যবহারে ক্ষয় হয়। রোগ, দুর্ঘটনা, খারাপ খাবার, দুর্বল বংশ, বার্দ্ধক্য— শরীরের ক্ষয় এবং মৃত্যুর কারণ। কিন্তু মন কেন বৃদ্ধ, ভারী আর স্থূল হয়ে ওঠে, তার কেন ক্ষয় হয়?

যখন কোনো মৃতদেহ দেখো, কোনোদিন কি অবাক হও নি? যদিও শরীরের মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু মনের কেন ক্ষয় হবে? কোনোদিন কি এ প্রশ্নটা তোমাদের মনে আসেনি? কেবল বৃদ্ধ লোকেদেরই মনের ক্ষয় দেখা যায় এমন নয়, যুবাবয়স্কদের মধ্যেও একই জিনিস

দেখতে পাবে। যুবকদের মন আগে থেকেই স্থূল, ভারী ও অসংবেদনশীল হয়ে যাচ্ছে। যদি মনের এই ক্ষয়ে যাওয়ার কারণটা বুঝতে পারি, তাহলে হয়তো আমরা অবিনশ্বর কিছু হয় কি না তার সন্ধান পাবো। হয়তো-বা আমরা উপলব্ধি করবো সেই শাশ্বত জীবন— যে জীবন শেষহীন, যা সময়াতীত, যাকে কলুষিত করা যায় না; শরীর, যাকে শ্মশান-ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়, দাহ করা হয়, যার অস্থি নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়, সেই শরীরের মতো যা নষ্ট হয়ে যায় না।

এখন প্রশ্ন হলো মনের কেন ক্ষয় হয়? কোনোদিন এটা নিয়ে কি ভেবেছো? তোমরা আজ নবীন এবং যদি এখনও সমাজ, বাবা-মা, পরিস্থিতি দ্বারা তোমাদের মনের তীক্ষ্ণতা নষ্ট না হয়ে গিয়ে থাকে— তবে তোমাদের কাছে এখনো একটা সতেজ, একটা উন্মুখ, একটা জিজ্ঞাসু মন আছে। তোমরা জানতে চাও— নক্ষত্রেরা কেন থাকে, পাখি কেন মারা যায়, পাতা কেন ঝরে, কেমন করেই-বা একটা উড়ো জাহাজ ওড়ে, আরো কতো কী-ই না জানতে চাও। কিন্তু সেই অনুসন্ধিৎসার তীব্র আবেগ, খোঁজার আকুলতাকে শীঘ্রই স্তিমিত করে দেওয়া হয়। ভয়, পুরানো পরম্পরার ভারী বোঝা, এক বিরাট বস্তু যার নাম জীবন তার মুখোমুখি হবার অসামর্থ্য, এইসব আমাদের অনুসন্ধিৎসার শিখাকে নিভিয়ে দেয়। লক্ষ্য করোনি কি— কিছু তীক্ষ্ণ কথা, অবজ্ঞাজনক ব্যবহার, পরীক্ষার ভয়, বাবা-মায়ের শাসন, ধমক কেমন তোমার সহজ উৎসাহকে উপেক্ষা করে, তাকে নষ্ট করে, যার অর্থ প্রথম থেকেই সংবেদনশীলতাকে উপেক্ষা করা হয়, মনকে ভোঁতা করে তোলা হয়।

অনুকরণ হলো অন্য একটা কারণ যার জন্য মন নিস্তেজ হয়ে যায়, জড় হতে শুরু করে। তোমাদের পরম্পরা তোমাদের অনুকরণের জন্যই তৈরী করে। অতীতের বোঝা তোমাদের মানিয়ে নিতে বাধ্য করে। পরম্পরার সব কিছুকে মেনে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে মন

নিজেকে নিরাপদ বোধ করে। তার একটা নিশ্চিন্ততা থাকে। এটা অনেকটা যেন মন নিজেকে ভালোভাবে তেল দেওয়া একটা খাঁজের বা চ্যানেলের মধ্যে স্থাপিত করে এবং তার লক্ষ্য থাকে যাতে সে অবহেলে এরই ভিতর যাতায়াত করতে পারে। কোনো প্রশ্ন, কোনো সন্দেহের বাধা যেন তার গতিরোধ না করতে পারে। তোমাদের চারিপাশের বয়স্ক-লোকেদের দেখো— তাঁরা কোনোভাবে, কোনো কারণে বিক্ষুব্ধ হতে চান না। তাঁরা যেকোনো মূল্যে শান্তি পেতে চান, হতে পারে তা মৃত্যুর নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ত শান্তি। কিন্তু আসল শান্তি সম্পূর্ণ অন্য কিছু।

মন যখন নিজেকে পুরানো কোনো ছাঁচে বা কাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত করে, তখন লক্ষ্য কোরো একটা ইচ্ছা দ্বারাই সে সবসময় তাড়িত হয় এবং সেটা হলো নিরাপদ থাকার ইচ্ছা। এই জন্যই এটা কোনো-না-কোনো একটা আদর্শ, কোনো উদাহরণ, কোনো গুরু, কিছু-না-কিছু একটা অনুসরণ করতে থাকে। এ কোনো ঝড়ঝাপটা চায় না, তাই সবচেয়ে সহজ পন্থা অনুকরণকেই বেছে নেয়। লক্ষ্য করেছো কি যখন ইতিহাস বইয়ে কোনো বীর যোদ্ধা, নেতা বা কোনো সাধুর কথা তোমরা পড়ো তোমরাও তাঁদেরই মতো হতে চাও? আমি কিন্তু এমন কথা বলছি না যে পৃথিবীতে কোনো মহান ব্যক্তি নেই। কিন্তু অনুকরণের প্রবৃত্তি বা তাঁদের মতো হওয়ার মধ্যে দিয়ে মন নিজেকে একটা ছাঁচে ফেলতে চায়, তার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায়, আর এটাই মনের অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ।

এছাড়া সমাজ কিন্তু কোনোদিনও সচেতন, তীক্ষ্ণধী বা বৈপ্লবিক ব্যক্তিকে চায় না। তারা তো আসলে পুরানো কাঠামোটার সাথে নিজেদের মিলিয়ে নেয় না বরং তারা কাঠামোটাকে ভেঙ্গে দিতে পারে। সেইজন্যই তথাকথিত সমাজ তোমাদের মনকে নিজের তৈরী ছাঁচটার মধ্যেই বেঁধে রাখতে চায় এবং তথাকথিত শিক্ষা তোমাদের

অনুকরণ করতে, অনুসরণ করতে বা সব কিছু পুরোনোকে স্বীকার করে নেওয়ারই শিক্ষা দেয়।

এখন প্রশ্ন হলো, মন কি এই অনুকরণ বন্ধ করতে পারে? অন্যভাবে বললে বলা যায় মন কি অভ্যাস তৈরী করা বন্ধ করতে পারে? এর সাথে, মন ইতিমধ্যেই যেসব অভ্যাসের মুষ্টিতে আবদ্ধ হয়ে আছে— তার থেকে মুক্ত হতে পারে?

মন কিন্তু বিভিন্ন অভ্যাসেরই পরিণাম, তাই নয় কি? পরম্পরাই মনকে তৈরী করেছে, সময়ই মনকে তৈরী করেছে— সময় অর্থ বহুকাল ধরে একই কিছুর পুনরাবৃত্তি, অতীতের শৃঙ্খলকে টেনে নিয়ে চলা এবং তাকে এগিয়ে দেওয়া। যা হয়ে গেছে এবং যা হবে— মন কি এইভাবে ভাবা বন্ধ করতে পারে। 'যা হবে'র ভাবনা কিন্তু 'যা হয়ে গেছে' তারই অভিক্ষেপণ (projection)। মন কি পুরোনো অভ্যাসগুলো থেকে এবং নতুন অভ্যাস গড়া থেকে মুক্ত হতে পারে? যদি এই ব্যাপারটার খুব গভীরে যাও তাহলে দেখবে মন সেটা পারে। তখন দেখবে মন আবার নতুন কোনো ছাঁচ বা অভ্যাস না গড়ে, অনুকরণের বাঁধানো পথে না চলে— নিজেকে বারবার নতুন করে তুলছে। এই নবীকরণের ফলে মন থাকে অম্লান, অকপট। সে মন অনন্ত বোধলাভের সামর্থ্য অর্জন করে।

এমন মনের মৃত্যু নেই, কারণ সেখানে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা-অনুভূতি সঞ্চয়ের ও সংগ্রহের প্রক্রিয়াটারই সে বিসর্জন দেয়। আসলে মনের সঞ্চয়ের যে প্রক্রিয়া চলতে থাকে, ওটাই অভ্যাস বা অনুকরণ সৃষ্টি করে। যে মন সংগ্রহ করছে, সঞ্চয় করছে তার ক্ষয় হবে, তার মৃত্যুও হবে। কিন্তু যে মন সংগ্রহ করে না, জমিয়ে রাখে না, অসংখ্য কিছুকে নিজের মধ্যে স্তূপীকৃত করে রাখে না, আসলে প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ সব কিছুকে বিসর্জন করতে থাকে— সে মনের মৃত্যু নেই। সে এক অসীম ব্যাপ্তি, এক অনন্ত অবকাশের অবস্থা।

সুতরাং যা কিছু মন মজুত করেছে— তার সব অভ্যাস, অনুকরণের মাধ্যমে তৈরী সদ্‌গুণ, এক কথায় সেই সবকিছু যাদের কাছে সে নিরাপত্তার কারণে নিশ্চিন্ত আশ্রয় নিয়েছে— সেইসবকে এক লহমায় বিসর্জন দিতে হবে। তখন সেই মন স্বনির্মিত চিন্তার জালে আটকে ছটফট করে না। মনের, প্রতি মুহূর্তের পেরিয়ে যাওয়া ক্ষণগুলোকে বিসর্জন, তাকে সতেজ করে তোলে। সে মনের ক্ষয় নেই, সে কোনো অন্ধকার পথে যাত্রা করে না।

প্রশ্নকারী ঃ *আপনি যা কিছুই বলছেন, কীভাবে আমাদের আচারে-আচরণে আমরা তা নিয়ে আসবো?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ তোমরা একটা কিছু শুনছো, যেটা তোমরা সঠিক বলে মনে করো। এখন তোমরা তোমাদের প্রতিদিনকার জীবনে সেইভাবে আচরণ করতে চাও। এর অর্থ তোমাদের চিন্তায় এবং তোমাদের কর্মে একটা ব্যবধান আছে। তোমরা ভাবো একরকম, আবার করো অন্য কিছু। কিন্তু তোমরা যা ভাবো তা আচরণে আনতে চাও, সুতরাং চিন্তা ও ক্রিয়ার মধ্যে একটা ব্যবধান থাকে। অতঃপর তোমরা প্রশ্ন করো এই দুয়ের ব্যবধান ঘুচবে কী করে, কীভাবে চিন্তা এবং কর্মের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হবে?

যখন তোমরা কোনো কাজ সত্যিই করতে চাও তোমরা সেটা করোই, তাই নয় কি? যখন তোমরা ক্রিকেট খেলতে চাও বা যে ব্যাপারে সত্যিই তোমাদের উৎসাহ আছে তেমন কিছু করতে চাও— তোমরা সেটা করার পথ বার করো। তখন কিন্তু তোমরা 'এই কাজটা কী করে করবো' তেমন কিছু জিজ্ঞাসা করো না। তোমাদের সেই ব্যাপারে আগ্রহ আছে, তোমাদের হৃদয়, মন, সমস্ত সত্তা তাতে পড়ে থাকে, তাই তোমরা ওটা করো।

কিন্তু অন্য ব্যাপারে তোমরা চতুর। তোমরা ভাবো এক, আর

করো আর এক। তোমরা বলো 'ধারণাটা চমৎকার, বৌদ্ধিক দিক থেকে আমি এর সমর্থন করি, কিন্তু একে নিয়ে যে কী করবো তা জানিনা, এখন দয়া করে আপনি আমাকে বলুন কী করে এটা আমার আচরণে আনবো'— এর অর্থটা পরিষ্কার, তোমরা এটা করতেই চাও না। আসলে তোমরা যেটা করণীয় সেটাকে সরিয়ে রেখে— আরো একটু ঈর্ষালু অথবা, আরো যা যা সব হতে পারে— সেইগুলো হতে পছন্দ করো। তোমরা বলো 'আমার আশেপাশে সবাইতো ঈর্ষালু, আমার দোষটা কোথায়'— এইভাবে আগের মতোই তোমরা সব চালাতে থাকো। কিন্তু যদি সত্যি ঈর্ষান্বিত হতে না চাও, যদি বিষাক্ত কোবরাকে সামনে দেখে তার ভয়ঙ্কর উপস্থিতিকে অনুভব করার মতো করেই ঈর্ষার অন্তর্গত সত্যটাকে দেখো, তবে আর কোনোদিন ঈর্ষান্বিত হবে না, ওখানেই ওটার শেষ। তুমি আর কখনোই জিজ্ঞাসা করবে না কী করে ওর থেকে মুক্ত হতে পারবো।

সুতরাং যা জরুরী তা হলো কোনো জিনিসের সত্যতাকে দেখা, তাকে উপলব্ধি করা। কী করে তাকে আচরণে নিয়ে আসবো, একথার অর্থ তুমি সেই বিষয়ের অন্তর্গত সত্যটাকেই দেখতে পাওনি। রাস্তায় যেতে যেতে যদি কোবরার মুখোমুখি হও তখন কি জিজ্ঞাসা করো 'এখন ঠিক কী করা যেতে পারে'। তুমি এই বিষাক্ত সাপের বিপদটার ব্যাপার জানো, তাই তুমি এর থেকে নিরাপদ দূরত্বেই থাকো। কিন্তু ঈর্ষার সব পরিণামগুলো কী কী— এ ব্যাপারটা নিয়ে তোমরা কোনোদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করোনি, কেউ এ ব্যাপার নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করেননি, কেউ তোমাদের সাথে এ ব্যাপারের গভীরে প্রবেশ করেননি। তোমাদের খালি বলা হয়েছে ঈর্ষান্বিত হওয়া ঠিক নয়। কিন্তু তোমরা কোনোদিন ঈর্ষার প্রকৃতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করোনি। সমাজ এবং সংগঠিত ধর্মগুলো যে ঈর্ষার উপর ভিত্তি করে, কোনো কিছু হয়ে ওঠার ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে— তা কোনোদিন

লক্ষ্য করোনি। কিন্তু যখনই তোমরা এই ঈর্ষার গভীরতায় প্রবেশ করো, এর সত্যতাকে অনুভব করো— ঈর্ষার সমাপ্তি ঘটে।

'কী করে এটা করা যাবে'— এমন প্রশ্নের মধ্যে কোনো বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ নেই। এমন কোনো কাজ, যার ব্যাপারে তোমার আগ্রহ আছে, অথচ তুমি জানো না কী করে তা করতে হবে, সেই পরিস্থিতিতে তুমি দ্রুত তাকে বোঝার চেষ্টা করো, তার ব্যাপারে খোঁজ শুরু করো। আর যদি তুমি আরাম কেদারায় গা এলিয়ে বসে বলো 'দয়া করে আমাকে লোভ থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো ব্যবহারিক উপায় বলে দেবেন', তবে তুমি যেমন লোভাতুর আছো তেমনই রয়ে যাবে। কিন্তু যদি এক সচেতন মন নিয়ে, পুরোনো ধারণাগুলোকে ফেলে দিয়ে, তোমার সমস্ত উৎসাহ নিয়ে লোভ ব্যাপারটার গভীরে প্রবেশ করো, তবে তুমি নিজেই লোভের আসল স্বরূপটা জানতে পারবে। লোভ থেকে মুক্ত হওয়ার রাস্তা খোঁজাখুঁজি নয়, বরং লোভের স্বরূপের উপলব্ধিই তোমাকে লোভ থেকে মুক্ত করবে।

প্রশ্নকারী ঃ *কেন কোনো সময়ই আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না? আমাদেরই চাওয়া কোনো কাজ যখন আমরা সম্পূর্ণ করতে চাই, কেন সবসময়ই বাধা আসে?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ যদি কোনো কিছু করার তোমার পূর্ণ ইচ্ছা থাকে, যদি কোনো বিশেষ ফলের আশা না করো এবং সেটার করার মাধ্যমে নিজেকে পূর্ণ করবে এমন কোনো বাসনা না রেখে (ফলত সেখানে ভয়ও থাকে না) তোমার সমগ্র সত্তা দিয়ে যদি সে কাজ তুমি করো, সেখানে কোনো বাধা থাকে না। এই বাধা বা বিসংগতি তখনই আসে যখন তোমার করার ইচ্ছাটাই পূর্ণরূপে থাকে না। হয়তো তুমি কিছু করছো, আবার সেটা করতে ভয়ও পাচ্ছো, অথবা হয়তো তোমার অর্ধেক মন অন্য কিছু করতে চাইছে। আর একটা ব্যাপারও

এর মধ্যে রয়েছে, তাহলো সত্যিই কি সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছাপূরণ হতে পারে? ব্যাপারটা আলোচনা করা যাক।

মানুষে মানুষে সম্পর্কের যে সামগ্রিক রূপ যাকে আমরা সমাজ বলি তা কোনোদিন চায় না সম্পূর্ণরূপে তুমি কিছু একটা চাও, কারণ পূর্ণ ইচ্ছাটা সমাজের কাছে উপদ্রব হয়ে দাঁড়ায়, একটা বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। কিছু চলতি শোভনতার ছাপ মারা ইচ্ছা বা কামনা রয়েছে। যেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ঈর্ষা এগুলো সমাজের কাছে সঠিক। যেহেতু ঈর্ষাপরায়ণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যাঁরা বিভিন্ন বিশ্বাসে বিশ্বাসী, অন্যের অনুকরণকারী মানুষের দ্বারা এই সমাজ নির্মিত হয়েছে, তাই উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিভিন্ন বিশ্বাস, অনুকরণ, ঈর্ষা— যদিও আসলে ভয়েরই বহিঃপ্রকাশ, তবু সমাজ এগুলোকে স্বীকার করে নেয়। যতক্ষণ তোমার কামনাগুলো, প্রতিষ্ঠিত যে সামাজিক কাঠামো আছে তার সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে, ততক্ষণ তুমি একজন সম্মানীয়, একজন গ্রহণযোগ্য মানুষ। কিন্তু যে মুহূর্তে তোমার মধ্যে একটা সম্পূর্ণ ইচ্ছা দেখা দেয়, যেটা সামাজিক কাঠামোর থেকে জন্ম নেয়নি বা এর সাথে মিলে যেতেও পারছে না, তখনই তুমি সমাজের কাছে একটা উপদ্রবে পরিণত হও। সমাজ সবসময় তার শ্যেন দৃষ্টিতে নজর রাখে, সে তোমার কোনো পূর্ণ বাসনা থাকাতে বাধা দেয়। কারণ পূর্ণবাসনা হলো তোমার সমগ্র সত্তার একটা অভিব্যক্তি, সেইজন্যই এটা এক বৈপ্লবিক ক্রিয়ার জন্ম দেয়।

শুদ্ধ চৈতন্যময় সত্তার (the action of being) ক্রিয়া, আর কোনো কিছু হতে হবে— এর থেকে জন্ম নেয় যে ক্রিয়া (the action of becoming)— পরস্পর সম্পূর্ণরূপে পৃথক। শুদ্ধ চৈতন্যময় সত্তার ক্রিয়া এতোটাই বৈপ্লবিক যে সমাজ তাকে কোনোমতেই স্বীকার করে নেয় না। যেহেতু কিছু হতে চাওয়া থেকে জন্ম নেওয়া ক্রিয়া তার কাঠামোটার সাথে ঠিক ঠিক মিলে যায়, তাই ঐ ক্রিয়ার সাথেই

সমাজ নিজের সম্বন্ধ রাখে। তার পরিকাঠামোর ভিতর সেই ক্রিয়াও যথেষ্ট সম্মানজনক স্থান পায়। কোনো কামনা যা নিজেকে কোনো কিছু হয়ে উঠবার (becoming) ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে আসলে উচ্চাকাঙ্ক্ষারই একটা রূপ, তেমন চাওয়া কোনোদিনই পূর্ণতা লাভ করে না। এই কামনা বা এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা আগে আর পরে কখনও-না-কখনও ব্যর্থ হবে, কোনো-না-কোনো পরিস্থিতি এর গতিকে রূদ্ধ করবে, তখনই তুমি হতাশ হবে। আমরা আসলে এই হতাশার বিরুদ্ধেই কোনো ভুল পথে বিপ্লব করি।

এই প্রশ্নটা কিন্তু সত্যি আলোচনাযোগ্য, এর গভীরে যাওয়া খুবই জরুরী। যতো বড়ো হবে দেখবে তোমাদের কামনাগুলোর সত্যিই কোনোদিন পূরণ হয় না। এই পূরণ হওয়ার মধ্যে সবসময় হতাশার ছায়া থাকে, হৃদয়ে গান নয় কোথাও একটা কান্না লুকিয়ে থাকে। কোনো কিছু হওয়ার কামনা— ধরো, বিরাট মানুষ, মহান সাধু, বিরাট এটা-ওটা এই সবের কোনো শেষ নেই, তাই তা কোনোদিন পূরণও সম্ভব নয়। এই কামনা সবসময় 'আরো আরো' এই মত্ততায় হাত বাড়ায়। এটা যন্ত্রণা, দুঃখ আর যুদ্ধ নিয়ে আসে। যখন কেউ কিছু একটা হয়ে ওঠার তীব্র বাসনার জাল থেকে মুক্ত হয়, তখন সত্তা এমন এক অবস্থায় থাকে যে তার প্রতিটা ক্রিয়াই সম্পূর্ণ আলাদা। তখন থাকে কেবল শুদ্ধ অস্তিত্বের বিরাজমানতা। তা সময়াতীত। তৃপ্ত হওয়ার চিন্তা সেখানে থাকে না। এই শুদ্ধ অস্তিত্বে বিরাজমানতা স্বয়ংই পরিতোষ।

প্রশ্নকারী ঃ *আমি নিজেকে স্থূলবুদ্ধির মানুষ হিসাবে দেখতে পাই। কিন্তু অন্যে বলে আমি বুদ্ধিমান। আমার জানাটা, না অন্যের বলাটা— কোনটার প্রভাব আমার উপর বেশী পড়া উচিত?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ এখন প্রশ্নটাকে ভালো করে শোনো। উত্তর খোঁজার চেষ্টা

কোরো না। যদি তুমি আমাকে বলো আমি বুদ্ধিমান, এবং আমি নিজে খুব ভালোভাবেই জানি আমি বোকা, তখন তুমি যা বলছো তার কি কোনো প্রভাব আমার উপর পড়বে? এখন যদি আমি আসলে বুদ্ধিমান হওয়ার চেষ্টায় আছি, তাহলে তোমার কথা আমাকে প্রভাবিত করবে, নয় কি? তখন আমি স্তুতিতে আপ্লুত হয়ে যাবো, তোমার মন্তব্য আমার মনে দাগ কাটবে, আমি প্রভাবিত হবো। কিন্তু যদি আমি উপলব্ধি করি বুদ্ধিমান হওয়ার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে কোনোদিন বুদ্ধিহীনতার সমাপ্তি হয় না, তখন কী ঘটে?

যদি আমি নির্বোধ হই এবং বুদ্ধিমান হওয়ার চেষ্টা করি, আমি নির্বোধই রয়ে যাবো। কারণ কোনো কিছু হতে চাওয়ার চেষ্টাটা আসলে বুদ্ধিশূন্যতারই একটা অংশ। কোনো ক্ষুদ্র বুদ্ধির লোক হয়তো নিজের মধ্যে একটু চালাক চতুরতার রঙ লাগালো, কয়েকটা পরীক্ষায়ও উতরে গেলো, চাকরিও পেলো, কিন্তু তার বুদ্ধিহীনতা থেকেই যাবে (একটু ভালো করে শোনো, আমি কিন্তু কাউকে আঘাত করার জন্য বা নিন্দা করার জন্য এগুলো বলছি না)। কিন্তু যে মুহূর্তে কোনো ব্যক্তি দেখতে পায় যে সে নির্বোধ এবং তখন বুদ্ধিমান হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা না করে যদি তার মূঢ়তাকে নিয়ে সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, তাকে উপলব্ধি করে, তাহলে সেই মুহূর্তে ধীশক্তির জাগরণ হয়।

লোভের উদাহরণটা নেওয়া যাক। তোমরা কি জানো লোভ কী? তোমার যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী খাওয়া, খেলায় নিজের উপস্থিতি আরো উজ্জ্বলভাবে দেখাবার চেষ্টা, আরো বেশী সম্পত্তিকে চাওয়া, অন্যের থেকে আরো বড়ো গাড়ি চাওয়া— এগুলো হলো লোভ। তারপর তুমি বলো এই লোলুপতা ঠিক নয়, তখন তুমি লোভহীনতার আদর্শকে সামনে রেখে বিভিন্ন কিছু অভ্যাস করতে থাকো। যেটা হলো আসলে মূঢ়তা, লোভহীন হতে চাওয়ার মধ্যে

দিয়ে কোনোদিন লোভের শেষ হয় না। কিন্তু যদি তুমি লোভ এবং এর সকল পরিণামকে দেখতে পাও, তা উপলব্ধি করো, তোমার মন এবং হৃদয় দিয়ে এই সবের সত্যতা অনুধাবন করো, তখন তুমি লোভ আর তার বিপরীত, যাকে লোভহীনতা বলো— এই দুই থেকেই মুক্ত হয়ে যাবে। তখন তুমি সত্যিই একজন বুদ্ধিমান মানুষ, কারণ তুমি তোমার মধ্যে যা আছে (what *is*) তাকে বুঝছো, তোমার কী হওয়া উচিত (what *should* be)— তেমন কোনো এক শুষ্ক ধারণার অন্ধ অনুসরণ করছো না।

সুতরাং যদি তুমি বুদ্ধিহীন হও, বুদ্ধিমান বা চতুর হওয়ার চেষ্টা কোরো না, বরং কী তোমাকে মূঢ় করে তুলছে তাকে উপলব্ধি করো। অনুকরণ, ভয়, অন্যকে নকল করা, কোনো উদাহরণ বা আদর্শের অনুগমন মনকে জড় করে তোলে। যখন তুমি অন্যকে অনুসরণ করছো না, যখন তোমার মধ্যে কোনো ভয় নেই, যখন তুমি নিজে সুস্পষ্ট চিন্তা করতে পারছো— তখন কি তুমি বুদ্ধির বিশুদ্ধ ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল একজন মানুষ নও? যদি তুমি নির্বোধ হও এবং চতুর হওয়ার চেষ্টা করো তখন তুমি চতুর হয়েও যারা নির্বোধ তাদের মধ্যেই পরিগণিত হবে।

প্রশ্নকারী ঃ *আমরা দুষ্টু কেন?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ যখন দুষ্টুমি করছো তখন যদি নিজেকে এই প্রশ্নটা করো, তাহলে সেইটার একটা অর্থ আছে। যখন তুমি রেগে আছো, তখন কিন্তু তুমি নিজেকে এই প্রশ্ন করো না, কেন তুমি রেগে গেছো, তাইতো? অনেক পরে তোমরা এ প্রশ্ন করো। পরে বলতে থাকো 'কী বোকামিই না করেছি, আমার রেগে যাওয়া উচিত হয়নি'। কিন্তু যখন রেগে যাও, সেই মুহূর্তে যখন ভিতরে একটা ওলট-পালট চলতে থাকে, তখন তাকে খারাপ ব্যাপার, অপ্রীতিকর ব্যাপার

এইসব না মনে করে যদি 'সম্পূর্ণ সচেতনতা নিয়ে সেখানে' উপস্থিত থাকো তাহলে দেখবে সমস্ত কেমন শান্ত হয়ে যাচ্ছে।

একটা বয়স অবধি বাচ্চারা দুষ্টু থাকে, সেটা দরকারও। অনেক শক্তি, অনেক উৎসাহ, অনেক কৌতুহল— তার স্ফুরণ হবেই; কোনো-না-কোনোভাবে সেগুলো নিজেদের প্রকাশ করবেই। কিন্তু তোমার প্রশ্নটা জটিল। এই দুষ্টুমি ভুল খাবারের জন্যও হতে পারে, কম ঘুমের জন্যও হতে পারে, নিরাপত্তাহীনতাবোধ থেকেও হতে পারে। এর আরো অনেক কারণ আছে। এই কারণগুলো যদি সঠিকভাবে না বোঝা যায় তা হলে তা সমাজের গণ্ডীর ভিতরে একটা তোলপাড়ের, একটা বিপ্লবের রূপ নেয়, সেখান থেকে কোনোদিনই তাদের মুক্তি মেলে না।

তোমরা কি জানো 'অপরাধী' বাচ্চা ব্যাপারটা কী? তারা অদ্ভুত অদ্ভুত ভয়ঙ্কর সব কাজকর্ম করে, তারা সমাজের মধ্যে থেকেই সব কিছু তোলপাড় করে, সব কিছুর বিরুদ্ধে যায়, তার কারণ তারা কখনই এই অস্তিত্বের সমগ্র সমস্যাকে বোঝবার জন্য কোনো সহায়তা পায়নি। তারা প্রচুর প্রাণে পূর্ণ, তাদের এক একজন অসম্ভব বুদ্ধিমান, কিন্তু তাদের এই বিরুদ্ধাচরণ, তাদের এই বিপ্লবের মধ্যে একটা কন্ঠ প্রচ্ছন্ন থাকে, তা বলে ঃ 'আমাদের বুঝতে সাহায্য করো, এই বাধ্যবাধকতা থেকে বেরোতে সাহায্য করো, আমাদের এই অবদমিত হওয়া থেকে, এই মানিয়ে নেওয়া থেকে বের করে নিয়ে চলো'। তাই এই প্রশ্নটা শিক্ষকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এছাড়া, শিশুদের থেকেও শিক্ষকদেরকে নিজেদের বোঝবার জন্য শিক্ষিত করে তোলার অধিক প্রয়োজন আছে।

প্রশ্নকারী ঃ *আমার চা খাওয়ার অভ্যাস আছে। একজন শিক্ষক বলেন ওটা বদঅভ্যাস, আর একজন বলেন ওটা ঠিক আছে।*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ তুমি নিজে কী মনে করো? এখনকার মতো অন্যে কী বললো সেটাকে সরিয়ে রাখো। হয়তো ওটা ওঁদের নিজের ধারণা। একটু ভালো করে প্রশ্নটা শোনো। একজন কিশোর বালক এখন থেকে কোনো এক অভ্যাসে অভ্যস্ত— সেটা চা খাওয়া হতে পারে, সিগারেট খাওয়া হতে পারে, বেশী খাওয়া হতে পারে— এটাকে তোমরা কীভাবে দেখো? অর্থাৎ এই ব্যাপারটা কীভাবে দেখো? হয়তো সত্তর, আশী বছর বয়সের কোনো ব্যক্তি যার অতি পাশে মৃত্যু বসে আছে, তিনি কোনো অভ্যাসের কলে পড়ে আছেন— সেটা হয়তো তবু কিছুটা বোঝা যায়। কিন্তু তুমি তো জীবন শুরু করতে চলেছো, এখনই কোনো কিছুতে অভ্যস্ত হওয়া একেবারেই ভালো নয়, তাই নয় কি? আর এটাই আসল প্রশ্ন, চা খাওয়া উচিত-না-উচিত-নয় সেটা খুবই গৌণ ব্যাপার।

একটা ব্যাপার দেখতে পাচ্ছো কি, যখন কোনো মন অভ্যাসের দাসত্ব করে, তখন সেই মন মৃত্যুর দিকে যে পথ চলে গেছে সেই পথে চলা শুরু করেছে। যখনই তোমরা নিজেদের হিন্দু, কমিউনিস্ট, ক্যাথালিক, প্রোটেষ্টান্ট— এইসব হিসাবে ভাবার অভ্যাস করো তখন মনের অবনমন ঘটে, তার ঘুণ ধরা শুরু হয়। কিন্তু একটা সচেতন মন নিয়ে, একটা সন্ধানী মন নিয়ে যদি দেখো খুঁজে বার করার চেষ্টা করো, কেন কোনো অভ্যাসের কবলে আটকা পড়েছো, কেন একটা বিশেষভাবে তুমি চিন্তা করো— সেইটাই গুরুত্বপূর্ণ, তখন তোমার সিগারেট খাওয়া উচিত-না-উচিত-নয় তারও উত্তর তুমি খুঁজে পাবে।

১৭

জীবনপ্রবাহ্

জানিনা হাঁটতে হাঁটতে কোনোদিন নদীর ধারের ডোবাটাকে দেখেছো কিনা। অনেকটা লম্বা, কিন্তু তেমন চওড়া নয়। জেলেরা খুঁড়ে থাকবে বোধ হয়। নদীর স্রোতের সাথে ডোবার কোনো যোগ নেই। বিস্তৃত গভীর নদী অবিরাম বয়ে চলেছে, আর ডোবাটার জল ভারী, কেমন গেঁজে উঠেছে। তার কারণ নদীর প্রাণময় প্রবাহের সাথে এর কোনো আত্মীয়তা নেই। এতে কোনো মাছও নেই। এটা এক অন্ধ বদ্ধ জলাশয়, আর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে এক পূর্ণপ্রাণ গতিময় ধারা।

মনে হয় না কি মানুষও সেরকমই? তারা সবেগে ধাবমান জীবনধারা থেকে দূরে একটা ছোট্ট জলাশয় নিজেদের জন্য খুঁড়ে নেয়, তার মধ্যেই থিতিয়ে পড়ে, সারাজীবন কাটায় আর মারা যায়। এই স্থবিরতা, এই তিলে তিলে ক্ষয়ে যাওয়াকেই আমরা জীবন বলে ধরে নিয়েছি। অন্য কথায় বলতে গেলে আমরা স্থায়িত্ব চাই, আমাদের কিছু কিছু চাওয়া যেন চিরকালের জন্য থাকে, আমাদের আনন্দও যেন কখনও শেষ না হয়। আমরা ছোট্ট একটা গর্ত খুঁড়ে, তারমধ্যেই পরিবার, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সংস্কৃতি, ভয়, ঈশ্বর, বিভিন্ন পূজা-পাঠ এইসব নিয়ে থাকতে থাকতে একদিন সেই গর্তেই মরে পড়ে থাকি। অথচ আমাদের পাশ দিয়েই বয়ে চলে জীবনের বিরাট স্রোত। সে এক

সদাপরিবর্তনশীল গতিময় ধারা, যার প্রাণশক্তি অঢেল আর সৌন্দর্য অনন্ত।

লক্ষ্য করোনি কি, যখন চুপচাপ নদী তীরে গিয়ে বসো— তার কিনারে ছোটো বড়ো ঢেউয়ের ধাক্কা লাগার শব্দ, প্রবাহের নিজস্ব একটা শব্দের মধ্যে লীন হয়ে থাকা নদীর গান তুমি শুনতে পাও? সেখানে সবসময় যেন এক গতির অনুভূতি, ঐ স্রোত প্রতি পলে যেন আরো সীমাহীনতা, আরো অতলতার দিকে বয়ে চলেছে। কিন্তু ছোটো ডোবাটায় কোনো গতি নেই, জলও একই জায়গায় বদ্ধ। যদি একটু গভীরভাবে দেখো, দেখবে আমরা আসলে জীবনের তরঙ্গময় প্রবাহ থেকে দূরে কোথাও এমন এক গতিহীন-ধারাকে চাই। আমরা বলি এমন নিশ্চিত বদ্ধ অস্তিত্বই ভালো। এর সপক্ষে যুক্তি আনবার জন্য আমরা দর্শনও আবিষ্কার করেছি, কতো সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয় তত্ত্ব বার করেছি। আমরা জীবনে কোনো ধরণের টানা-পোড়েন, কোনো ধরণের বিক্ষোভ চাই না। আসলে একটা কিছু স্থায়ী থাক, এটাই আমরা চাই।

তোমরা কি জানো এই স্থায়িত্ব খোঁজার অর্থ কী? এর মানে সুখদ সব কিছু যেন অনন্ত সময় ধরে চলতেই থাকে, আর যা কিছু সুখাবহ নয়, তা যেন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ হয়ে যায়। আমরা চাই সকলে আমাদের নাম জানুক এবং আমাদের পরিবার ও সম্পদের মাধ্যমে সেই নাম স্থায়ী হোক। আমরা আমাদের সম্পর্কগুলোতে আমাদের কর্মে এক স্থিরতা, এক স্থায়িত্ব চাই, যার অর্থ ঐ প্রাণ-নিঃস্ব ডোবাটাতে আমরা একটা স্থায়ী, চিরন্তন জীবন খুঁজে চলেছি। আমরা ঐ বদ্ধতাটায় কোনো রকম সত্য পরিবর্তন চাই না। এই জন্যই আমরা এমন এক সমাজ গড়েছি, যা আমাদের সম্পত্তি, আমাদের নাম, আমাদের খ্যাতি— এই সবের স্থায়িত্ব সম্পর্কে এবং তাদের দায়িত্ব নেওয়া সম্পর্কে আশ্বাস দেয়।

কিন্তু দেখো, জীবন কিন্তু আদৌ তেমন কিছু নয়। জীবনে কোনো কিছুই স্থির বা স্থায়ী নয়। গাছের পাতা ঝরার মতোই, সব কিছু অস্থায়ী, কিছুই থেকে যায় না, সব কিছুর পরিবর্তন হয়, সব কিছুর মৃত্যু হয়। কোনোদিন আকাশের পটে পাতা ছাড়া শুধু গাছ, তার শাখার সৌন্দর্য দেখেছো? সমস্ত শাখার রেখায়, তাদের নগ্নতায়— এক কাব্য, এক সঙ্গীত রয়েছে। সব পাতা ফিরে গেছে, একা গাছ দাঁড়িয়ে আছে বসন্তের অপেক্ষায়। বসন্ত আসে, পূর্ণ করে তাকে পাতার সুরে সুরে। আবার পাতা ঝরার ঋতু এলে, পাতা ঝরে, উড়ে যায়। এটাই জীবনের নিয়ম।

এমন কিছু আমরা কিন্তু আদপেই চাই না। আমরা আমাদের সন্তান, সমাজ, সংস্কার, ছোটো ছোটো গুণ, নাম— এই সবকে আঁকড়ে ধরে থাকি, কারণ আমরা স্থায়িত্ব চাই, এইজন্য আমরা মরতেও ভয় পাই। যা কিছু চেনা, যা কিছু জানা, তাকে হারাবার এক আশঙ্কা আমাদের মধ্যে থাকে। আসলে আমরা জীবনকে যে ভাবে দেখতে চাই জীবনতো আর তা নয়। জীবনে কোথাও স্থায়িত্ব নেই, কোথাও এতটুকু নিশ্চিতি নেই। এখানে পাখি মরে, বরফ গলে গতিময় হয়, গাছ কাটা পড়ে অথবা ঝড়ে আছড়ে পড়ে, চারিদিক শুধুই পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু আমরা চাই সুখদায়ী সবকিছু আমাদের কাছে যেন বরাবরের জন্য থাকে। আমরা চাই যেন আমাদের প্রতিষ্ঠা, অন্যের উপর আমাদের অধিকার— সব স্থায়ী হয়। জীবন আসলে যেমন, তাকে সেইরূপে কিছুতেই আমরা গ্রহণ করতে চাই না।

জীবন নদীর মতো, সদা বহমান, সর্বদা নিজেই নিজের পথ খুঁজে নিচ্ছে, প্রত্যেকটা অন্ধকার ফাটলে প্রবেশ করছে, খুঁজছে, নিজেই নিজের দুই তীরের সীমানাকে অতিক্রম করছে। কিন্তু দেখবে মন তার সাথে এটা ঘটুক তা চায় না। মন দেখে এই অস্থায়িত্ব, এই

অসুরক্ষিত অবস্থা ভয়ঙ্কর, তাই সে নিজের চারিপাশে প্রাচীর গড়ে— সংস্কার বা পরম্পরা, সংগঠিত ধর্ম, অসংখ্য রাজনৈতিক এবং সামাজিক তত্ত্বের এক শক্ত প্রাচীর। মন জীবন থেকেই বহু দূরে— নাম, পরিবার, সম্পত্তি, অনেক দিনের অভ্যাস করা সদ্‌গুণ এইসব কিছু দিয়ে গড়া এক শক্ত প্রাচীরের ভিতর থাকে। সে প্রাচীরের এপারে সংশয়, দুর্দশার আবর্জনা ভর্তি, আর প্রাচীরের ওপাশে জীবনের উদ্দাম ধারা বার বার এ দেওয়ালকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য আঘাত হানছে। এই প্রাচীরের ভিতরের সব ঈশ্বর মিথ্যা, তাদের সব শাস্ত্র, সব দর্শন ব্যর্থ; কারণ, জীবন এইসব কিছুর অতীত।

যে মনের চারিদিকে ঐ প্রাচীর নেই, যে মন নিজের অধিকার, সংগ্রহ, সঞ্চিত জ্ঞানের ভারী বোঝায় ন্যুব্জ হয়ে যায়নি, যে মন সকল সময়ের গণ্ডীকে অতিক্রম করে অসুরক্ষিতভাবে প্রবাহিত হয়, তার কাছে জীবন এক অতুলনীয় কিছু। আসলে সেই মনই জীবন। সে জীবন কোনো জায়গায় স্থাণু হয়ে যায় না। কিন্তু আমরা স্থির জায়গা চাই। আমরা বলি একটা বাড়ি, নাম, পদ, প্রতিষ্ঠা এগুলোর খুব দরকার রয়েছে। এই স্থায়ী কিছু, স্থির কিছুর চাহিদার উপর ভিত্তি করেই আমরা একটা সংস্কৃতি গড়ে তুলি। আমরা ভগবানও তৈরী করি, কিন্তু সে ভগবান আমাদের চাহিদাগুলিরই বাহিরের রূপ।

যে মন স্থায়িত্ব খোঁজে, অতি দ্রুত সেই মন নদীর ধারের ঐ ডোবাটার মতোই বদ্ধ হয়ে যায়। তাতে আবর্জনা জমতে থাকে, তা নষ্ট হতে থাকে। কিন্তু যে মনের চারিদিকে কোনো দেওয়াল নেই, যার কোনো চৌকাঠ নেই-কোনো বন্ধন নেই-কোনো আশ্রয় নেই, যে, জীবনের সাথে বহমান, অবিরাম এগিয়ে চলেছে, খুঁজছে, সকল তটকে অতিক্রম করছে— সেই মনই আনন্দিত, চিরনতুন। তার কারণ সেই মন স্বয়ং সৃজনশীল।

আমি কী নিয়ে কথা বলছি সেটা কি তোমরা বুঝতে পারছো?

তোমাদের বোঝা উচিত, কারণ এগুলো সত্যকার শিক্ষার অঙ্গ। এগুলো উপলব্ধি করলে তোমাদের জীবনেই এক পূর্ণ রূপান্তর আসবে। তোমরা তোমাদের সাথে পৃথিবীর, তোমাদের প্রতিবেশীর, তোমাদের স্বামীর, স্ত্রীর— তথা সকল সম্পর্কের এক ভিন্ন অর্থ খুঁজে পাবে। যখন দেখতে পাবে অন্য কিছু দিয়ে নিজেকে পরিপূর্ণ করার ইচ্ছা বা তার জন্য চেষ্টা আসলে দুঃখ-যন্ত্রণাকে নিমন্ত্রণ করা, তখন তোমরা আর সেই পথে চলবে না। এইসব তোমাদের শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা কোরো, তোমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা কোরো। যদি ঐ সব কিছুকে উপলব্ধি করো, দেখবে তোমরা জীবনের সত্যমূল্যকে আবিষ্কার করছো। সেই আবিষ্কারে, সেই বোধের মধ্যেই এক অপরিমিত প্রেম ও সৌন্দর্য রয়েছে, শুদ্ধ করুণার প্রস্ফুটন রয়েছে। কিন্তু যে মন ঐ বদ্ধ জলাশয়ের সুরক্ষা, তার স্থিরতা চায়, শীঘ্রই তা অন্ধকার আর আবর্জনার আস্তাকুঁড় হয়ে ওঠে। মন এমন কোনো জায়গায় একবার বদ্ধ হয়ে গেলে, সে আবার নতুন যাত্রায়, নতুন করে খোঁজায়, আবিষ্কারে ভয় পায়। কিন্তু সত্যই বলো, আর ঈশ্বর বা পরম— যাই বলো, তা সকল বদ্ধতার অতীত।

তোমরা কি জানো ধর্ম কী? ধর্ম কিন্তু মন্ত্র উচ্চারণ, বা পূজা বা কিছু আচার-অনুষ্ঠান, টিন বা পাথরের বিগ্রহকে আরাধনা করা নয়। ধর্ম মন্দিরে, চার্চের মধ্যে অথবা বাইবেল বা গীতা পাঠের মধ্যেও নেই। এটা কোনো পবিত্র নাম বার বার উচ্চারণ বা মানুষের তৈরী অন্য কোনো কুসংস্কারও নয়।

ধর্ম হলো এক করুণার, এক প্রেমের, এক কল্যাণময়তার অনুভূতি। সেই অনুভূতি নদীর মতো প্রাণে পূর্ণ, গতিতে চঞ্চল, প্রবাহে নিরবচ্ছিন্ন। এমনই এক অবস্থায় দেখবে তুমি আর কিছু খুঁজছো না; এই খোঁজের, এই চাওয়ার অবলোপে সম্পূর্ণ নতুন কিছুর আগমন ঘটে। ঈশ্বরের, সত্যের অন্বেষণ, করুণার অনুভূতি (অবশ্যই চর্চা করা করুণা বা নম্রতা

নয়), মনের সকল চতুরতার অতীত, সকল বর্ণনার অতীত যা— তার উপলব্ধি, তাতে বাঁচা, তা হওয়াই হলো সত্যকার ধর্ম। আর যখন তুমি তোমার নিজের খোঁড়া ডোবাটি ছেড়ে জীবনের নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়বে তখনই তা সম্ভব হবে। তখন জীবন তার এক অদ্ভুত পথে তোমার যত্ন নেবে, তোমায় পালন করবে, তার মূল কারণ তুমি তোমার দিক থেকে সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছো। জীবন তখন যেখানে চাইবে, সেখানেই তোমায় নিয়ে যাবে, কারণ তুমি তার অংশ হয়ে গেছো। তখন সুরক্ষার সমস্যাও নেই, লোকের বলা না বলার অর্থও নেই, তখন তুমি এইসব কিছুর অতীত এবং এটাই জীবনের সৌন্দর্য।

প্রশ্নকারী ঃ *আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই কেন?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ তোমার কি মনে হয় যে পাতা মাটিতে ঝরে পড়লো সে মৃত্যুকে ভয় পায়? তোমার কি মনে হয় একটা পাখী মৃত্যুভয় নিয়ে বাঁচে? যখন মৃত্যু তার সামনে আসে— তখনই তার সাথে ঐ পাখীর দেখা হয়, নয়তো পাখীতো বেঁচে থাকা নিয়েই মশগুল। কোথাও পোকা ধরছে, কোথাও বাসা বাঁধছে, কোথায় বসে বসে গান গেয়েই চলেছে, কখনও-বা মুক্ত আকাশে ওড়ার আনন্দেই উড়ছে। কোনোদিন অনেক উঁচুতে পাখীকে দেখেছো, একেবারে ডানা সোজা করে একটুও না নাড়িয়ে, হাওয়ার গতির সাথে বয়ে চলেছে? নিজেদের নিয়ে কি অনিঃশেষ আনন্দের উৎসবে তারা মেতে থাকে। মৃত্যুর কোনো ছায়াই তাদের মধ্যে দেখা যায় না। যদি মৃত্যু আসে সেখানেই তাদের জীবনের প্রবাহে পূর্ণচ্ছেদ পড়লো, এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। কী ঘটবে সে নিয়ে তাদের কোনো উৎসাহ নেই; একেবারে মুহূর্তের হাত ধরেই তাদের বাঁচা, নয় কি? আমরা মানুষেরাই কেবল মৃত্যু নিয়ে ভারাক্রান্ত— কারণ আমরা বাঁচি না। সমস্যা এখানেই— আমরা আসলে

প্রতিদিন মরছি, আমরা বাঁচছি না। বৃদ্ধরা কবরের একেবারে পাশে ঘোরাঘুরি করে আর তরুণেরাও খুব একটা দূরে নেই।

মৃত্যু সম্পর্কে আগে থেকেই একটা ধারণা রয়েছে। আমরা, আমাদের পরিচিত সব কিছু ও সারাজীবনের সংগ্রহকে ছেড়ে যেতে হবে বলে ভয় পাই। আমরা আমাদের স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু-বান্ধব, আমাদের শেখা বিদ্যা, আমাদের জমানো সব কিছুকে ছেড়ে চলে যেতে হবে— এই ভয়ে আমরা শিউরে উঠি। যদি আমরা আত্মীয়-বন্ধু-জিনিসপত্র-গুণ-চরিত্র এইসব কিছুকে মৃত্যুর পরেও সঙ্গে রাখতে পারতাম, তাহলে কি মৃত্যুকে ভয় পেতাম? এই কারণেই আমরা মৃত্যু সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করি, মৃত্যুর পরের ব্যাপার নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করি। কিন্তু বাস্তব সত্যটা হলো মৃত্যু একটা সমাপ্তি, আর আমরা অধিকাংশই কিছুতেই এই সত্যটার মুখোমুখি হতে চাই না। আমরা আমাদের পরিচিতটাকে ছাড়তে চাই না, প্রাণপণে তাকে জাপটে ধরে থাকি। এই পরিচিতকে যেকোনো মূল্যে আঁকড়ে ধরে থাকাই ভয়ের সৃষ্টি করে; যা জানি না, যা অপরিচিত তা কখনো ভয়ের সৃষ্টি করে না। মৃত্যুর পরের সেই অজানাকে তো আমাদের এই জ্ঞাত সব কিছু দিয়ে বা পরিচিত দিয়ে কোনোভাবেই জানা যাবে না। আসলে অসংখ্য ছোটো-বড়ো জানা দিয়ে, পরিচিত দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে যে মন তৈরী, সে বলে 'আমি তো শেষ হয়ে যাবো'। সেই শেষ হয়ে যাবার ভয়ে সে ভীত।

যদি প্রতি মুহূর্তে বাঁচতে পারো, আগামীকালের সম্পর্কে কোনো চিন্তা না করো— এর অর্থ কিন্তু আজকের কিছু উপরভাসা জিনিস নিয়ে ব্যাপৃত থাকলে এমন নয়, বরং তোমাদের মধ্যের যে জানা সব কিছু, যা পরিচিত তথা মনে সঞ্চিত সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব, তাদের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অর্থাৎ তাদের সম্পর্কিত সব কিছুর ব্যাপারে যদি সচেতন হও এবং তাই সেইসব অতীত জ্ঞানকে, সেই পরিচিতকে অনায়াসে

বিসর্জন দিতে পারো, তবে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে শুরু করে। একদিন করে দেখো— যা পরিচিত তথা যা জ্ঞান রূপে মনে জমা আছে, তাকে সরিয়ে রাখো, তাকে একদিনের জন্য ভুলে যাও; দেখবে কী ঘটে। তোমার মনের চিন্তার ভারকে দিন থেকে দিনে, ঘন্টা থেকে ঘন্টায়, মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে বয়ে নিয়ে যেও না। তাদের ভেসে যেতে দাও, দেখবে সেই মুক্তি এক অভাবনীয় জীবনের উৎস মুখ খুলে দিয়েছে। আর সে প্রবাহে জীবন, মৃত্যু দুইই আছে। মৃত্যু তো কোনো কিছুর সমাপ্তি, আর সেই সমাপ্তিতেই রয়েছে নতুন সূচনা, আবার নতুন করে ভরে ওঠা।

প্রশ্নকারী ঃ *এটা বলা হয় আমাদের মধ্যে এক স্থায়ী, এক শাশ্বত সত্য রয়েছে। আমাদের এই ক্ষণিকের জীবনে কী করে সেই চিরন্তন সত্য থাকতে পারে?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ দেখেছো সত্যকেও আমরা কেমন স্থায়ী বানিয়ে ফেলেছি। সত্যি কি সত্য স্থায়ী? যদি তাই হয় তাহলে এটা সময়ের পরিসরের মধ্যের কোনো কিছু। যখনই বলো কোনো কিছুর চিরস্থায়িতা রয়েছে, তার অর্থ তার একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে। সেটা কিন্তু 'সত্য' নয়। এখানেই সত্যের সৌন্দর্য ঃ প্রতিক্ষণে তাকে আবিষ্কার করতে হয়। এ কিন্তু জানা হলো, মনে রয়ে গেলো এমন নয়। স্মৃতিতে রাখা যায় যে সত্য— তা মৃত। একে প্রতিক্ষণে আবিষ্কার করতে হবে, কারণ এ জীবন্ত, এ চিরনতুন। সত্য সর্বদা সেটাই, কিন্তু প্রতিবার তোমাকে নতুন করে তা আবিষ্কার করতে হবে।

যা প্রয়োজন তা হলো— সত্য চিরন্তন বা আরো অনেক তত্ত্ব, সত্য সম্পর্কে তৈরী না করা। ওগুলো জীবন এবং মৃত্যু দুই সম্পর্কেই ভীত কিছু বৃদ্ধদের আবিষ্কার। সত্য অনন্তস্থায়ী, তোমরা অমর আত্মা সুতরাং ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই— এইসব তত্ত্বের প্রণেতা

কিছু ভীত ব্যক্তি যাদের মন প্রাণ-নিঃস্ব, যাদের দর্শনগুলোর কোনো যথার্থতা নেই। বাস্তবে সত্য হল জীবন, আর জীবন অস্থায়ী, অস্থির। জীবনের সম্পর্কে আগে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে হবে না, একে কেবল মেনে নিলেই হবে না। দিন প্রতিদিন, ক্ষণ প্রতিক্ষণ এর খোঁজ চালাতে হবে, একে আবিষ্কার করতে হবে। যদি ধরেই নাও তোমরা জীবনকে বুঝে গেছো, জেনে গেছো, তাহলে তোমরা বাঁচছোই না। তোমাদের সারাদিনের তিনবার খাওয়া, পোশাক, একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়, যৌনসুখ, তোমাদের চাকরি, তোমাদের আমোদ-আহ্লাদ, তোমাদের চিন্তা-প্রক্রিয়া— এইসব কিছুর স্থূল পুনরাবৃত্তিই জীবন নয়। জীবনকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে হয়। যদি না— হারাতে থাকো, যা যা পেয়েছো তার বিসর্জন দিতে থাকো— তাহলে সে আবিষ্কার কখনই সম্ভব নয়। একবার আমি যেটা বলছি নিজ জীবনে পরীক্ষা করে দেখো। তোমাদের দর্শন, ধর্ম, রীতিনীতির বাঁধন, জাতিগত শোভনতা-অশোভনতা, ভুল-ঠিকের আবর্জনাকে সরিয়ে দাও, কারণ ওগুলো জীবন নয়। যদি এই সবের জালে আটকে পড়ো, কোনোদিন জীবনকে আবিষ্কার করতে পারবে না। আর জীবনকে খুঁজতে তোমাদের সহায়তা করাই শিক্ষার কাজ।

যে ব্যক্তি বলেন তিনি জানেন, আসলে তিনি মৃত। কিন্তু যিনি ভাবেন 'আমি জানি না'; খোঁজেন, আবিষ্কার করেন, যিনি কোনো পরিণামের আশায় খুঁজছেন না, তাঁকে কিছু হতে হবে বা তাঁকে কোথাও একটা পৌঁছোতে হবে— এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাবছেন না, এমন একজন মানুষই আসলে বাঁচছেন এবং এই বাঁচাটাই হলো সত্য।

প্রশ্নকারী ঃ *পূর্ণতা সম্পর্কে কী আমাকে কোনো ধারণা দিতে পারেন?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ সম্ভবত পেতে পারো। কিছু অনুমান, কিছু অনুসন্ধান, কিছু কল্পনা মিশিয়ে, 'এটা কদর্য, ঐটা নিখুঁত, সম্পূর্ণ' এইসব বলে পূর্ণতা

সম্পর্কে ধারণা করতে পারো। কিন্তু পূর্ণতা সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা, তোমাদের ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণার মতোই— তার কোনো অর্থ নেই। পূর্ণতা হলো এমন এক ক্ষণে বাঁচা যে ক্ষণটা সম্পর্কে কোনো কিছু আগে থেকে ধারণা করে নেওয়া হয়নি অর্থাৎ অপরিকল্পিতপূর্ব কোনো ক্ষণে বাঁচা এবং সে ক্ষণের কোনো ধারাবাহিকতাও নেই। সে ক্ষণের কোনো স্থায়িত্ব নেই। তাই পূর্ণতা সম্পর্কে কোনো কিছুই আগে থেকে চিন্তাভাবনা করা বা ধারণা গড়া যাবে না, আর একে স্থায়ী করারও কোনো পথ নেই। একমাত্র গভীরভাবে যে মন শান্ত, যে মন আগে থেকেই ধারণা গড়ে নিচ্ছে না বা কোনো কল্পনা করে নিচ্ছে না, সেই মনই এই পূর্ণতার মুহূর্তকে অনুভব করতে পারে। সে মুহূর্ত নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ।

প্রশ্নকারী ঃ *যে ব্যক্তি আমাদের আঘাত করে তাকে প্রত্যাঘাত করে আমরা প্রতিশোধ নিতে চাই কেন?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ এটা জীবিত থাকার জন্য সহজ প্রবৃত্তির পরিণাম, তাই নয় কি? কিন্তু কোনো বোধসম্পন্ন মন, যে মন সজাগ, যে গভীরভাবে এ ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছে তার মধ্যে প্রত্যাঘাতের কোনো ইচ্ছাই থাকে না। ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয় যে সে কোনোভাবে ধার্মিক হওয়ার বা ক্ষমা করা অভ্যাস করছে। একেবারেই সেটা নয়। আসলে সে পরিষ্কার দেখতে পায় প্রত্যাঘাত মূঢ়তা, এর আদপেই কোনো মূল্য নেই। কিন্তু এটা বুঝতে গেলে ধ্যানের প্রয়োজন।

প্রশ্নকারী ঃ *আমি অন্যকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করতে মজা পাই, কিন্তু আমাকে নিয়ে কেউ সেটা করলে ভারী রাগ হয়।*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ আমার মনে হয় বয়স্ক ব্যক্তিদের বেলাও এই একই কথা খাটে। আমরা অন্যকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চাই,

কিন্তু অন্যে যখন আমাদের ব্যবহার করে আমরা একেবারেই তা মেনে নিই না। অন্যকে আঘাত করা, দুঃখ দেওয়া বা বিরক্ত করা একেবারে বিবেচনাহীন, বলতে পারো সহানুভূতিহীন অবস্থা, তাই নয় কি? এটা আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে আসে। দেখো, তুমিও চাওনা, তোমাকে নিয়ে কেউ পরিহাস করুক, তোমার পাশের মানুষটাও তা চায় না। কেন দুজনেই এটা বন্ধ করে দিচ্ছ না? এর মানে হলো বিবেচক হতে হবে।

প্রশ্নকারী ঃ *মানুষের কাজ কী?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ মানুষের কাজ কী, এ ব্যাপারে তোমার কী মনে হয়? পড়াশুনা করা, পাশ করে যাওয়া, একটা চাকরি পাওয়া এবং সেটাই সারাজীবন করে যাওয়া? অথবা মন্দিরে যাওয়া, কোনো দলে যোগ দেওয়া, সাহস করে অনেকগুলো সংস্কার করে ফেলা— এটাই কি তাদের কাজ? নাকি মানুষের কাজ নিজের খাদ্যের জন্য অন্যান্য পশুকে হত্যা করা? অথবা ট্রেন পেরোতে পারবে বলে সেতু বানানো, তেল পেলেও পাওয়া যেতে পারে বলে কোনো শুষ্কদেশে মাটি খোঁড়া, পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত জয় করা, আকাশকে জয় করা, কবিতা লেখা, ছবি আঁকা, প্রেম করা, ঘৃণা করা— এগুলোই কি মানুষের কাজ? যে সভ্যতা কয়েক শতাব্দীতেই ভেঙ্গে পড়বে তার নির্মাণ, যুদ্ধের দামামা বাজানো, নিজের আদলে নিজের কল্পনার ঈশ্বর তৈরী করা, রাষ্ট্র বা ধর্মের নাম নিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা, একদিকে শান্তি সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলা আর অন্যদিকে ক্ষমতা দখলের জন্য বল প্রয়োগ করা, অন্যের প্রতি নৃশংস হওয়া— এটাই তোমাদের চারিপাশে মানুষ করছে। এখন তোমাদের প্রশ্ন করি— এটাই কি মানুষের কাজ?

এটা যে কেউই সহজে দেখতে পায় যে এইসব কাজ মানুষকে

ধ্বংস, দুর্গতি, বিশৃঙ্খলা আর নৈরাশ্যের গ্রাসে নিয়ে যায়। একদিকে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য তার ভোগবিলাস, তারই পাশে চরম দারিদ্র ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে থাকে; একদিকে রোগ, ক্ষুধা অন্যদিকে রেফ্রিজারেটর, জেটপ্লেন। এই সবই মানুষের কীর্তি। এখন বলো যখন তোমরা এই সব দেখো তখন কি প্রশ্ন জাগে না 'এই কী সব, মানুষের সত্যকর্ম বলে কি আর কিছুই নেই'? মানুষের সত্যকর্ম কী তা খুঁজে বার করতে পারলে, তখন জেট-বিমান, ওয়াশিং-মেসিন, ফ্রিজ, হোস্টেল এইসবের এক ভিন্ন অর্থ দেখা দেয়। কিন্তু সেই সত্যকর্মকেই খুঁজে বার করতে না পারলে, এই সংস্কারসাধনে মেতে ওঠা, আগে যা যা করা হয়েছে, তারই একটু অদল-বদল করা তোমাদের কোনোদিকেই নিয়ে যায় না।

তাহলে এখন প্রশ্ন হলো মানুষের সঠিক কর্ম কী? তার সেই কাজ হলো— সত্যকে খোঁজা, ঈশ্বরকে খোঁজা, ভালোবাসা এবং কোনোভাবেই আত্মকেন্দ্রিক কাজের জালে জড়িয়ে না পড়া। এই সত্যের খোঁজের মধ্যে, তা আবিষ্কারের মধ্যেই প্রেম জন্ম নেয়। মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যের সেই প্রেম এক ভিন্ন সভ্যতা এক নতুন পৃথিবী গড়ে তোলে।

প্রশ্নকারী ঃ *আমরা ঈশ্বরের পূজা করি কেন?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ আমার মনে হয় আমরা ঈশ্বরের পূজা করি না। আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি না; যদি বাসতাম তাহলে এই পূজাপাঠ নামক জিনিসটারই অস্তিত্ব থাকতো না। আমরা ঈশ্বরকে ভয় পাই, তাই তার পূজা করি। ঈশ্বরের জন্য আমাদের হৃদয়ে ভয় আছে, প্রেম নেই। ঐ মন্দির, ঐ পূজা, ব্রাহ্মণের পৈতে ওগুলো ঈশ্বর নয়; ওগুলো মানুষের অহংকার আর ভয়ের চিহ্ন। অসুখী আর ভীত মানুষই ঈশ্বরের পূজা করে। যাঁদের ঢের অর্থ, প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতা আছে তাঁরা

কিন্তু সুখী মানুষ নন। আর যে মানুষ উচ্চাকাঙ্ক্ষী সে তো সবচেয়ে অসুখী মানুষ। যখন তুমি এইসব কিছু থেকে মুক্ত, তখনই সুখ আসে, আনন্দ আসে, তখন ঈশ্বরকে পূজো করার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। দুখী, অত্যাচারিত, ক্লিষ্ট, হতাশ মানুষ মন্দিরের রাস্তায় হামাগুড়ি দেয়। যদি তাঁরা এই পূজার পরিশ্রম সরিয়ে রেখে তাঁদের দুর্গতি তাঁদের দুর্দশাকে বোঝার চেষ্টা করেন, তাঁরা সুখী হবেন, আনন্দিত হবেন। আসলে তখনই তিনি সত্যকার ঈশ্বর কী, সত্য কী— তা আবিষ্কার করবেন।

১৮

মনোযোগ

মন্দিরের ঘন্টাকে কোনোদিন গভীরভাবে শুনেছো? এখন তোমরা কোনটা শুনছো? ধ্বনিগুলো, নাকি তাদের মধ্যের স্তব্ধতা? যদি এই স্তব্ধতা না থাকতো তাহলে কি ধ্বনিগুলো থাকতে পারতো? যদি স্তব্ধতাকে শোনো, তবে কি ধ্বনি আরো গভীর, আরো ভিন্ন মাত্রা নিয়ে আসে না? কিন্তু দেখবে আমরা কোনো কিছুর উপর সত্য মনোযোগ খুব কমই দিই। আমার মনে হয় এই সত্য মনোযোগ দেওয়া কী সেটা খুঁজে বার করা সত্যিই প্রয়োজন। যখন তোমাদের কোনো শিক্ষক অঙ্কের কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছেন, যখন তোমরা ইতিহাস পড়ছো, যখন কোনো বন্ধু কথা বলছে বা তোমাকে কোনো গল্প বলছে, যখন তুমি কোনো নদীর কাছে আছো এবং তার তীরে আছড়ে পড়া ছোটো ছোটো ঢেউয়ের শব্দ শুনছো— তখন সাধারণত তোমরা খুবই কম মনোযোগ দাও। এখন যদি আমরা এই মনোযোগ দেওয়ার অর্থ কী সেটা খুঁজে বার করতে পারি তাহলে শেখারও একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বেরোবে এবং শেখাটাও অনেক সহজ হয়ে যাবে।

ক্লাসে যখন কোনো শিক্ষক মনোযোগ দিতে বলেন তার অর্থ কী? তিনি চান তোমরা যেন জানালার বাইরে না তাকাও এবং সমস্ত কিছু থেকে মনোযোগ সরিয়ে এনে যা পড়ছো তার প্রতি

একাগ্র হও। অথবা ধরো নিবিষ্ট হয়ে কোনো উপন্যাস পড়ছো, তাতেই সমস্ত মন কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে, তখন বাইরের কোনো কিছুতেই কোনো উৎসাহ নেই। এটা আবার এক অন্যপ্রকারের মনোযোগ। সুতরাং সাধারণ অর্থে মনোযোগ দেওয়া হলো এমন একটা প্রক্রিয়া যাতে মনকে সংকুচিত করা হয়, তাই নয় কি?

আমার মনে হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের একপ্রকারের মনোযোগ রয়েছে। সাধারণত যে মনঃসংযোগের কথা বলা হয় বা যার অভ্যাস করা হয় সেটা হলো মনকে সংকুচিত করে বা তাকে সংকীর্ণ করে তাকে একটা বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করা। এটা এমন একটা প্রক্রিয়া যাতে অনেক কিছুকে বর্জন করা হয়। যখন তুমি মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করো আসলে তোমরা নিজেদের কোনো ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করো। সেটা জানালা দিয়ে বাহিরে দেখার ইচ্ছা অথবা কে ভিতরে এলো তা দেখার ইচ্ছা— এমন আরো অসংখ্য কিছু হতে পারে। এইভাবেই এই প্রতিরোধের ফলে তোমাদের শক্তির কিছুটা অংশ নষ্ট হয়ে যায়। তোমরা যাতে কোনো একটা বিষয়ে মনকে সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত করতে পারো তারজন্য মনের চারিদিকে একটা প্রাচীর গড়ো, এবং তোমরা তাকে বলো একাগ্রতার জন্য মনের অনুশীলন। যে বিষয়ে তোমরা মনঃসংযোগ করতে চাও সেটা বাদ দিয়ে আর সব চিন্তাকে মন থেকে সরিয়ে দিতে চাও। মনঃসংযোগ বলতে লোকে সাধারণত এটাকেই বোঝায়। আমার মনে হয় আর এক ধরণের মনোযোগ আছে। সেটা মনের এমন এক অবস্থা যাতে কোনো কিছুকে বর্জন করা নেই, কোনো চিন্তাকে বা কিছুকে বাধা দেওয়া নেই অর্থাৎ কোনো প্রতিরোধ বলে কিছুর অস্তিত্বই নেই। এই অবস্থায় মন অনেক অনেক বেশী মনোযোগ দিতে সমর্থ। এই যে মনের অবস্থার কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ যেখানে কিছুর প্রতিরোধ নেই, তেমন মনোযোগ কিন্তু কোনো কিছুতে নিবিষ্ট হওয়া বা মগ্ন

হওয়ার যে মনোযোগ (attention of absorption) তার থেকে একেবারে পৃথক।

আমি যে মনোযোগের কথা বলতে চাইছি সাধারণত মনোযোগ বলতে যা বোঝায় তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কিছু। সেই মনোযোগ যেহেতু কোনো কিছুকেই বর্জন করে না তাই তারমধ্যে এক মহান সম্ভবনা থেকে যায়। যখন তোমরা কোনো একটা বিষয়ে, বক্তৃতায়, কথোপকথনে মনঃসংযোগ করো, তখন অন্য চিন্তা যা প্রবেশ করতে চেষ্টা করে তাকে আটকাবার জন্য তোমরা সচেতনভাবেই হোক বা অচেতনভাবেই হোক একটা প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তোলো। সুতরাং যে বিষয়টায় মনঃসংযোগ করতে চাইছো সেখানে সম্পূর্ণভাবে মন থাকে না, আংশিকভাবে থাকে। কারণ, যতই না তোমরা পূর্ণরূপে মনঃসংযোগ করতে চাও, মনের একটা অংশ-তো সবসময়ই অন্য বিষয়ের চিন্তার অনুপ্রবেশকে বাধা দিতে চাইছে, মনের কোনো বিক্ষেপ রোধ করতে চাইছে।

অন্যদিক থেকে ব্যাপারটা শুরু করা যাক। তোমরা কি বিক্ষেপ (distraction) কী তা জানো? ধরো, যেটা পড়ছো সেটাতে তোমরা মনোনিবেশ করতে চাও, হঠাৎ বাইরে একটা শব্দ হলো, তোমরা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে। এভাবে তোমাদের মন বিক্ষিপ্ত হলো। যখন কোনো কিছুতে মনঃসংযোগ করতে চাও তখন মন অন্য কোথাও ঘুরে বেড়ায়, এই ঘুরে বেড়ানোকে মনের বিক্ষেপ বা বিচলন বলা হচ্ছে। এখন মনের একটা অংশ এই বিচলনকে আটকাবার চেষ্টা করে, তাই স্বভাবতই সেখানে শক্তি ক্ষয় হয়। কিন্তু যদি তোমরা মনের প্রত্যেক ক্রিয়া বা তার গতি-প্রকৃতির ব্যাপারে প্রত্যেক মুহূর্তে সচেতন থাকো, তাহলে সেখানে বিক্ষেপ বলে কিছু থাকে না, মনের কোনো শক্তিও— প্রতিরোধের কারণে ব্যয় হয় না। সুতরাং সত্য মনোযোগ কী তা খুঁজে বার করা খুবই জরুরী।

যদি মন্দিরের ঐ ঘন্টা ধ্বনি এবং সেই ধ্বনির মাঝে যে স্তব্ধতা এই দুইই শোনো— এই সম্পূর্ণ শোনাটা হলো মনোযোগ। ঠিক তেমনভাবেই যখন কেউ কথা বলছে, মনোযোগ দেওয়ার অর্থ হলো কেবল তার ঐ শব্দগুলোই শোনা নয়, তাদের মধ্যের যে নৈঃশব্দ্য তাকেও শোনা। একবার পরীক্ষা করে দেখলে বুঝতে পারবে মন কোনো বিক্ষেপ, কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারে। কিন্তু 'আমার জানালা দিয়ে দেখাটা উচিত নয়, যে ভিতরে আসছে আসুক, আমার তাকানো উচিৎ নয়, যদিও আমি এখন অন্য কিছু করতে চাই, তবুও আমার একাগ্র হওয়া উচিৎ', এইসব বলে যদি মনকে অনুশাসিত করতে চাও, তখন এটা একটা বিভেদ সৃষ্টি করে, (যাতে মন দিতে চাও এবং যাতে মন দিতে চাও না) যাতে মনের শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু সমগ্রটাকে যদি শোনো, তখন বিভাজন থাকে না, কোনো কিছুকে প্রতিরোধ করাও সেখানে থাকে না। তখন দেখবে মন কোনো চেষ্টা ছাড়াই পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারে। তোমরা কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? আমি যেটা বলতে চাইছি তোমাদের কি পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পেরেছি?

মনোযোগের জন্য মনকে অনুশাসিত করা হলো মনের শক্তির ক্ষয় করা। অবশ্যই এর অর্থ এই নয় মন বানরের মতো যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবে। কোনো কিছুতে মগ্ন হওয়ার কারণে যে মনঃসংযোগ, তা-ছাড়া আমরা ঐ দুরকম অবস্থার কথা জানি। হয় আমরা মনকে কঠোর অনুশাসনের মধ্যে রাখি যাতে মনের কোনো বিচলন না ঘটে অথবা মনকে একটা ব্যাপার থেকে আরও একটা ব্যাপারে ঘুরে বেড়াতে দিই। আমি যে মনোযোগের কথা বলছি তা কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে কোনো পারস্পরিক বোঝাপড়া বা এই দুইকে মিলিয়ে মিশিয়ে কিছু একটা, এমন নয়। অন্যভাবে বলতে গেলে এগুলোর সাথে ঐ মনোযোগের কোনো সম্পর্কই নেই। এই

মনোযোগ হলো এক সম্পূর্ণ সজাগতা, কোনোরকম প্রতিরোধ বা বর্জনের প্রক্রিয়ার মধ্যে না গিয়ে মন প্রতিক্ষণে সচেতন।

যেটা বলছি করে দেখো— দেখবে কতো তাড়াতাড়ি মন শিখছে। কোনো একটা সঙ্গীত বা সুর শোনো, মনকে তার দ্বারা এমনই পূর্ণ হতে দাও যে সেখানে শিখবার জন্য কোনো প্রচেষ্টাই থাকবে না। ধরো কোনো শিক্ষক কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত করছেন। যদি শুনতে জানো তবে সেখানে কোনো কিছুকে প্রতিরোধ করা থাকে না অর্থাৎ মনে সেই ফাঁকা স্থান (Space) এবং নীরবতা আছে এবং মনের কোনো বিক্ষেপ নেই। তাহলে শুধু যে ঐ ঐতিহাসিক ঘটনার সম্পর্কেই সচেতন হবে তা নয়, এই ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় সেই শিক্ষক কোথায় পক্ষপাতিত্ব করছেন এবং এইসব কিছুর প্রতি তোমাদের আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াই-বা কী— তার ব্যাপারেও সচেতন হতে পারবে।

এই যে ফাঁকা বা মুক্ত স্থানের (space) কথা বলছি সেটা নিশ্চয়ই জানো। এই ঘরের মধ্যে একটা খালি জায়গা আছে (যেটা কিছু দিয়ে ভর্তি নয়)। এখান থেকে তোমাদের হোস্টেলের বা ব্রীজ থেকে তোমাদের বাড়ী বা নদীর দুটো তীরের মধ্যের যে ফাঁকা জায়গা, এগুলো সেই সব পরিসর (space) যার কথা আমি বলছি। তোমাদের মনেও কি এমনই ফাঁকা স্থান আছে? নাকি মনে সবসময় সব কিছু এতো ভিড় করে থাকে, কোনো ফাঁকা স্থানই নেই, কোনো অবকাশই নেই। যদি মনে সেই মুক্ত স্থান, সেই অবকাশ থাকে তবে সেখানে নীরবতা থাকে। সেই নীরবতা থেকে অন্য সব কিছু আসে। তখন তুমি শুনতে পারো, কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারো। এইজন্য মনে সেই মুক্ত স্থান, সেই অবকাশ খুবই প্রয়োজন। যদি মনে সবসময় অসংখ্য কিছুর কোলাহল না থাকে, মন যদি সবসময়ই ব্যস্ত না থাকে, তাহলে তুমি দূরে ঐ যে কুকুরটা

ডাকছে, অনেক দূর দিয়ে যে ট্রেন চলে যাচ্ছে— সেই-সব কিছু শুনতে পাবে আর এখানে একজন মানুষ কী বলছে সে ব্যাপারেও পূর্ণভাবে সচেতন থাকবে। তখন তোমাদের মন মৃত নয়, জীবন্ত।

প্রশ্নকারী ঃ *কাল সভা ভেঙ্গে যাবার পর আমরা দেখলাম আপনি অতি গরীব কৃষকের দুই ছেলে, যারা রাস্তার ধারে খেলছিল তাদের দেখছেন। ওদের দিকে যখন দেখছিলেন তখন আপনার মনে কী অনুভূতি আসছিল একটু বলবেন?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ কাল বিকালে বেশ কয়েকজন ছাত্রের সাথে আমার রাস্তায় দেখা হয়েছিল। তাদের ছেড়ে এগিয়েছি, দেখলাম আমাদের মালীর দুই ছেলে খেলছে। প্রশ্নকারী জানতে চায় যখন আমি ঐ বাচ্চাগুলোকে দেখছিলাম, আমার অনুভূতি কী ছিল?

এখন তোমাদের জিজ্ঞাসা করি যখন তোমরা দুঃস্থ বাচ্চাদের কোথাও দেখো, তোমাদের কী অনুভূতি হয়? আমার মনে হয়, আমি কী অনুভব করেছিলাম সেটার থেকেও এটা খুঁজে বের করা অনেক বেশী জরুরী। নাকি তোমরা তোমাদের হোস্টেলে ফিরে যেতে বা ক্লাসে যেতেই এতো ব্যস্ত যে এদের দিকে তাকাবারও কোনো সময় নেই?

যখন তোমরা কোনো দরিদ্র মহিলাকে বিরাট বোঝা নিয়ে বাজারের দিকে যেতে দেখো অথবা চাষীর ছেলেরা ধুলো-কাদায় মাখামাখি হয়ে খেলছে, যাদের কাছে কিছু নিয়ে খেলবার মতো কোনো সামগ্রীই প্রায় নেই, যারা তোমাদের মতো শিক্ষা পাচ্ছে না, যাদের ঠিক মতো থাকার আশ্রয় নেই, পরিচ্ছন্নতার কোনো বালাই নেই, যাদের গায়ে যথেষ্ট পোশাক নেই, পেটে প্রয়োজনীয় খাদ্য নেই— এইসব কিছুকে দেখো, তখন তোমাদের প্রতিক্রিয়া কী? এটা খুঁজে বার করা খুবই জরুরী, এবার আমি আমার অনুভূতিটার কথাটা বলবো।

এই বাচ্চাদের একটু ভালোভাবে ঘুমানোর পর্যন্ত জায়গা নেই, তাদের বাবা-মায়েরা সারাদিন পরিশ্রম করেন, তাঁদের জীবনে— ছুটি কী তাঁরা তা কোনোদিন জানেন না, এইসব বাচ্চারা কোনোদিন জানবে না ভালোবাসা পাওয়া কী, একটু যত্ন পাওয়া কী, কোনোদিন তাদের বাবা-মায়েরা তাদের কাছে বসে এই পৃথিবীর সৌন্দর্য, এই আকাশের সৌন্দর্যের গল্প বলবে না। এবার বলোতো এটা কী ধরণের সমাজ যা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। একদিকে অসম্ভব ধনীরা রয়েছে যাঁরা এই পৃথিবীর যা চায় সব তাঁদের হাতের মুঠোয়, আর অন্যদিকে এই দরিদ্রের সন্তান-সন্ততি যাদের কিছুই নেই? তোমরা হয়তো বিপ্লব আনলে সমাজের কাঠামোকে ভেঙ্গে-চুরে দিলে। কিন্তু যা নতুন করে গড়বে তার মধ্যেও সেই সরকারের প্রতিনিধি, তাঁদের বাংলো, তাঁদের সুযোগ-সুবিধা, তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ— এসবের ধারা চলতেই থাকবে। প্রত্যেক বিপ্লবের পরে শেষ পর্যন্ত এইটাই ঘটেছে। সে ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব বা চীনের বিপ্লব— কোনোটাই এর ব্যতিক্রম নয়। এখন প্রশ্ন হলো এমন এক সমাজ নির্মাণ কী সম্ভব, যাতে এই দুর্নীতি এবং দুর্দশা থাকবে না? এটা তখনই একমাত্র সম্ভব যখন আমরা সমষ্টির এই প্রবাহ থেকে বেরিয়ে আসবো, যখন আমরা উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হবো, যখন ভালোবাসা কী সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারবো। সহসা ওটাই আমার প্রতিক্রিয়া ছিল।

কিন্তু, তোমরা কি আমি যা বলেছি তা শুনেছো?

প্রশ্নকারী ঃ *মন কী করে একই সঙ্গে অনেক জিনিস শুনতে পারে?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ আমি এর কথা কিন্তু বলিনি। এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা একই সঙ্গে অনেকগুলো জিনিসে মনঃসংযোগ করতে পারেন। সেটা মনের একটা বিশেষ প্রকার অনুশীলন থেকে আসে। আমি আদৌ তেমন কিছু বলতে চাইনি। আমি এমন এক মনের কথা

বলছিলাম যে মনের কোনোপ্রকার প্রতিরোধ নেই, সেই মন শুনতে পায়। কারণ এই মনে অবকাশ আছে, ফাঁকা স্থান আছে তথা একেবারে মুক্ত পরিসর আছে, নীরবতা আছে এবং এর থেকেই সকল চিন্তার স্ফুরণ হয়।

প্রশ্নকারী ঃ *আমরা অলসতা ভালোবাসি কেন?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ অলসতাতে দোষের কি আছে? কোথাও স্থির হয়ে বসা, দূর থেকে কোনো শব্দ আরো আরো কাছে আসছে শোনার মধ্যে দোষের কি আছে? অথবা ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে পাশের গাছে একটা ছোট্ট পাখীকে দেখা অথবা কোনো গাছে অন্য পাতাগুলো যখন একেবারে থেমে আছে, মৃদু হাওয়ায় একটা পাতার কেঁপে কেঁপে ওঠাকে দেখার মধ্যে দোষের কি আছে? আসলে আমরা অলসতাকে দোষাবহ বলে মনে করি। দেখা যাক আমরা অলসতা বলতে কী বোঝাতে চাই। হয়তো তোমার ভালো লাগছে, শারীরিকভাবেও তুমি সুস্থ বোধ করছো, তবু বিশেষ সময়ের পরেও তুমি কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে আছো, তখন কিছু লোক তোমাকে অলস বলবে। কখনো তুমি হয়তো তেমন জোর পাচ্ছো না বা অন্য কোনো শারীরিক কারণে খেলতে যেতে বা পড়তে চাইছো না, তখনও লোকে তোমাকে অলস বলবে। কিন্তু আসলে অলসতা কী?

যখন মন নিজের প্রতিক্রিয়াগুলোর ব্যাপারে সচেতন নয়, এর অতি সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলোর ব্যাপারে সজাগ নয়, সেই মন হলো অলস ও অজ্ঞানী। যদি পরীক্ষায় পাশ না করে থাকো, অনেক বই না পড়ে থাকো, যদি তোমার কাছে খুব কম তথ্য থাকে— সেটা কিন্তু অজ্ঞানতা নয়। নিজের সম্বন্ধে কোনো বোধ না থাকা, কী করে নিজের মন ক্রিয়া করে, নিজের উদ্দেশ্যগুলোই-বা কী, নিজের প্রতিক্রিয়াগুলোই-বা কী— সেগুলো না জানাই হলো আসল অজ্ঞানতা।

এইভাবেই মন যখন ঘুমিয়ে থাকে তখনই তা অলস। অধিকাংশ লোকের মনই ঘুমন্ত। অনেক জ্ঞান, শাস্ত্র, শঙ্করাচার্য বা আরো যাঁরা যাঁরা সব আছেন— তাঁরা কে কী বলছেন এসবের নেশায় অধিকাংশ লোকের মন নেশাগ্রস্থ। তাঁরা কোনো একটা দর্শন, কোনো একটা অনুশাসন অনুসরণ করতে থাকেন তখন যে মনের আসলে সমৃদ্ধ হওয়ার কথা, সম্পূর্ণ হওয়ার কথা, নদীর নিজের দুই কূলের সীমা অতিক্রম করার মতো যে মনের নিজের সব সীমা অতিক্রম করার কথা— সেই মন হয়ে যায় মন্থর, সংকীর্ণ, দুশ্চিন্তায় পঙ্কিল। এমন মনই আসলে অলস। যে মন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, হয়তো তা উপরে উপরে খুব সক্রিয়, সর্বদা দৌড়োদৌড়ি করছে, সবসময় সে যা চায় তা পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করছে, কিন্তু সত্য অর্থে সে মন সক্রিয় নয়, কেননা তার সেই উপরের স্তরের নীচেই রয়েছে ভারী হতাশা, এক অন্ধকারময় নৈরাশ্য।

সুতরাং কেউ সত্যিই অলস কিনা সেটা খুঁজে বার করতে গেলে তাকে সত্যি সচেতন হতে হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে। লোকে বলল তুমি অলস আর তুমি তা মেনে নিলে, এমন যেন না হয়। অলসতা ঠিক কী নিজেই খুঁজে বার করো। যে ব্যক্তি অন্যে বললেই মেনে নেয় অথবা সেটাকে অস্বীকার করে, অথবা অন্যকে অনুসরণ করে, যে লোক বিরাট জীবনের স্রোতকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়ে ছোটো একটা আরামের গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যেই রয়ে যায়, সেই লোকটা অলস, তাই তার মনের ক্ষয় হয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি সব কিছুকে লক্ষ্য করে, হয়তো প্রায়ই সে শান্ত হয়ে বসে বসে গাছ, পাখী, লোকজনকে, তারাদের বা কোনো শান্ত নদীকে দেখে, তবু সে ব্যক্তি কিন্তু আসলে কখনোই অলস নয়।

প্রশ্নকারী ঃ *একদিকে আপনি বলেন আমাদের সমাজের বিরুদ্ধে বিপ্লব করা উচিত। একইসঙ্গে এও বলছেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া ঠিক*

নয়। তাহলে সমাজের উন্নতির যে ইচ্ছা সেটা কি উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়?
কৃষ্ণমূর্তি ঃ আমার মনে হয় এই বিপ্লব বলতে আমি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছি, সেটাকে যথেষ্ট যত্নসহকারেই আমি ব্যাখ্যা করেছি। তবুও আমি এখানে আবার দুটো শব্দ নিয়ে আসবো এবং তোমাদের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো। সমাজের ভিতরে থেকে, একে আর একটু উন্নত জায়গায় নিয়ে যাওয়া, এটা ওটা সংস্কার করা, অনেকটা কয়েদিদের কারার প্রাচীরের মধ্যে থেকে বিপ্লবের মতোই। কিন্তু এই বিপ্লব— বিপ্লব নয়, এটা বিদ্রোহ। তোমরা কি দুটোর পার্থক্য বুঝতে পারছো? সমাজের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে ঐ বিপ্লব আসলে কয়েদিদের একটু ভালো খাবার, একটু ভালো ব্যবহার পাওয়ার জন্য বিদ্রোহ। কিন্তু উপলব্ধি থেকে যে বিদ্রোহ আসে তার অর্থ— ব্যক্তি সমাজ থেকেই মুক্ত এবং এটা কিন্তু সৃজনশীল বিপ্লব।

এখন প্রশ্ন হলো, একজন ব্যক্তি হিসাবে তুমি যদি সমাজের অচলায়তন থেকে বেরিয়ে আসো, সেটা কি উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য? যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকেই রসদ সংগ্রহ করে তোমার মন এই দেওয়াল ভাঙার কাজটা করে থাকে, তাহলে তুমি কিন্তু আসলে সমাজের ভিতরেই রয়ে গেছো, কারণ এই সমাজের মূল ভিত্তিটাই হলো উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কোনো কিছু অধিকারের লালসা ও লোভ। কিন্তু এই-সবকে উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে যদি তোমার হৃদয়ে, তোমার মনে সেই বিপ্লব ঘটে তাহলে তুমি তখন উচ্চাকাঙ্ক্ষী নও। তখন তুমি ঈর্ষা, লোভ, অধিকারবোধ অর্থাৎ যেগুলোর উপর ভিত্তি করে সমাজের এই বিশাল প্রতিষ্ঠা, তার থেকে কোনো চালিকাশক্তি নাওনি, তুমি সম্পূর্ণরূপে তার বাইরে। তখন তুমি একজন সৃষ্টিশীল মানুষ। তখন তোমার প্রত্যেক কর্মের মধ্যে দিয়ে এক অন্য সংস্কৃতির বীজ রোপিত হবে।

সুতরাং এই সৃষ্টিশীল বিপ্লব আর সমাজের ভিতরে থেকে বিদ্রোহের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে। যখন তোমরা কেবল সংস্কারের ব্যাপারেই উৎসাহী হবে, কেবল কয়েদখানাটাকে এখানে-ওখানে একটু সাজাবে, গরাদগুলোকে একটু সাজাবে, তখন তোমরা মোটেই সৃষ্টিশীল নও। সংস্কার সবসময়ই আর একটু সংস্কারের দাবী জানায়, আর ওটা আরো দুর্গতি আরো ধ্বংস ডেকে আনে। কিন্তু মন যদি এই অধিকারের লিপ্সা, লোভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই সবের সমগ্র কাঠামোটাকে ঠিক ঠিক চিনতে পারে এবং সে কাঠামো ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে, তাহলে সেই মনে কিন্তু নিরন্তর বিপ্লব ঘটতে থাকে। এই সৃষ্টিশীল মনের ব্যাপ্তি প্রতি মুহূর্তে বাড়তে থাকে, অনেকটা স্থির জলে পাথর ছোঁড়ার মতন। এই মনের ক্রিয়া ঢেউয়ের পর ঢেউ সৃষ্টি করে, যা আরো আরো বড়ো হতে থাকে এবং এই ঢেউ সবসময়ই অন্য একটা সভ্যতার সূচনা করে।

প্রশ্নকারী ঃ *যখন আমি পড়াশুনা করি না তখন কেন নিজেকে ঘৃণা করি?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ প্রশ্নটাকে ভালোভাবে শোনো। আমার পড়াশুনা করা উচিত, অথচ আমি যখন তা করি না কেন আমি নিজেকে ঘৃণা করি? আমার সুন্দর হওয়া উচিত ছিল অথচ আমি তা নয় বলে নিজেকে কেন ঘৃণা করি? অন্যভাবে বলতে গেলে কেন আমি আমার আদর্শ অনুসারে বাঁচি না?

এখন কথা হলো কোনো আদর্শ না থাকা কি অনেক সহজ নয়? যদি কোনো আদর্শ মনের মধ্যে না থাকতো, তাহলে কি নিজেকে ঘৃণা করার প্রশ্ন উঠতো? তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কেন তোমরা বলো ঃ 'আমার দয়ালু হওয়া উচিত, আমার উদার হওয়া উচিত, আমার সব কিছু লক্ষ্য রাখা উচিত, আমার

পড়াশুনা করা উচিত’? যদি এর কারণটা খুঁজে পাও এবং এই আদর্শ থাকা ব্যাপারটা থেকেই মুক্ত হও, তাহলে তোমরা সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ক্রিয়া করবে। বর্ত্তমানে আমি সেই ব্যাপারটার মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

তাহলে এখন প্রশ্ন হলো তোমাদের কেন আদর্শ থাকে? এর প্রথম কারণ হলো তোমাদের চারপাশের মানুষেরা বলেছেন যদি আদর্শই না থাকে তাহলে জীবনের কোনো অর্থই নেই। সমাজ— সেটা কমিউনিস্টদের বা ক্যাপিটালিস্টদের ছাঁচেই হোক বা অন্য যে কোনো ছাঁচেই হোক তা বলে, ‘এটা হলো আদর্শ’ এবং তোমরা সেটা স্বীকার করে নাও। এখন, কোনো আদর্শ অনুযায়ী আচরণ করা বা বাঁচার চেষ্টা করার আগে কি আদর্শ আদৌ থাকা উচিত কি না সেটা খুঁজে বের করা জরুরী নয়? আমার মনে হয় সেটা খুঁজে বার করাই জরুরী। তোমাদের— রাম, সীতা বা আরো কতোরকমের আদর্শ আছে। কিছু সমাজ তোমাদের দিয়েছে, কিছু তোমরা নিজেরাই নিজেদের জন্য তৈরী করেছো। তোমরা কি জানো কেন তোমরা আদর্শকে গ্রহণ করো? ভয় থেকে। তোমরা যা, তেমনই থেকে যাওয়ার ভয়।

একে সহজভাবেই দেখা যাক, একে জটিল করার দরকার নেই। তোমরা যা বা যেমন— তেমন থেকে যাওয়াতেই তোমাদের ভয়, যার অর্থ তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোনো প্রত্যয় নেই। সেইজন্যই সমাজ বাবা-মা, ধর্ম তোমাদের যেমন যেমন হতে বলে তোমরাও তেমন তেমন হওয়ার চেষ্টা করো।

এখন প্রশ্ন হলো তোমরা যেমন, তেমনই থাকাতে তোমাদের ভয় কেন? কী হওয়া উচিত সেখান থেকে নয় বরং তোমরা যা সেখান থেকেই শুরু করছো না কেন? তোমরা যা তাকে উপলব্ধি না করে, তোমাদের যে রকম হওয়া উচিত বলে ভাবো, তাতে নিজেদের

পরিবর্তনের চেষ্টার কোনো অর্থ হয় না। অতএব ঐ আদর্শগুলোকে বাদ দাও। আমি জানি বয়স্ক লোকেরা কিন্তু এইসব একেবারেই পছন্দ করবেন না। তা না করুন। তোমরা ঐ আদর্শগুলোকে ছেড়া কাগজ ফেলার বা আবর্জনা ফেলার যে বাক্স থাকে তাতে বা নদীতে ফেলে দাও, এবং তোমরা যা— সেখান থেকে শুরু করো। এর অর্থ কী?

তুমি অলস, অন্যান্য আর পাঁচটা অল্পবয়স্ক ছেলের মতোই তুমি পড়াশুনা করতে চাও না, খেলাধূলা করতে চাও, একটু ভালো সময় কাটাতে চাও। ওখান থেকেই শুরু করো। যখন ভালো সময় কাটানো, মজা করে সময় কাটানোর কথা বলো, তখন তার মানে কী, এর সাথে কী কী জিনিস জড়িয়ে আছে? বাবা-মা বা কতকগুলো চকচকে আদর্শ কী বলে শোনার দরকার নেই। ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্য নিজের মনকে ব্যবহার করো। কেন পড়তে চাও না, সেটা বোঝার জন্য মনকে ব্যবহার করো। জীবনে কী করতে চাও; বাবা-মা, সমাজ বা কোনো আদর্শ তোমাদের কী করতে বলে তা নয়, সত্যিই নিজে যা করতে চাও তাকে খুঁজে বার করার জন্য নিজের মনকে ব্যবহার করো। যদি এই খোঁজাতে তোমাদের সবটুকুকে উজাড় করে দাও, তখন তোমরা এক একজন সত্যকার বিপ্লবী, তখনই তোমাদের মধ্যে কিছু সৃষ্টির প্রত্যয় জন্মায়, তোমরা যা সেটাই হওয়ার প্রত্যয় জন্মায়, এবং এর মধ্যে এক জীবনীশক্তি থাকে, যেটা বার বার ভরে ওঠে। কিন্তু অন্য কিছু হতে চাইলে তোমরা আসলে নিজেদের শক্তিই ক্ষয় করতে থাকবে।

একটা কথা বলোতো, তোমরা যা তাতেই সৌন্দর্য আছে, তবুও কেউ যা, তাই থাকাতে ভয় পাও— এটা কি একটা অদ্ভুত ব্যাপার নয়। যদি তুমি দেখো তুমি অলস বা বোকা, যদি এই অলসতাকে বুঝতে পারো, যদি নিজের মূঢ়তাটার মুখোমুখি হও,

অবশ্য এর মধ্যে ঐগুলোকে পরিবর্তন করতে হবে এমন কোনো চেষ্টা যেন না থাকে, তাহলে মন অদ্ভুত হালকা হয়ে যায়, মুক্ত হয়ে যায়। এরমধ্যেই অসাধারণ সৌন্দর্য ও মেধার জাগরণ হয়।

প্রশ্নকারী ঃ *বর্তমানে যে সমাজ আছে, এর বিরুদ্ধে বিপ্লব করে যদি আমরা একটা নতুন সমাজ গড়ি, সেই নতুন সমাজ গড়াটাও কি উচ্চাকাঙ্ক্ষারই একটা অন্যরূপ নয়?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ আমার মনে হয় আমি যেটা বলছিলাম সেটা তুমি শোনোনি। যখন মন সমাজের দেওয়ালের মধ্যে থেকে বিপ্লব করে, সেটা জেলের ভিতরের বিদ্রোহের মতো। সেটা উচ্চাকাঙ্ক্ষারই আর একটা রূপ। কিন্তু কোনো মন যদি বর্তমান সমাজের বিনাশকারী প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে সেই বিরাট বিষিত প্রবাহ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন তার ক্রিয়ায় উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে না। এমন ক্রিয়া— হতে পারে এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম দিল, এক উন্নততর সামাজিক কাঠামোর বা অন্যরকম কোনো পৃথিবীর জন্ম দিল, কিন্তু যে মন থেকে এই ক্রিয়ার উৎপত্তি সেই মন ঐসব সৃষ্টির ব্যাপারে উৎসাহী হয় না। এই মনের একমাত্র উৎসাহ সত্য কী তা খুঁজে বার করা। সত্যের ধারাই নতুনের সৃষ্টি করে। যে মন কেবল সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এ সৃষ্টি তার পক্ষে সম্ভব নয়।

১৯

জ্ঞান ও ঐতিহ্য

তোমাদের মধ্যে কতোজন কাল সন্ধ্যায় ইন্দ্রধনু দেখেছো? ওটা জলের উপরেই ছিল, কেউ হঠাৎই ওটা দেখে। সে সৌন্দর্য দেখবার মতো। সেই দেখা— এক আনন্দানুভূতির সাথে সাথে পৃথিবীর সৌন্দর্যের এবং আশ্চর্য এক বিশাল বিস্তৃতির বোধ নিয়ে এলো। এমন আনন্দের বার্তাকে ভাষায় অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে গেলে শব্দের জ্ঞান, সে ভাষার ছন্দ, লয় ও সৌন্দর্যের জ্ঞান থাকতেই হবে, নয় কি? কিন্তু অনেক অনেক বেশী যা গুরুত্বপূর্ণ তাহলো সেই অনুভূতি, সেই আনন্দের হিল্লোল। সুন্দর কিছুর প্রতি সত্যকার গভীর গুণগ্রাহিতা থেকে এমন অনুভব এমন সীমান্তহীন আনন্দ আসে। এইসব কিন্তু জ্ঞানের বা স্মৃতির চর্চার দ্বারা কোনোদিনই আসে না।

তোমরা দেখবে একের সাথে অন্যের কথোপকথনের জন্য, কোনো কিছু সম্বন্ধে অন্যকে বলবার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন অর্থাৎ কিছু জানার প্রয়োজন হয়। এই জ্ঞানের চর্চার জন্য তথা তার অনুশীলনের জন্য স্মৃতির দরকার। নিজের মধ্যে সঞ্চিত জ্ঞান ছাড়া তোমরা এরোপ্লেন চালাতে পারবে না, ব্রীজ বানাতে, সুন্দর সুন্দর বাড়ি গড়তে, বিরাট বিরাট রাস্তা বানাতে পারবে না, গাছেদের, প্রাণীদের যত্ন নিতে পারবে না। এমনই অনেক অসংখ্য কাজ যা

সভ্য মানুষ করে, জ্ঞান ছাড়া তোমরা তা করতে পারবে না। বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কাজ করা, মানুষকে জীবন-দায়ী ঔষধের দ্বারা সাহায্য করা, এমন অনেক কিছুর জন্যই তোমাদের জ্ঞান, তথ্য, স্মৃতি থাকতে হবে। এবং এই ব্যাপারে যতটা সম্ভব ভালো শিক্ষালাভ একান্তই জরুরী। এইজন্যই তোমরা যাতে সঠিক তথ্যগুলো পাও, তোমরা যাতে বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করতে পারো, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে যাঁরা তোমাদের এ বিষয়গুলোয় সাহায্য করতে পারবেন এমন প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক প্রয়োজন।

কিন্তু দেখবে যে সঞ্চিত জ্ঞান, যে স্মৃতি জীবনের একটা স্তরে ব্যাপকভাবে প্রয়োজনীয়, অন্যস্তরে সেটাই বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের যে দৈহিক জীবন বা ভৌতিক অস্তিত্ব, সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিমাণ বিরাট এবং প্রতি মুহূর্তে এর সাথে কিছু-না-কিছু যোগ হয়েই চলেছে। মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য এমন জ্ঞানের দরকার রয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো মানসিক স্তরেও কি এক ধরণের স্মৃতি বা জ্ঞান নেই, যা সত্য কী— তার আবিষ্কারের পথে প্রাচীরস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়? আসলে এই যে সঞ্চিত জ্ঞান, এ কিন্তু আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের পরম্পরারই একটা রূপ। ঐ পরম্পরা স্মৃতির মাধ্যমে বয়ে আসতে থাকে, স্মৃতির মধ্যেই তা সুরক্ষিত থাকে। যান্ত্রিক দিক থেকে, প্রয়োগবিদ্যার দিক থেকে এই পরম্পরার মাধ্যমে বয়ে আসছে যে জ্ঞান বা তথ্য তা জরুরী অর্থাৎ পরম্পরা জরুরী। কিন্তু মানুষের অন্তরের রহস্য উদ্‌ঘাটন তথা মানুষের নিজের অন্তরের দিকে যাত্রার ক্ষেত্রে যখন এই পরম্পরাকে ব্যবহার করা হয়, তখন সেটাই সবচেয়ে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

যান্ত্রিক ব্যাপারে, তাদের ব্যবহারে এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা সাধারণত সঞ্চিত জ্ঞান বা স্মৃতির উপরেই নির্ভর

করি। এই যে পুরোনো সঞ্চিত জ্ঞান, এছাড়া আমরা একটা গাড়ি চালাতে পারবো না। এমনভাবেই জীবনের বহুক্ষেত্রেই অনেক জিনিস করতে পারবো না। কিন্তু জ্ঞান যখন পরম্পরারূপে, বিশ্বাস-রূপে আমাদের মনকে, আমাদের অন্তরের অস্তিত্বকে পথ দেখাতে চায় তখন সে জ্ঞান সহায়ক না হয়ে বাধাই দেয়। এ মানুষে মানুষে বিভেদ নিয়ে আসে। পৃথিবীর দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে। কোনোদিন লক্ষ্য করেছো, সারা পৃথিবী কেমন হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ, আরো কতো সম্প্রদায়ে বিভক্ত? কী এদের একের থেকে অপরকে আলাদা করেছে? বিজ্ঞানের আবিষ্কার, কৃষির জ্ঞান বা কী করে ব্রীজ বানাতে হবে, জেট প্লেন ওড়াতে হবে— সেইসব জ্ঞান কিন্তু এদের আলাদা করেনি। এক ধরণের পরম্পরা, বিশ্বাস যা মনকে এক বিশেষ উপায়ে সংস্কারাবদ্ধ করে, সেটাই মানুষকে মানুষের থেকে আলাদা করেছে।

সুতরাং জ্ঞান যখন পরম্পরারূপে আমাদের মনে বিভিন্ন সংস্কার ঢোকাতে থাকে, মনকে বিশেষ একটা ছাঁচে গড়তে থাকে, তাকে বিশেষ আকার দিতে থাকে তখন সঞ্চিত জ্ঞানই বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এটা যে কেবল মানুষকে মানুষের থেকে আলাদা করে তাই নয়, তাদের মধ্যে শত্রুতাও নিয়ে আসে এবং সত্য, পরম, ঈশ্বর বা জীবন কী— এই সমস্ত গভীর খোঁজের পথকে রুদ্ধ করে। ঈশ্বর কী বা পরম কী একে আবিষ্কার করতে হলে অনেক দিনের সঞ্চিত জ্ঞানের রাশি, অনেক দিনের পরম্পরাগত জ্ঞান— যা মন রক্ষাকবচ হিসাবে তথা মানসিক নিরাপত্তার কাজে ব্যবহার করে, তাকে সরিয়ে রাখতে হবে।

শিক্ষার কাজ হলো মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অসংখ্য উদ্যোগ নিয়েছে, এগিয়েছে, তার বিরাট জ্ঞানের ভাণ্ডার শিক্ষার্থীর সামনে খুলে দেওয়া। একই সঙ্গে সে নিজে যাতে নতুন উদ্যোগ নিতে

পারে, নতুন খোঁজের পথে যেতে পারে, তারজন্য তার মনকে সকল সংস্কার থেকে মুক্ত করা। তা না হলে তাদের মন প্রযুক্তির জ্ঞানের যান্ত্রিকতায় যান্ত্রিক হয়ে যাবে। মনকে— পরম্পরার থেকে, প্রতিনিয়ত আসা সংস্কারগুলো থেকে নিজেকে নিরন্তর মুক্ত করে যেতে হবে, না হলে সেই মন পরম বা শাশ্বতকে আবিষ্কার করার সামর্থ্য লাভ করবে না। কিন্তু একইসাথে তাকে নিরন্তর বিকাশশীল বস্তু জগতের জ্ঞান, তার তথ্যকেও জানতে হবে, যাতে মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে সে কাজ করতে পারে, তাদের নির্মাণ করতে পারে।

সুতরাং জ্ঞান এক স্তরে ভীষণভাবেই প্রয়োজনীয়, কিন্তু অন্য স্তরে জ্ঞান হানিকারক। কোথায় এই জ্ঞান বৈনাশিক, তাই একে একেবারে সরিয়ে রাখতে হবে, আর কোথায় এই জ্ঞান প্রয়োজনীয় এবং তাকে তার চরম সীমা অবধি ব্যবহার করতে হবে— এই দুটো ব্যাপারকে বোঝা, তাদের পার্থক্যকে ঠিক ঠিক উপলব্ধিই— প্রজ্ঞার প্রারম্ভ।

এখন দেখা যাক বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে কী ঘটে চলেছে? তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে, নয় কি? কলেজে গিয়ে তোমরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল হতে পারো, অঙ্কে বা অন্য কোনো শাখায় পি.এইচ.ডি. করতে পারো, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পড়ে কীভাবে সঠিকভাবে সংসার চালাতে হয়, কীভাবে রান্না করতে হয় এসবও শিখতে পারো। কিন্তু কোনো ব্যক্তিই তোমাদের পরম্পরা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে সাহায্য করেন না; সেটা হলে শুরু থেকেই তোমাদের মন সতেজ থাকবে, উদ্দীপ্ত থাকবে। তবেই তোমরা সর্বদা নতুন কিছু আবিষ্কার করতেও সমর্থ হবে। বই থেকে তোমরা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, মতবাদ, দর্শন বা বিশ্বাসগুলো সংগ্রহ করো এবং সেগুলো মিলে মিশে এমন একটা কিছুতে পরিণত হয়, যেটা মনের ক্ষেত্রে বাধা হয়েই দাঁড়ায়। এর কারণ মন এইসব দর্শন, বিশ্বাস বা সিদ্ধান্তগুলোকে

নিজের মানসিক নিরাপত্তারক্ষার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে। স্বভাবতই মন ঐ উপকরণগুলোর দাসত্ব করতে থাকে। সুতরাং শিক্ষার দুই কাজ : প্রথমত মনকে একদিকে সকল প্রকার পরম্পরাগত জ্ঞান থেকে মুক্ত করা, অন্যদিকে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞান দান করা ও তোমাদের দক্ষ করে তোলা।

আসল সমস্যাটা হলো, মনকে, যে পরম্পরাগত জ্ঞানের কথা বলছিলাম তার থেকে মুক্ত করা— যাতে মন প্রতিপলে সেই চিরনতুনকে খুঁজতে পারে। এক বিরাট গণিতজ্ঞ একবার বলেছিলেন, একটা সমস্যার সমাধান তিনি করতে পারছিলেন না, অথচ অনেকদিন ধরেই সেই সমস্যাটা নিয়ে তিনি কাজ করছিলেন। একদিন সকালে হাঁটতে বেরিয়েছেন, হঠাৎ তিনি উত্তরটা খুঁজে পান। আসলে কী ঘটেছিল? তাঁর মন শান্ত ছিল, সমস্যাটার দিকে মুক্তভাবে দেখতে সক্ষম হয়েছিল; আর সমস্যা নিজেই তার সমাধানকে প্রকাশ করলো। একজনের কাছে অবশ্যই সমস্যা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য থাকবে, কিন্তু উত্তর খোঁজার জন্য তাকে সেই তথ্যের বোঝা নামিয়ে মুক্তভাবে উত্তর খুঁজতে হবে।

আমরা জ্ঞান সংগ্রহ করি, তথ্য, তত্ত্ব সংগ্রহ করি; কিন্তু মন কখনোই শেখে না কীভাবে তাকে শান্ত থাকতে হবে। জীবনের কোলাহল, তার অশান্তি, জীবনের যেসব ক্ষেত্রে সমস্যা তার শক্ত মূল চালিয়ে দেয়, সেইসব থেকে কীভাবে মুক্ত থাকতে হবে মন তা কখনোই শেখে না। আমরা বিভিন্ন সঙ্ঘে, সমিতিতে যোগ দিই, কোনো দর্শনকে মেনে নিই, কোনো বিশ্বাসকে জীবনের মূল-মন্ত্র করি, কিন্তু এগুলো কোনো মানবীয় সমস্যার সমাধান করে না। অপরপক্ষে ঐসব আরো দুর্গতি, আরো দুঃখ নিয়ে আসে। আমাদের রাশি রাশি দর্শন বা কতোগুলো বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই, আমাদের দরকার একটা নির্মুক্ত মনের, যে অনুসন্ধান করতে পারে, সৃষ্টিশীল

হতে পারে।

তোমরা পরীক্ষা পাশ করবে বলে কতো জিনিস মুখস্থ করো, একটা ডিগ্রী পাওয়ার জন্য কতো তথ্য সংগ্রহ করো, ওগুলোকে লেখো আর আশা করো একটা চাকরি পাবে, বিয়ে করতে পারবে— কিন্তু এটাই কি সব? তোমরা জ্ঞানে ভর্তি, বিভিন্ন কলাকৌশল প্রয়োগে দক্ষ, কিন্তু মন মুক্ত নয়। তাই মন বর্তমান রীতিনীতি ও কাঠামোটার দাস হয়ে যায়, যার অর্থ হলো তোমরা সৃষ্টিশীল মানুষ নও। তোমাদের সন্তান হতে পারে, তোমরা হয়তো ছবিও আঁকতে পারো, মাঝে মাঝে দু-একটা কবিতাও লিখতে পারো, কিন্তু সেটা সৃজনশীলতা নয়। সৃষ্টিশীলতাকে আবাহন করতে হলে মনকে মুক্ত হতে হবে। একমাত্র তখন তার শেখা সব দক্ষতা, সব কুশলতা সেই সৃষ্টিশীলতাকে প্রকাশের কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু সেই সৃষ্টিশীলতা— যেটা সত্যের আবিষ্কারের সাথেই দেখা দেয়, তার অনুপস্থিতিতে সব দক্ষ-কুশলতা মিথ্যা। দুর্ভাগ্যজনকভাবেই আমাদের মধ্যে অধিকাংশই এই প্রকার সৃজনশীলতার সাথে পরিচিত নয়। আমরা বহু জ্ঞান, পরম্পরা, শঙ্করাচার্য, বুদ্ধ, মার্কস বা অন্য কে কী বলেছেন, সেইসব তথ্যে আমাদের মনকে ভারী করে তুলেছি। কিন্তু মন যদি সত্য কী তা খোঁজার পথে মুক্ত থাকে, তখন তুমি দেখবে সেখানে এক অপরিমিত ঋদ্ধি আছে, আর আছে সব সীমাকে অতিক্রম করার এক অপার আনন্দ। তখন একজনের সাথে— অন্যের, বিভিন্ন ধারণার ও বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্কের এক ভিন্ন অর্থ আছে।

প্রশ্নকারী ঃ *ভালোবাসা না শাস্তি, কোনটা দুষ্টু বাচ্চাদের মধ্যে পরিবর্তন আনে?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ আপনার কী মনে হয়? প্রশ্নটাকে ভালো করে শুনুন, এটাকে নিয়ে ভাবুন, এটাকে অনুভব করার চেষ্টা করুন— দুষ্টু বাচ্চা

ভালোবাসার মাধ্যমে না শাস্তির মাধ্যমে বদলাবে। যদি সে শাস্তির মাধ্যমে পরিবর্তিতও হয়, যেটা আসলে জবরদস্তি তবু সেটাকে কি পরিবর্তন বলা যায়? আপনি একজন বয়স্কলোক, যেমন বাবা-মা বা শিক্ষকের অধিকার আছে, আপনারও তেমন আছে। যদি বেচারা বাচ্চা ছেলেটাকে ধমক চমক দেন, ভয় দেখান তাহলে হয়তো বাধ্য হয়ে সে আপনার কথা মেনে নেবে, কিন্তু সেটা কি পরিবর্তন? কোনো জবরদস্তির মাধ্যমে কি কোনো পরিবর্তন আনা যায়? আইন করে, ভয় দেখিয়ে কি সত্যি কোনোদিন কোনো পরিবর্তন আনা যায়?

এবার বলি, যখন আপনি বলছেন ভালোবাসা কি দুষ্টু বাচ্চাদের পরিবর্তন করে, তখন ভালোবাসা বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন? যদি ভালোবাসা অর্থ সেই বালককে বোঝা হয়— তাকে পরিবর্তন নয় কিন্তু, বরং কী কী কারণ তার দুষ্টুমি সৃষ্টি করছে তা বোঝার কথা বলছি— তাহলে আপনার বুঝতে পারাটাই তার দুষ্টুমির সমাপ্তি নিয়ে আসে।

যদি আমি বালকটি দুষ্টুমি বন্ধ করবে এই আশায় তাকে পরিবর্তন করতে চাই, তাহলে আমার তাকে পরিবর্তনের ইচ্ছাটা কি জবরদস্তিরই একটা রূপ নয়? কিন্তু যদি আমি খুঁজে বার করতে পারি আসল দুষ্টুমির কারণটা কী অর্থাৎ কী তার মধ্যে এই দুষ্টুমির সৃষ্টি করছে— সেটা ভুল খ্যাদ্যাভ্যাস হতে পারে, কম ঘুম হতে পারে, ভালোবাসার অভাব হতে পারে, তাকে নিয়ে হয়তো অন্যেরা হাসি-তামাসা করে ইত্যাদি অনেক কারণই হতে পারে, এবং যদি সেই কারণটাকে সরিয়ে দিতে পারি তাহলে সেই দুষ্টুমি আর থাকবে না। কিন্তু যদি আমি তাকে কেবল পরিবর্তন করতেই চাই, যেটা আসলে তাকে বিশেষ ছাঁচে তৈরী করারই নামান্তর— তাহলে কিন্তু আমি তাকে বুঝতে পারবো না।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন কী— এর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের

সামনে আর একটা প্রশ্ন এসেছে— পরিবর্তন বলতে আমরা কী বোঝাতে চাইছি। ধরুন আপনার ভালোবাসা পেয়ে বালকটি দুষ্টুমি করা বন্ধ করলো, এটা কিন্তু তার উপরে এক ধরণের প্রভাব। এখন প্রশ্ন হলো এটা কি সত্য পরিবর্তন? ধরলাম ওটা হয়তো ভালোবাসা, কিন্তু সেটাও তো তার উপর কিছু করার বা কিছু হওয়ার জন্য চাপ দেওয়া। এছাড়া যখন আপনি বলেন একজন বালকের পরিবর্তিত হওয়া উচিত, তার অর্থই-বা কী? কী থেকে কীসে পরিবর্তন? এই মুহূর্তে সে যেমন আছে অর্থাৎ বর্তমানে সে যা, তা থেকে তার যেমন হওয়া উচিত— তাতে পরিবর্তন, তাই তো? যদি তার যা হওয়া উচিত তাতে সে পরিবর্তিতও হয়, তা কিন্তু সে যা ছিল তারই কিছু এখানে ওখানের অদল-বদল, এবং সেটা কোনো পরিবর্তনই নয়, তাই নয় কি?

একটু অন্যভাবে ব্যাপারটা দেখা যাক। ধরুন আমি লোভী, আমি নির্লোভী হতে চাই। তার কারণ হলো সব লোক, সমাজ, শাস্ত্র, সব কিছুই বলছে আমার তেমনটাই হওয়া উচিত। এখন প্রশ্ন— এতে করে কি আমি বদলাবো, নাকি আমি লোভকেই অন্য নাম দিয়ে দিলাম? কিন্তু যদি আমি লোভের সমস্যার সম্পূর্ণ ব্যাপারটার অনুসন্ধানে ও উপলব্ধিতে সমর্থ হই, তখন আমি এর থেকে মুক্ত হবো। আর এটা কিন্তু নির্লোভী হওয়ার থেকে একেবারেই অন্য কিছু।

প্রশ্নকারী ঃ *একজন কী করে বুদ্ধিমান হবে?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ যে মুহূর্তে তুমি বুদ্ধিমান হওয়ার চেষ্টা করবে, সেই মুহূর্তে তুমি আর বুদ্ধিমান নও। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এতে একটু মনোযোগ দাও। ধরো আমি বোকা, সবাই বলে আমার বুদ্ধিমান হওয়া উচিত, তখন কী ঘটে? আমি বুদ্ধিমান হওয়ার জন্য বিভিন্ন

পথে চেষ্টা চালাতে থাকি, আমি আরো পড়াশুনা করি, আমি পরীক্ষায় আরো বেশী নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করি। তখন আশেপাশের লোকেরা বলে, 'ও প্রচুর পরিশ্রম করছে'; একটু পিঠও চাপড়ে দেয়। আমি কিন্তু যে বোকা ছিলাম, সেই বোকাই রয়ে যাই। কারণ আমি বুদ্ধিমত্তার কিছু ছোটোখাটো টুকরোই হয়তো সংগ্রহ করেছি। সুতরাং প্রশ্নটা সবসময়ই কী করে বুদ্ধিমান হওয়া যাবে সেটা নয়, আসল প্রশ্নটা হলো কী করে মূঢ়তা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। আসলে আমি তো মূঢ়, আমি যদি বুদ্ধিমান হওয়ার চেষ্টা করি, আমি আসলে মূঢ়তাপূর্ণ কাজই করছি।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছো কি, সমস্যাটা কিন্তু সেই পরিবর্তনের। তোমরা জিজ্ঞাসা করো, ''বুদ্ধিমত্তা কী, কীভাবে একজন বুদ্ধিমান হবে?'' এর অর্থ বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে তোমার একটা ধারণা দরকার এবং তুমি সেই ধারণা অনুযায়ী নিজেকে তৈরী করার চেষ্টা করবে। এখন সহজ কথা হলো বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কিত কিছু ধারণা, কিছু সিদ্ধান্ত থাকা এবং সেই নমুনা অনুসারে নিজেকে তৈরী করা কখনই বুদ্ধিমত্তা নয়, তা মূর্খামি, তাই নয় কি? যখন কেউ বুদ্ধিহীন— তখন তার বুদ্ধিহীনতাকে পরিবর্তন করে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত করার ইচ্ছে ছাড়া বা 'আমি বোকা, আমি ভোঁতা, এটা একটা বিরক্তিকর ব্যাপার'— এইসব না বলে যদি সে বুদ্ধিহীনতা ব্যাপারটা আসলে কী, সেটা দেখতে শুরু করে, তাহলে দেখতে পাবে— যতো সমস্যাটা উন্মোচিত হতে থাকবে ততই এক বুদ্ধিমত্তা আসবে, যার সাথে মূঢ়তার কোনো সংস্রব নেই। এবং এই পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও কোনো কিছু করার বা হওয়ার কোনো চেষ্টাই নেই।

প্রশ্নকারী ঃ *আমি একজন মুসলমান। যদি আমি আমাদের ধর্মের যে সংস্কার, যে নিয়মরীতি তা প্রাত্যহিক জীবনে না মেনে নিই,*

আমার বাবা-মা বলেন বাড়ী থেকে বার করে দেবেন। আমার কী করা উচিত?

কৃষ্ণমূর্তি ঃ তোমরা যারা মুসলিম নও তারা সম্ভবত প্রশ্নকারীকে ঘর ছাড়ারই উপদেশ দেবে, নয় কি? কিন্তু তোমরাও কিন্তু কেউ হিন্দু, পার্শী, কেউ কমিউনিস্ট বা খ্রিষ্টান অথবা আরো যা কিছু হতে পারে, সেই সব। তোমাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং নিজেদের উচ্চ ভাবার কোনো কারণ নেই। এর কারণ, তোমরাও যদি তোমাদের বাবা মাকে বলো— তাঁদের ঐতিহ্য, তাঁদের পরম্পরা সব পুরোনো কুসংস্কার, তাঁরাও হয়তো তোমাদের বাড়ী থেকে তাড়াবেন।

এখন প্রশ্ন হলো যদি তুমি কোনো বিশেষ ধর্মের মধ্যে বড়ো হয়ে থাকো এবং তোমার বাবার কথা অনুযায়ী কিছু নিত্য আচার-অনুষ্ঠান, যেগুলো তুমি নিজে বুঝতে পারো পুরোনো অন্ধ কুসংস্কার, সেগুলো পালন না করলে বাড়ির দরজা তোমার জন্য বন্ধ, তখন তুমি কী করবে? এটা কিন্তু একটা ব্যাপারের উপরই নির্ভর করে, সেটা হলো কতোটা গভীরভাবে, কতোটা দৃঢ়তার সাথে তুমি ঐ পুরানো কুসংস্কারগুলোকে অনুসরণ করতে চাও না, তাই নয় কি? তুমি কি বলবে 'আমি এই ব্যাপারে গভীরভাবে ভেবেছি, এইভাবে নিজেদের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বলাটা অর্থহীন। যদি এই কারণে আমাকে বাড়ি ছাড়তে হয় তো আমি প্রস্তুত। জীবন আমাকে যা দেবে— দুর্দশা, এমনকী মৃত্যু— আমি তা গ্রহণ করবো। আমি যা সঠিক বলে, গভীরভাবে অনুভব করি, তার সাথেই থাকবো'। তা যদি না হয় তাহলে তোমরা ঐতিহ্য, পরম্পরা, এই সমষ্টির অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে।

তাহলে এখন তুমি কী করবে? যদি শিক্ষা তোমাদের এই প্রত্যয় না দেয়, তবে এ শিক্ষার কি-বা মূল্য আছে? এটার কাজ কি শুধু তোমাদের চাকরি পাওয়ার জন্য প্রস্তুত করা এবং এই বিনাশকারী

সমাজটার সাথে যাতে মানিয়ে নিতে পারো তারজন্য প্রস্তুত করা। এরকম যেন বলো না 'কেবলমাত্র কিছু জনের পক্ষেই এটা সম্ভব, আর আমি অতোটা শক্তপোক্ত নই'। যে একটু চিন্তা করবে সেই এটা ভেঙে বেরোতে পারবে। এটাকে বুঝতে পারা বা পরম্পরার এই চাপকে সহ্য করে নিজের অবস্থানে অটল থাকবার জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন নেই; যা প্রয়োজন তা হলো প্রত্যয়। যখন তুমি নিজে কোনো বিষয়ে কীভাবে ভাবতে হয় তা জানো, সেখান থেকেই এই গভীর প্রতীতি জন্ম নেয়। কিন্তু দেখবে শিক্ষা কিন্তু আদৌ তোমাদের কীভাবে ভাবতে হবে তা শেখায় না। তা সবসময় শেখায় তোমাদের কী ভাবতে হবে। তোমাদের বলা হয়েছে তোমরা হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, এটা-সেটা। কিন্তু সঠিক শিক্ষার কাজ হলো, তোমরা নিজেরাই যাতে সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারো তারজন্য সাহায্য করা এবং সেই মৌলিক চিন্তা থেকেই এক গভীর প্রত্যয় জন্ম নেয়। তখন তোমরা অন্যের দাসত্ব করা কোনো যন্ত্র নয়, তখন তোমরা এক একটি সৃজনশীল সত্তা।

প্রশ্নকারী ঃ *আপনি বলছেন মনোযোগ দিতে গেলে কোনোপ্রকার প্রতিরোধ থাকলে চলবে না। এটা কী করে সম্ভব ?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ আমি বলেছিলাম, যেকোনোপ্রকার প্রতিরোধ হলো অমনোযোগের অবস্থা, সেটা একটা বিক্ষেপ। কথাটা শুধু শুধু মেনে নিও না। এ ব্যাপারে একটু ভাবো। কে বলছে দেখার দরকার নেই, নিজেই ব্যাপারটা অনুসন্ধান করো। যদি যা বলছি সেটা ঠিক বলে মেনে নাও, তাহলে তোমরা যান্ত্রিক হয়ে পড়বে, স্থূল হয়ে পড়বে, সেখানেই সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি নিজেই ব্যাপারটা খুঁজতে থাকো, নিজেই ভাবতে থাকো তাহলে তুমি একজন ভরাপ্রাণ সৃষ্টিশীল মানুষ।

এখন আমি যা বলছি, তার প্রতি কি মনোযোগ দিতে পারবে

এবং একইসঙ্গে এখানে বাইরে থেকে কেউ যদি প্রবেশ করে, সে কে— তাকে দেখার জন্য তোমার মাথা না ঘুরিয়ে বা তোমার মাথা ঘোরানোর ইচ্ছাকে প্রতিরোধ না করে তার প্রতি সচেতন হতে পারবে? যদি দেখবার জন্য মাথা ঘোরানোর ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করো তোমার মনোযোগ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে, আর তোমার মানসিক শক্তিরও এই প্রতিরোধের কারণে অপব্যয় হচ্ছে। অতএব এখন প্রশ্ন হলো পূর্ণ মনোযোগের এমন কি কোনো অবস্থা রয়েছে— যেখানে মনের কোনো বিক্ষেপ নেই, তাই তাকে প্রতিরোধেরও কোনো প্রশ্ন নেই? অন্যভাবে বললে তুমি কি তোমার সম্পূর্ণ সত্তা দিয়ে কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগ দিতে পারবে এবং একই সঙ্গে তোমার চারপাশে এবং তোমার ভিতরে যা ঘটছে তার প্রতি সচেতন থাকতে পারবে?

দেখেছো কি মন একটা অদ্ভুত যন্ত্র, সব সময় এটা কিছু-না-কিছুকে নিজের মধ্যে ঢোকাচ্ছে অর্থাৎ তার আত্মীকরণের প্রক্রিয়া চলছে। মন বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন বর্ণ দেখছে, অসংখ্য প্রভাব গ্রহণ করছে, শব্দের অর্থকে উপলব্ধি করছে, কোনো দৃষ্টির গুরুত্ব অনুভব করছে। এইভাবে কতো কিছুই না প্রতি মুহূর্তে তার মধ্যে প্রবেশ করছে। আমাদের সমস্যাটা হলো কী করে কোনো কিছুর প্রতি আমাদের পূর্ণমনোযোগ দেওয়া সত্ত্বেও একই সঙ্গে আমাদের চারপাশে যা ঘটে চলেছে সেই প্রত্যেক ব্যাপারে এবং কেবল চেতন মনেরই নয়, অবচেতন মনের প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়ার প্রতিও আমাদের মনকে সজাগ রাখবো?

আমি তোমাদের যেটা বলতে চাইছি তার সাথে ধ্যানের যোগ আছে। এই ব্যাপারে এখন আর যাব না, কিন্তু একটা কথা বলি, যে ব্যক্তি ধ্যান জানে না সে একজন অপরিণত মানুষ। ধ্যান জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম। এটা পরীক্ষা

পাশ বা একটা ডিগ্রী পাওয়ার থেকে অনেক অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সত্যকার ধ্যান কী, তাকে উপলব্ধি করা কিন্তু ধ্যান অভ্যাস করা নয়। আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোনো কিছুর 'অভ্যাস' করা ব্যর্থ, ক্ষতিকারক। সত্য ধ্যান কী, তাকে উপলব্ধি করতে হলে একজনকে তার চেতনার সকল ক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, এবং তখনই পূর্ণ মনোযোগের অবস্থা আসে। কিন্তু কোনোপ্রকার প্রতিরোধ থাকলে সেই অবস্থা আসে না। আমাদের, অবাঞ্ছিত সব কিছুকে প্রতিরোধের মাধ্যমেই কী করে মনোযোগ দেওয়া যায়— তা শেখানো হয়, তাই আমাদের মনোযোগও কখনও পূর্ণ নয়, সর্বদাই আংশিক। তাই শেখাটা আমাদের কাছে শ্রান্তিজনক, একঘেয়ে, ভীতিজনক কিছুতে পরিণত হয়েছে। সেইজন্যই 'পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া' একে গভীর অর্থেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। যার অর্থ নিজেদের মনের সমস্ত গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া। আত্মোপলব্ধি ছাড়া সেই পূর্ণ সজাগতা আসে না। তাই সত্যকার স্কুলে ছাত্রদের কেবল বিভিন্ন বিষয় শেখানো হয় তাই নয়, কী করে তারা তাদের মনের ক্রিয়ার ব্যাপারে সচেতন হবে সে ব্যাপারেও সাহায্য করা হয়। কারণ নিজেকে এই বোঝার মধ্যে দিয়েই সে কোনো প্রতিরোধ ছাড়া পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া কী— তা জানতে পারবে। নিজেকে উপলব্ধির পথই ধ্যানের পথ।

প্রশ্নকারী ঃ *আচ্ছা, আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এতো ভালোবাসি কেন?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ খুবই সহজ, একজন কৌতুহলী বলেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। তুমি, কী করে ক্রিকেট বা ফুটবল খেলতে হয়, কী করে ঘুড়ি ওড়াতে হয় জানতে চাও না? যে মুহূর্তে তোমরা প্রশ্ন করা বন্ধ করবে তোমরা নির্জীব হয়ে যাবে। বয়স্কদের সাথে এটাই ঘটে থাকে। তাঁরা খোঁজাই বন্ধ করে দিয়েছেন। এর কারণ তাঁদের মন রাশি রাশি তথ্য, অন্যে

কী বলেছে— এই সবে ভর্তি ; তাঁরা পরম্পরাকে, পুরানো সব কিছুকে মেনে নিয়েছেন তাই নতুন করে তাঁরা আর কিছু খোঁজেন না। যতক্ষণ তোমরা প্রশ্ন করছো, ততক্ষণ সব কিছু ভেদ করে এগোচ্ছো, আর যেই মুহূর্তে পরম্পরাকে স্বীকার করলে— তখনই মানসিকভাবে তোমাদের মৃত্যু ঘটল। তাই আজীবন অন্বেষণ করে যেও। তখন দেখবে মন এক অসাধারণ বস্তু, এর কোনো শেষ নেই এবং এমন মনের মৃত্যু বলেও কিছু হয় না।

২০

ধর্মিষ্ঠ মনের উন্মুক্ততা

দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ মাঠ, হলুদ হলুদ সর্ষের ফুলে ভরে আছে, মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে ছোটো নদী; তাকে দেখা এক অসাধারণ ব্যাপার, নয় কি? কাল সন্ধ্যায় আমি এর অনন্য রূপ আর শান্তিকে দেখছিলাম, স্বভাবতই সৌন্দর্য কী এই প্রশ্নটাও এসেছিল। যখন আমরা কোনো সুন্দর বা অসুন্দর কিছু দেখি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আনন্দের বা বিরক্তির প্রতিক্রিয়া হয়। তখনই সেই অনুভূতিকে আমরা 'এটা সুন্দর' 'ওটা অসুন্দর' এইসব বলে আমাদের ভাষায় ব্যক্ত করি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা এই ভালো লাগা বা মন্দ লাগার মধ্যেই সীমায়িত নয়, বরং তা হলো সকল কিছুর সাথেই সখ্যতা থাকা, সুন্দর বা অসুন্দর প্রতিটা বস্তুর ব্যাপারেই সমান সংবেদনশীল হওয়া।

সৌন্দর্য কী? প্রশ্নটা কিন্তু একটা মৌলিক প্রশ্ন। একে একটা সাধারণ প্রশ্নের মতো করে নিয়ে, সরিয়ে রেখে দিও না। সৌন্দর্যকে উপলব্ধি, হৃদয়ে শুভবোধের জাগরণ তখনই হয় যখন আমাদের মন, আমাদের হৃদয় কোনো সুন্দর বস্তুর সাথে অবাধে তাদের আত্মীয়তা গড়ে তোলে, ফলত সবদিক থেকেই এক সন্তোষ, এক প্রসন্নতাবোধ আসে। এমন আনন্দের— আমাদের জীবনে বিরাট গুরুত্ব রয়েছে, আর সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের অন্তরের অন্তরে এমনই অনুভূতি না

থাকলে জীবন এক অগভীর ধারা হয়েই থেকে যায়। কারোর চারিদিকে হয়তো অপার সৌন্দর্য রয়েছে, পাহাড়ের পর পাহাড়, দিগন্ত প্রসারিত মাঠ অথবা নদী। কিন্তু কেউ যদি এই-সবের প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত না রাখে, তাহলে সে এক নির্জীব অস্তিত্ব হয়েই রয়ে যায়।

ছেলেমেয়েরা এবং বয়স্করা, প্রত্যেকে নিজের কাছে এই প্রশ্নটা রাখুন— সৌন্দর্য কী? পরিষ্কার থাকা, পরিচ্ছন্ন পোশাক, হাসি, শোভন হাব-ভাব, চলনে এক স্বাভাবিক ছন্দ, চুলের খোঁপায় একটা ফুল, সুশীল ব্যবহার, কথার স্পষ্টতা, বিচারক্ষমতা, অন্যের প্রতি খেয়াল রাখা, সময়নিষ্ঠ হওয়া এসবই সুন্দরতার এক একটা অঙ্গ, কিন্তু এই-সব খুবই ওপর-ওপরের ব্যাপার, তাই নয় কি? এখন প্রশ্ন ঃ এটাই কি সৌন্দর্যের শেষ কথা, না কি সৌন্দর্য আরো গভীরতর কিছু।

আকৃতির সৌন্দর্য রয়েছে, একটা নকশার সৌন্দর্য রয়েছে, জীবনেরও সৌন্দর্য রয়েছে। কোনোদিন কোনো গাছ যখন নতুন পাতায় পাতায় ভরে ওঠে, তার আকৃতির সৌন্দর্যকে দেখেছো অথবা আকাশের পটে পাতাহীন গাছের শাখার সূক্ষ্মতাকে দেখেছো? এগুলোকে দেখতে ভালো লাগে, কিন্তু এই সব হলো আরো অনেক অনেক গভীর কিছুর বাহিরের অভিব্যক্তি। তাহলে তা কী— যাকে আমরা সৌন্দর্য বলি?

তোমার হয়তো মুখশ্রী সুন্দর, তোমার চেহারায় একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যাপার আছে, তোমার পোশাকেও সুরুচির ছাপ আছে, তোমার আদব-কায়দায়ও একটা পরিশীলিত ব্যাপার আছে। তুমি হয়তো-বা ভালো ছবি আঁকতে পারো, হয়তো ভালো নৈসর্গিক বর্ণনা লিখতে পারো, কিন্তু আন্তরিক কল্যাণময়তার করুণাময়তার অনুভব ছাড়া সৌন্দর্যের এই বাহ্যিক প্রকাশগুলো জীবনকে খুবই উপরভাসা করে রাখে, তাকে একটা মিথ্যা চাকচিক্য দেয়, এগুলোর সত্যকার কোনো মূল্য নেই। ওগুলো জরুরী এবং তা পরিবেশকে

অনেকটা বন্ধুত্বপূর্ণ অনেকটা আনন্দপূর্ণ করে তোলে, কিন্তু শুধুমাত্র এগুলোরই নিজস্ব মূল্য খুব কম।

সুতরাং সত্যকার সৌন্দর্য কী, আমাদের অবশ্যই তার খোঁজ করা উচিত, তাই তো? একটা কথা মনে রেখো, আমি কিন্তু সৌন্দর্যের বাহ্যিক রূপের প্রতি লক্ষ্য না রাখার কথা বলছি না। ভালো আচার-ব্যবহার, শারীরিকভাবে পরিচ্ছন্নতা, রুচিসম্মত জামা-কাপড় পরা, অন্যকে না দেখিয়ে নিজেই সময়নিষ্ঠ হওয়া, স্বচ্ছতার সাথে কথা বলা ইত্যাদি আরো যা যা রয়েছে সেগুলো কিন্তু খুবই প্রয়োজন। এগুলো যেকোনো স্থানে একটা মনোরম পরিবেশ তৈরী করে, কিন্তু আলাদা করে (সেই অন্তরের সৌন্দর্য ছাড়া) এদের নিজেদের তেমন কোনো মূল্য নেই।

আন্তরিক সৌন্দর্য, বাহ্যিক আকার আর কর্মে এক মাধুর্য, এক নম্রতা নিয়ে আসে। এখন প্রশ্ন হলো সেই আন্তরিক সৌন্দর্য— যা ছাড়া সব কিছুই ব্যর্থ, সেটা কী? কোনোদিন কি এটা নিয়ে ভেবেছো? হয়তো ভাবো নি। তোমরা সব ব্যস্ত, তোমাদের মন পড়াশুনা, খেলাধুলা, বিভিন্ন কথাবার্তা, হাসি-তামাশা, একে অপরকে ঠাট্টা করা এইসবে ভর্তি। যা না থাকলে বাইরের সব আকার-প্রকার, ব্যবহার, কর্ম একেবারে অর্থশূন্য, সেই অন্তরের সৌন্দর্যকে তোমরা যাতে উপলব্ধি করতে পারো, সে বিষয়ে সাহায্য করাও সঠিক শিক্ষার অন্যতম কাজ। এই সৌন্দর্যের অতলতাকে উপলব্ধি তোমাদের জীবনের অন্যতম অঙ্গ।

এক অগভীর মন কি সৌন্দর্যের রসাস্বাদন করতে পারে? হয়তো সৌন্দর্য নিয়ে সে হরেকরকম কথা বলতে পারে, কিন্তু কোনো সত্যকার সৌন্দর্যের কাছে গিয়ে তার সত্তা কি অপরিমিত গূঢ় আনন্দে উপচিয়ে পড়ে? যতক্ষণ মন নিজেকে নিয়েই নিজে ব্যস্ত থাকে, কেবল নিজের ক্রিয়াগুলোর ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট থাকে, ততক্ষণ

পর্যন্ত সুন্দরতার কোনো আভাস সেখানে দেখা যায় না। সে মন যা কিছুই করুক না কেন, তা সীমিত তা শ্রীহীন, তাই তার পক্ষে সুন্দরের দেখা পাওয়া কঠিন। কিন্তু যে মন নিজেকে নিয়েই নিজে আচ্ছন্ন নয়, যে নিজেরই কোনো চাওয়ার পিছনে অহরহ দৌড়োচ্ছে না, সফলতার তৃষ্ণার আকুতি যেখানে নীরব হয়ে গেছে তথা যে মন নিজের ইচ্ছাগুলোর জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পথ হারায় নি— সে মন কিন্তু অগভীর নয়, সেই মনই কল্যাণের জ্যোতিতে, করুণার সৌরভে প্রস্ফুটিত হয়। বুঝতে পারছো কি? তথাকথিত অতি কোনো কুৎসিত মুখমণ্ডলকেও এই অন্তরের প্রস্ফুটন, এই করুণা, অসামান্য শ্রীতে মণ্ডিত করে। যখন এই আন্তরিক করুণার প্রবাহ আসে তখন সে সব কুরূপতাকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেয়, কারণ এই মঙ্গলময়তা আসলে এক গভীর ধর্মীয় অনুভব।

ধার্মিক হওয়া আসলে কী, তা কি তোমরা জানো? মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি যদিও দূর থেকে শুনতে ভালোই লাগে, তবু তার সাথে বা পূজা, পুরোহিতের অনেক আচার-অনুষ্ঠান অথবা কতকগুলো শাস্ত্রীয় মতানুসারী উদ্ভট কাণ্ডকারখানার সাথে ধার্মিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্মনিষ্ঠ হওয়া মানে সত্যের বা পরমের প্রতি উন্মুক্ত থাকা। ধর্মিষ্ঠ হওয়া মানে শরীর, মন ও হৃদয় তথা সত্তার প্রতিটি অনু, সুন্দর ও অসুন্দরকে সমান আগ্রহে গ্রহণ করবে। কোনো খুঁটিতে বাঁধা অসহায় গাধা, নগরের দারিদ্র ও ক্লেদ, হাসি ও কান্না এককথায় চারিপাশের সব কিছুর প্রতি সত্তার প্রতিটি দুয়ার থাকবে উন্মুখ। আসলে এ বিরাট অস্তিত্বের সমগ্র কিছুর প্রতি তোমার সংবেদনা, সহানুভূতিসম্পন্নতা থেকেই করুণার, প্রেমের উৎসারণ ঘটে। ওটা ছাড়া তোমাদের সব প্রতিভা, সব ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ, দামি গাড়ি, অসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থাকা সত্ত্বেও সত্যকার সৌন্দর্য থাকবে না।

প্রেম এক অদ্ভুত কিছু, তাই নয় কি? তোমার মধ্যে প্রেম থাকবে না, যদি তুমি নিজের সম্পর্কেই ভাবতে থাকো— এর অর্থ এই নয় যে তুমি অন্যের সম্পর্কে ভাবতে থাকবে। প্রেমের কেবল এক শুদ্ধ অস্তিত্ব থাকে, এর কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, এ কোনো বিশেষ কারোর জন্যও নয়। যে মনে প্রেম আছে সেটাই একটা ধর্মনিষ্ঠ মন, তার কারণ তা পরমের, সত্যের বা ঈশ্বরের শুদ্ধ চেতনার সাথে রয়েছে। একমাত্র সেই মনই সৌন্দর্য কী তা জানতে পারে। যে মন কোনো দর্শনের জালে আটকায়নি, কোনো বিশেষ নিয়ম বা বিশ্বাসের সীমানায় বদ্ধ হয়ে যায়নি, যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার পিছনে ধাওয়া করে চলে না— ফলত যে মন সংবেদনশীল সচেতন হয়ে ওঠে, সব কিছুর প্রতি দৃষ্টি যার জাগ্রত, সেই মনেই সুন্দরের অধিবাস সম্ভব।

ছোটোবেলা থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, বার বার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ না নাড়িয়ে চুপচাপ বসা, খাওয়ার টেবিলের রীতিগুলো জানা, অন্যের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা, সময়নিষ্ঠ হওয়া— এগুলো শেখা ভালো, কিন্তু এগুলো খুবই উপরের জিনিস। এখন যদি গভীর বস্তুকে উপলব্ধি না করে এই উপরেরগুলো নিয়েই মেতে থাকো, তাদেরই অভ্যাস করতে থাকো, তা হলে কোনোদিন সৌন্দর্যের সত্যকার অর্থকে খুঁজে পাবে না। যে মন কোনো দেশের, কোনো সম্প্রদায়ের, কোনো সমাজের নয়, যে মনের উপর কোনো কিছুই প্রভুত্ব বিস্তার করে নেই, যে মন কতকগুলো আকাঙ্ক্ষার পিছনে সারাদিন ঘুরে বেড়ায় না, যে মন ভয়ে, আঘাতে জর্জর নয়— সেই মন প্রেমে, কল্যাণে, করুণায় মঞ্জরিত হয়ে ওঠে। কারণ সে মন তখন পরমের গতিময়তার সাথে গতিমান, তা জানে সত্য সৌন্দর্য কী। সুন্দর বা অসুন্দর সব কিছুর প্রতি তার চরম সংবেদনা রয়েছে, সে মন সৃষ্টিশীল, সে মনের বোধও অপার।

প্রশ্নকারী ঃ *যদি আমি ছোটো বয়স থেকেই একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখি, তাহলে কি বড়ো হলে তা পূর্ণ হবে?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ ছোটবেলার ঐ সব ইচ্ছেগুলোর আয়ু বেশিদিন হয় না, হয় কি? একটা ছোট্ট ছেলে ইঞ্জিন-ড্রাইভার হতে চায়, অথবা সে দেখলো একটা জেট-প্লেন তীব্র বেগে আকাশের এপার থেকে ওপারে উড়ে গেলো, সে ভেবে বসলো সে পাইলট হবে, সে হয়তো দেখলো একজন রাজনীতিবিদ ভালো বক্তৃতা দিচ্ছেন, সে ভাবলো সে সেইটাই হবে, অথবা সন্ন্যাসী দেখলো, ভাবলো সেও এমনটাই হবে। কোনো মেয়ে হয়তো ভাবলো তার অনেক সন্তানাদি হবে, সে কোনো ধনীকে বিয়ে করবে, প্রাসাদোপম অট্টালিকায় থাকবে, আবার কেউ হয়তো ভাবলো ছবি আঁকবে বা অনেক কবিতা লিখবে।

এবার দেখা যাক ছোটবেলার স্বপ্ন কি পূর্ণ হয়, আর সেইসব পূর্ণ হওয়ারও কি কোনো মূল্য আছে? কোনো কামনা বা কোনো ইচ্ছা পূরণ করার তৃষ্ণা— সে যে কোনো ইচ্ছা হতে পারে, তা দুঃখ আনে। হয়তো এখনো এটা লক্ষ্য করোনি, কিন্তু বড়ো হওয়ার সাথে সাথেই এটা উপলব্ধি করবে। দুঃখ কামনারই ছায়া। ধরো যদি আমি ধনী বা বিখ্যাত হতে চাই, আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্য লড়াই চালাবো, যারা আমার পথের বাধাস্বরূপ হবে তাদের সাথে ধাক্কাধাক্কি হবে, শত্রুতা সৃষ্টি করবো, এবং এতো কিছুর পরেও যদি আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছেও যাই, আগে বা পরে কিছু-না-কিছু ঘটবেই। আমি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি, যেটা চাইছিলাম তার পূরণ হওয়ার পরেই নতুন লক্ষ্যের দিগন্তের দিকে ছোটা শুরু করতে পারি। এইসবের মধ্যে মৃত্যুও এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কামনা— তাদের পরিপূরণ অবশ্যম্ভাবীভাবে দুঃখ ও নৈরাশ্য নিয়ে আসে। নিজেই এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে পারো। তোমাদের চারপাশে যারা বিখ্যাত, যাঁদের সবাই মহান বলে মনে করেন, যাঁদের ক্ষমতা

আছে, তাঁদের লক্ষ্য করো। তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো, কেমন দুঃখের ছায়া সেই মুখে, কেউ কেমন মোটা, কেউ গর্বিত। তাঁদের মুখে কতকগুলো কুৎসিৎ রেখা দেখতে পাবে। তাঁদের মধ্যে করুণার বিকাশ হয় না, কারণ তাঁদের হৃদয় দুঃখে ভরা।

এই পৃথিবীতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়া, তুমি যা— সেই রূপে বেঁচে থাকা কি যায় না? যদি তুমি যা— তাকে কোনো পরিবর্তনের চেষ্টা না করে তাকে বোঝা আরম্ভ করো, তাহলে তোমার বর্তমান অবস্থা এক রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাবে। আমার তো মনে হয় একজন খ্যাতি ছাড়া, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়া, কঠোরতা ছাড়া এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে। একজন যদি 'অহং'কে বা 'স্ব'কে গুরুত্ব না দেয় তাহলে অঢেল আনন্দ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। এরজন্য শিক্ষিত করে তোলাও শিক্ষার অন্যতম প্রধান কাজ।

সারা পৃথিবীই তো সাফল্যের ভজনা করছে। কে গরীব ছিল, কেবল রাত্রি জেগে পড়ে-পড়ে অবশেষে বিচারকদের পদে আসীন, কে খবরের কাগজ বিক্রী করতো, তারপরে কোটিপতি হলো— এইসব গল্প তোমরা পড়ো। এইভাবেই সফলতার, গৌরবের রস তোমাদের একটু একটু করে পান করানো হয়। অনেক বিরাট সফলতার সাথে বিরাট দুঃখও কিন্তু আসে। ওরা সাথেসাথেই থাকে। কিন্তু সফলতা অর্জনের নেশায় আমরা আচ্ছন্ন। আমাদের কাছে দুঃখকে উপলব্ধি করা, তাকে অতিক্রম করার থেকে সফলতা অনেক অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্নকারী : *বর্তমান সামাজিক অবস্থায় আপনি যা বলছেন তাকে কাজে লাগানো কি সত্যি খুব কঠিন নয়?*

কৃষ্ণমূর্তি : কোনো ব্যাপার তুমি যখন গভীরভাবে অনুভব করো, তখন তাকে কার্যে পরিণত করতে কি কঠিন লাগে? যখন তুমি

ক্রিকেট খেলার ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী, তখন তুমি তোমার পুরোটা তাতে উজাড় করে দাও, তাই তো? তখন কি সেটাকে কঠিন বলো? কিন্তু যখন কোনো কিছুর সত্যতাকে ভিতর থেকে পূর্ণভাবে দেখতে পাও না বা অনুভব করো না তখনই তোমরা বলো একে দৈনন্দিন আচরণে আনা কঠিন। আসলে তোমরা আমি যা বলছি সেগুলোকে ভালোবাসো না। যা তোমরা ভালোবাসো, কতো গভীর যত্নের সাথে সেগুলো করো। সেখানে আনন্দ থাকে। তখন বাবা-মা কী বলল, সমাজ কী বললো— তাতে তোমাদের কিছুই যায় আসে না। কিন্তু যদি নিজের ভিতরেই তার সম্পর্কে কোনো প্রতীতি না জন্মায়, যা ঠিক বলে মনে করছো তা করতে গিয়ে যদি মুক্তির ও আনন্দের অনুভূতি না থাকে, তাহলে যা ভালো লাগে বলো— তা মিথ্যা। আর ভালো না লাগলে সেই জিনিসটা উঁচু পর্বতের মতোই দুর্লঙ্ঘ্য লাগবে। তখনই তোমরা বলবে— যা বলছেন, তা আচরণে আনা কঠিন।

যা করতে ভালোবাসো, তা করতে গিয়ে যে বাধা আসবে না তেমন নয়, কিন্তু সেটা তোমার কাছে কোনো বড়ো ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে না, কারণ সেটা জীবনেরই একটা অংশ। আমরা আমাদের বাধাগুলো নিয়েও একটা দর্শন খাড়া করি, আর চেষ্টা, সংগ্রাম, প্রতিরোধ— এগুলোকে বিরাট সদ্‌গুণ বলে মনে করি।

আমি, অনেক চেষ্টা, অনেক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যে দক্ষতা আসে সেই নিয়ে কথা বলছি না। আমি কোনো কাজ ভালোবাসার সাথে করার কথা বলছি। যদি তোমার মধ্যে ভালোবাসার সেই প্রদীপ্ত শিখা না থাকে, তবে সমাজের বিরুদ্ধে, সংস্কারের বিরুদ্ধে, পরম্পরার বিরুদ্ধে এটা-সেটা করতে যেও না। সেটা অর্থহীন তো বটেই বরং সেটা আরো দুর্গতি নিয়ে আসবে। অপরপক্ষে সঠিকটাকে যদি গভীরভাবে অনুভব করো এবং সেইজন্য যদি একা দাঁড়াতে পারো, তখনই সেই ভালোবাসা থেকে আসা প্রত্যেক কাজের মধ্যে

এক ভিন্ন তাৎপর্য, অফুরন্ত প্রাণ আর সৌন্দর্য থাকবে।

তোমরা কি জানো কোনো শান্ত মন, স্থির মনের গর্ভেই মহান বস্তু জন্মায়, আর চেষ্টা করে, নিয়ন্ত্রণের ও অনুশাসনের মাধ্যমে এই প্রশান্ত মন লাভ করা যায় না।

প্রশ্নকারী ঃ *আমূল পরিবর্তন বলতে আপনি কী বোঝাতে চান, একজন ব্যক্তির জীবনে বা সত্তায় তা কী করে আসবে?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ তোমার কি মনে হয় এর জন্য যদি প্রচেষ্টা করো তাহলে এই পরিবর্তন ঘটবে? পরিবর্তন মানে কী— সেটা কি জানো? ধরো তুমি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। এখন তুমি উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে জড়িত সব বস্তু যেমন ঃ আশা, সন্তুষ্টি, হতাশা, ক্রুরতা, দুঃখ, অন্যের প্রতি অবিচারী হওয়া, লোভ, ঈর্ষা, ভালোবাসার অভাব— এসব দেখতে আরম্ভ করলে। এইসব দেখার পর তুমি কী করবে? এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে পরিবর্তিত করা বা রূপান্তর করার চেষ্টাও উচ্চাকাঙ্ক্ষারই আর এক রূপ, নয় কি? এর অর্থ হলো তুমি অন্যরকম হওয়ার ইচ্ছা করছো। তুমি হয়তো একটা কামনাকে বর্জন করলে, কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্যে তুমি আর একটা আকাঙ্ক্ষার নির্মাণ করলে, তাকে লালন করলে— ওটাও দুঃখ আনবে।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা দুঃখ আনে এবং এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে শেষ করার যে ইচ্ছা সেটাও দুঃখ আনে— যদি এই সত্যকে তুমি পরিষ্কারভাবে দেখতে পাও, তাই কোনোভাবেই এই উচ্চাশার ব্যাপারে কিছু না করো অর্থাৎ কোনো চেষ্টা না করো, কেবল ঐ সত্যকে তার নিজের কাজ মুক্ত-ভাবে করতে দাও, তখন ঐ সত্যই এক মৌলিক পরিবর্তন আনে এবং এটাই পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব। কিন্তু এরজন্য গভীর মনোযোগ, সূক্ষ্মতা আর অন্তর্দৃষ্টি চাই।

যখন তোমাদের বলা হয় তোমাদের ভালো হতে হবে, তোমাদের

ভালোবাসতে হবে, তখন কী ঘটে? তখন তোমরা বলো 'আমাকে ভালো হতেই হবে, তারজন্য যা যা অভ্যাস দরকার আমাকে করতে হবে, আমার বাবা-মায়ের প্রতি, বাড়ীর কাজের মানুষটার প্রতি, অথবা গাধাটার প্রতি আমাকে ভালোবাসা দেখাতেই হবে'। এর অর্থ ভালোবাসা দেখাবার জন্য তোমার প্রচেষ্টা চলছে। সেই ভালোবাসা নিরেস, তুচ্ছ। যাঁরা জাতীয়তাবাদ নিয়ে মাতামাতি করেন তাঁদের মধ্যে এটা খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে। তাঁরা সৌভ্রাতৃত্বের বোধ আনার জন্য অভ্যাস করছে চলেছেন। কী অগভীর এইসব। আসলে লোভ এইসব অভ্যাস করায়। কিন্তু যদি তুমি এই জাতীয়তাবাদ, এই লোভের অন্তর্গত সত্যটাকে দেখতে পাও এবং সেই সত্যকে ক্রিয়া করতে দাও, দেখবে বিনা চেষ্টায় তুমি বন্ধুতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছ। ভালোবাসার অভ্যাস করতে গেলে কোনোদিন ভালোবাসা যাবে না। কিন্তু যদি ভালোবাসো, আর কোনো কিছুর জন্যই তাতে হস্তক্ষেপ না করো, তবে ভালোবাসা নিজেই তার কাজ করে চলবে।

প্রশ্নকারী ঃ *আত্মবিস্তার কী?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ তুমি যদি রাজ্যপাল হতে অথবা বিখ্যাত অধ্যাপক হতে চাও, যদি বড়ো ব্যক্তিকে বা কোনো নায়ককে অনুকরণ করতে অথবা তোমার গুরু বা কোনো মহাত্মাকে অনুসরণ করতে চাও— তখন সেই কিছু হতে চাওয়া, হয়ে ওঠা, অনুকরণ বা অনুসরণের প্রক্রিয়া হলো আত্মবিস্তারের এক রূপ, নয় কি? যে মহান হতে চাইছে বা কিছু পেতে চাইছে, এমন কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক মুখে বলতেই পারেন 'আমি এটা শান্তির জন্য করছি, আমি এটা দেশের জন্য করছি'। আসলে তার ঐ ক্রিয়াগুলো আত্মসম্প্রসারণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রশ্নকারী ঃ *ধনীরা এতো গর্বিত কেন?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ একটা বাচ্চা ছেলে প্রশ্ন করছে ধনীরা এতো গর্বিত কেন? তুমি কি সত্যিই দেখেছো ধনীরা গর্বিত? আচ্ছা বলোতো দরিদ্রের কি গর্ব থাকে না? আমাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু নিজ নিজ ধরণের আত্মাভিমান আছে, ঔদ্ধত্য আছে। আমরা বিভিন্ন উপায়ে ওগুলোকে প্রকাশ করি? ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, যার কোনো বিষয়ে দক্ষতা আছে, সাধু, নেতা— তাঁদের প্রত্যেকে নিজ নিজ ধরণে মনে করেন তাঁরা সফলতা পেয়েছেন, তিনি কোনো একটা স্তরে পৌঁছে গেছেন, তিনি বিশিষ্ট কেউ বা তিনি কিছু করার সামর্থ্য রাখেন। কিন্তু যে মানুষ সাধারণ, যিনি কিছু বা কেউ একটা হয়ে উঠতে চান না, যিনি নিজে যা— তেমনই, যিনি নিজেকে উপলব্ধি করেন— তাঁর কোনো ঔদ্ধত্য, কোনো গর্ব থাকে না।

প্রশ্নকারী ঃ *আমরা কেন সর্বদা 'আমি' এবং 'আমার' এতেই বন্দী হয়ে থাকি, এবং কেন আপনার সাথে মিলিত হলে ঐ ধরণের মানসিক অবস্থা থেকে উৎপন্ন প্রশ্নগুলো আপনার সামনে তুলে ধরি?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ তুমি কি সত্যি এটা জানতে চাও, নাকি কেউ তোমাকে দিয়ে প্রশ্নটা করিয়েছে? 'আমি' এবং 'আমার' এর সমস্যার রজ্জুতে আমরা সকলেই বাঁধা আছি। সত্যি কথা বলতে কী এটাই মানুষের একমাত্র সমস্যা। আমরা চিরকাল একে নিয়েই কথা বলেছি, কেবল তার রূপটা ভিন্ন— কখনও সেটা কিছু পাওয়া বা পরিপূর্ণতালাভরূপে আবার কখনও সেটা হতাশা, দুঃখরূপে ফিরে ফিরে আসছে। স্থায়ী সুখ, মৃত্যুর ভয়, সম্পত্তি হারাবার উদ্বেগ, প্রশংসিত হওয়ায় আত্মতৃপ্তি, অপমানিত হওয়ায় বিরক্তি, তোমার ঈশ্বর বড়ো না আমার ঈশ্বর এই নিয়ে মনান্তর, তোমার জীবনের দর্শন ও পথ আর আমার জীবনের দর্শন ও পথের পার্থক্য— মন অদ্ভুতভাবেই সারাদিন প্রতিদিন এই নিয়েই ব্যস্ত। এ হয়তো ভান

করলো এ শান্তি চায়, এ বন্ধুতা, কল্যাণময়তা বা প্রেম অনুভব করছে, কিন্তু এই শব্দের অন্তরালে মন 'আমি' আর 'আমার' দ্বারা ঘোষিত যুদ্ধে ব্যস্ত; সেখান থেকেই আসে হাজার সমস্যা আর প্রত্যেক সকালে আমার সাথে যখন তোমাদের দেখা হয় তোমরা ভিন্ন ভিন্ন শব্দে সেগুলোই আমাকে শোনাও।

প্রশ্নকারী ঃ *মেয়েরা এতো সাজে কেন?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ ওদের কি এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করোনি? কোনোদিন পাখীদের লক্ষ্য করেছো? দেখবে ছেলে পাখীদেরই বেশী রঙ-ঢঙ থাকে, তাদেরই প্রাণবন্ততা, প্রফুল্লতা বেশী থাকে। শারীরিকভাবে আকর্ষক হওয়া হলো যৌন সম্পর্কের একটা দিক— যার ফলে সন্তানের জন্ম হতে পারে। এটাই জীবন। ছেলেরাও এটা করে থাকে। তারা যখন বড়ো হয়, তারাও একটা বিশেষভাবে চুল আঁচড়ায়, ভালো টুপি পরে, আকর্ষক পোশাক-পরিচ্ছদ পরে, যেটা ঐ একই ব্যাপার। আমরা সবাই দেখাতে চাই। কোনো ধনী বহুমূল্য গাড়ির মাধ্যমে, মেয়েরা যাতে তাদের আরো সুন্দর দেখায় তার মাধ্যমে, ছেলেরা তাদের যাতে আরো প্রানবন্ত, দক্ষ দেখায় তার মাধ্যমে— তার সকলে আসলে নিজেদের সেই দেখাতেই চায়। তারা দেখাতে চায় তারা বিশেষ কিছু। এটা একটা অদ্ভুত পৃথিবী তাই না? একটা পদ্ম বা গোলাপ কোনোদিন ভান করে না, এরা বাস্তবিক যা এরা তাই, আর ওটাই ওদের সৌন্দর্য।

২১

শেখা

শেখা কী? এ প্রশ্নটাকে নিয়ে আলোচনা, একে খোঁজাতে কি তোমাদের উৎসাহ আছে? স্কুলে তোমরা শিখতে যাও, তাই না? কিন্তু এই শেখা ব্যাপারটা আসলে কী? কোনোদিন কি এ ব্যাপারে ভেবেছো? তোমরা কেমনভাবে শেখো, কেনই-বা শেখো এবং কী শেখো? এই শেখার গভীর অর্থ কী, জীবনে এর তাৎপর্যই-বা কী? তোমাদের লিখতে-পড়তে-শিখতে হয়, বিভিন্ন বিষয় পড়তে হয়, বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োগের কৌশল জানতে হয় এবং কোনো একটা ক্ষেত্রে কাজের জন্য নিজেদের তৈরী করতে হয় কারণ জীবিকা অর্জনটাও জরুরী। যখন আমরা শেখা নিয়ে কথা বলি, মোটামুটি আমরা এগুলোই বোঝাতে চাই এবং সেখানেই থেমে যাই। তারপর পরীক্ষাপাশগুলো হয়ে গেলে, একবার কোনো একটা চাকরি বা একটা আয়ের সংস্থান হয়ে গেলে, আমরা শেখা সম্পর্কে ভুলে যাই।

এখন প্রশ্ন হলো শেখার কি শেষ আছে? আমরা বলি বই থেকে শেখা আর অভিজ্ঞতা থেকে শেখা দুটো পৃথক জিনিস; সত্যি কি তারা পৃথক জিনিস? বই থেকে আমরা কী শিখি? ধরো বিজ্ঞান সম্পর্কে অন্য লোকের লেখা থেকে কিছু শিখি। এটা একটা উদাহরণ। তারপর আমরা নিজেরাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করি এবং ঐসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে আমাদের শেখা চলতে থাকে। আমরা অভিজ্ঞতা

থেকেও শিখি, এরকম একটা ধারণা আমাদের মধ্যে আছে। কিন্তু জীবনের অতলতাকে উপলব্ধি করতে হলে, ঈশ্বর কী বা পরম কী তার অন্বেষণ করতে হলে মনের একটা মুক্ত অবস্থার প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হলো খোঁজার জন্য, শেখার জন্য যে মুক্ত মনের প্রয়োজন, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কি আমরা সেটা লাভ করি?

তোমরা কি কোনোদিন ভেবেছো এই অভিজ্ঞতা আসলে কী? এটা হলো কোনো একটা চ্যালেঞ্জে সাড়া দেওয়ার যে অনুভূতি, নয় কি? কোনো চ্যালেঞ্জে সাড়া দেওয়াই অভিজ্ঞতা। আমরা কি অভিজ্ঞতা থেকে শিখি? যখন বাইরে থেকে আসা কোনো চ্যালেঞ্জ বা উত্তেজনায় আমরা সাড়া দিই, সেটা আমাদের সংস্কার, আমাদের শিক্ষা, আমাদের সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ, অর্থনৈতিক পটভূমির (background) উপর নির্ভর করে। হিন্দু, খ্রিস্টান, কমিউনিস্ট বা যা যা হতে পারে সেগুলোর দ্বারা তোমরা সংস্কারাবদ্ধ এবং কোনো চ্যালেঞ্জে যখন তোমরা সাড়া দাও তা সেই সংস্কার থেকেই আসে। যদি এই পটভূমি ছেড়ে, এই সংস্কারকে ভেঙে না বেরোতে পারো তাহলে প্রত্যেক চ্যালেঞ্জের প্রত্যেক সাড়া দেওয়া ঐ পটভূমিকে বা ঐ সংস্কারকে আরো পাকাপোক্ত করে অথবা তার একটু অদল-বদল করে, তাই ঈশ্বর কী, সত্য কী— তার অন্বেষণের জন্য তাকে উপলব্ধির জন্য মন কখনোই মুক্ত হয় না।

সুতরাং, অভিজ্ঞতা কিন্তু মনকে মুক্ত করে না, বরং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা ঐ পুরানো সংস্কারগুলোর উপরই ভিত্তি করে নিজেদের মধ্যে আরো কিছু নতুন রীতি বা কাঠামো তৈরী করি। আমার মনে হয় এটা বোঝা সত্যি জরুরী, কারণ অভিজ্ঞতা থেকে শেখা যাবে, এই আশাতে আমরা আরো-আরো এর দুশ্ছেদ্য জালে জড়াতে থাকি। আসলে আমরা যা শিখি তা ঐ পটভূমি নির্দেশিত। এর অর্থ হলো অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা যা শিখি তাতে আমরা

কখনোই মুক্ত হই না, তা কেবল আমাদের পুরানো সংস্কারের একটু এখানে, একটু সেখানে পরিবর্তন করে দেয় মাত্র।

তাহলে এখন বলো শেখা কী? তোমরা কীভাবে লিখতে হবে, পড়তে হবে, শান্ত হয়ে বসতে হবে, কীভাবে কথা মানতে হয়, কীভাবে মানতে হয় না— এইসব দিয়ে শুরু করো। তারপর তোমরা এদেশের বা অন্য দেশের ইতিহাস পড়ো, কথা বলবার জন্য যে যে ভাষার প্রয়োজন সেগুলো শেখো, জীবিকার্জন করা, কীভাবে কোনো শস্যক্ষেত্রকে উর্বরা করা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেক কিছু শেখো। কিন্তু শেখার এমন কি কোনো অবস্থা আছে, যেখানে মন তার পশ্চাদ্‌ভূমি থেকে, তার সব সংস্কার থেকে মুক্ত এবং এমন এক অবস্থা যেখানে মন কিছু খুঁজছে না? প্রশ্নটা কি বুঝতে পারলে?

আমরা যাকে শেখা বলি সেটা আসলে মানিয়ে নেওয়ার জন্য এটা-ওটা করা বা কোনো কিছুকে প্রতিরোধ করা, কোনো কিছুকে অধিকার করা ইত্যাদির এক অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। আমরা শিখি— কোনো কিছুকে দূরে সরিয়ে রাখা বা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য অথবা কোনো কিছু লাভ করার জন্য। তাহলে এমন কি কোনো অবস্থা আছে যাতে মন ঐরকম শেখার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত না হয়ে কেবল শুদ্ধ চৈতন্যে বিরাজ করে, তথা তার এক শুদ্ধ বিরাজমানতা থাকে। পার্থক্যটা কি দেখতে পাচ্ছো? যতক্ষণ আমরা কিছু সংগ্রহ করতে চাইছি, কিছু অর্জন করতে তথা কিছু পেতে চাইছি, কিছুকে দূরে সরিয়ে রাখতে বা এড়িয়ে যেতে চাইছি ততক্ষণ মনকে শিখতেই হবে, কিন্তু সেই শেখায় প্রচুর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং এটাকে-ওটাকে বাধা দেওয়া থাকবে। শিখতে গেলে মনকে অবশ্যই একাগ্র হতে হবে। একাগ্রতা কী?

যখন কোনো কিছুতে একাগ্র হও তখন কী ঘটে? যখন তোমাকে কোনো বই পড়তে হয়, যে বই তুমি পড়তে চাও না বা চাও—

দুক্ষেত্রেই তোমাদের অন্য সব জিনিসকে সরিয়ে রাখতে হয়। একাগ্র হতে গিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাবার ইচ্ছা বা কারোর সাথে কথা বলার ইচ্ছেকে বাধা দিতে হয়। সুতরাং একাগ্রতার সাথে সবসময়ই একটা প্রতিরোধের ব্যাপার বা বাধা দেওয়ার ব্যাপার আসে। তাই এর সাথে একটা চেষ্টা থেকেই যায়, নয় কি? একাগ্রতার পিছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে, একটা প্রলোভন থাকে, কোনো কিছু লাভ করার জন্যই একটা শেখার চেষ্টা থাকে। আমাদের জীবন আসলে ধারাবাহিক অসংখ্য প্রচেষ্টা; এখানে উদ্বেগময় অবস্থায় আমরা শেখার চেষ্টা করে চলেছি। কিন্তু যদি উদ্বেগ না থাকে, যদি কোনো কিছু অর্জন করতে হবে এই ব্যাপারটা না থাকে, নিজ ভাণ্ডারে জ্ঞান স্তূপীকৃত করা না থাকে তাহলে কি মন অনেক গভীরতার সাথে, অনেক ত্বরিত গতিতে শিখতে পারবে না? আসলে তখনই কিন্তু এটা সত্য কী, ঈশ্বর কী, সৌন্দর্য কী— তা অন্বেষণের এক মাধ্যম হতে পারে। যার অর্থ তখন এই মন কোনো কিছুর কর্তৃত্ব মেনে নেবে না, কিছুতে আশ্রয় নেবে না; সে আশ্রয়, সে কর্তৃত্ব— জ্ঞানেরই হোক বা সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি বা সংস্কারেরই হোক। সে মন এইসব কিছু থেকে মুক্ত।

যখন মন জ্ঞানের বোঝা থেকে মুক্ত, তখনই সে সত্য কী— তার অন্বেষণ করতে পারে। এই অন্বেষণের প্রক্রিয়ায় কোনো সঞ্চয় থাকে না, নয় কি? যে মুহূর্তে তোমরা যা অনুভব করছো, যা যা শিখছো তা জমাতে থাকো, সেটা নোঙরের মতো হয়ে যায়, তা মনের সামনে এগিয়ে যাওয়াকে বাধা দেয়। এই অন্বেষণের প্রক্রিয়ায় মন প্রতি মুহূর্তে তার সব শেখাকে বিসর্জন দেয়। তাই মন থাকে স্বচ্ছ। গতকালের বাসি অভিজ্ঞতার আবর্জনায় তা আবিল নয়। সত্য প্রাণময়, এ কোনো বদ্ধ বা স্থাণু কিছু নয়, তাই যে মন এই সত্যকে অন্বেষণ করবে, তাকেও প্রাণপূর্ণ হতে হবে। প্রচুর জ্ঞান আর অগণন অভিজ্ঞতার মৃত ভার থেকে মুক্ত হতে হবে।

তখনই এমন এক অবস্থা আসে যেখানে সত্যের প্রকাশ ঘটা সম্ভব।

মৌখিকভাবে হয়তো শুনতে কঠিন লাগছে, কিন্তু যদি তোমাদের সম্পূর্ণ মনকে একবার এতে দাও দেখবে এ সহজ ব্যাপার। জীবনের গভীর বিষয়গুলোর ব্যাপারে অন্বেষণ করতে হলে মনকে মুক্ত হতে হবে। কিন্তু যে মুহূর্তে, তুমি যা শিখছো, সেই শেখাকে তোমার সামনের অন্বেষণের ভিত্তি হিসাবে কাজে লাগাও, তখনই মন আর মুক্ত অবস্থায় থাকে না আর তোমার অন্বেষণেরও সেখানেই সমাপ্তি ঘটে।

প্রশ্নকারী ঃ *যেটা আমাদের শিখতে কঠিন লাগে কেন আমরা সেটা তাড়াতাড়ি ভুলে যাই?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ তোমরা কি এই জন্যই শিখছো কারণ পরিস্থিতি তোমাদের শিখতে বাধ্য করছে? তুমি হয়তো উকিল হতে চাও, অথচ তুমি পদার্থবিদ্যা বা গণিত পড়ছো তাহলে অতি শীঘ্রই সেগুলো ভুলে যাবে। যদি শেখার পিছনে কোনো প্রলোভন থাকে সত্যি কি তখন শিখতে পারা যায়? যদি একটা চাকরি পাওয়া বা একটা বিবাহের জন্যই পরীক্ষা পাশ করতে চাও তাহলে তার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো তোমরা অবশ্যই শেখার চেষ্টা করবে, তাতে একাগ্র হওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু যখন পরীক্ষাগুলো পাশ করে যাবে, ব্যস, ওগুলোও ভুলতে থাকবে, তাই তো? শেখা যখন কেবলমাত্র কোথাও পৌঁছোবার জন্যই হয়, তখন সেখানে পৌঁছোবার সাথে সাথেই তোমরা তার উপায়টা ভুলতে থাকো, সেই পথটা ভুলতে থাকো। অবশ্যই এটা শেখা নয়। অতএব যখন শেখার পিছনে কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, কোনো প্রলোভন থাকে না, কোনো উত্তেজনা থাকে না, যখন তুমি যেটা করো সেটার প্রতি তোমার হৃদয়ে পূর্ণ ভালোবাসা আছে বলেই করো, তখনই প্রকৃত শেখার অবস্থা আসে।

প্রশ্নকারী ঃ *প্রগতি কথার তাৎপর্য কী?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ অধিকাংশ লোকের মতো তোমারও আদর্শ আছে, তাই তো? আদর্শ সত্য নয়, বাস্তবও নয়, ওটা হলো কী হওয়া উচিত, ওটা হলো এমন কিছু যেটা ভবিষ্যতের সাথে যুক্ত। এখন আমি বলি ঃ আদর্শকে ভুলে যাও এবং নিজে ঠিক যা, সে ব্যাপারে সচেতন হও। কী হওয়া উচিত (what *should* be) তার পিছে ধাওয়া না করে, তোমার মধ্যে বর্তমান 'যা আছে' (What *is*) তাকে উপলব্ধি করো। যা হওয়া উচিত— সেই মরীচিকার পিছনে ছোটার থেকে তুমি বাস্তবিক যা— তাকে উপলব্ধি অনেক অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কেন? তার কারণ হলো তুমি ঠিক যা, তার উপলব্ধিতে তোমার মধ্যে এক সহজ রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়। অপরপক্ষে তোমার যা হওয়া উচিত বলে মনে করো, তার চেষ্টায় যদি তুমি থাকো, তখন বস্তুত কোনো পরিবর্তনই হয় না। এতে তোমার পুরোনো অবস্থাটাই ভিন্নরূপে এগিয়ে চলে। ধরো, মন দেখলো সে বুদ্ধিহীন, এই বুদ্ধিহীনতাকে যদি সে বুদ্ধিমত্তায় পরিবর্তন করতে চায় তাহলে সেটা হবে মূঢ়তা, এর কোনো বাস্তবিকতা নেই। এই বুদ্ধিমত্তা আসলে তার নিজের সৃষ্ট একটা কল্পনা, আর তার সব চেষ্টা আসলে যেটা তার হওয়া উচিত বলে মনে হয় সেই কল্পনারই পিছনে দৌড় এবং এটা এই মুহূর্তে তার যে বাস্তবিক অবস্থা সেটাকে উপলব্ধি করাকে দূরে সরিয়ে রাখা। যতক্ষণ পর্যন্ত মন তার মূঢ়তাকে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত করতে চায়, ততক্ষণ সে মূঢ়ই থাকে। কিন্তু মন যদি বলে, ‘‘আমি বুঝতে পারছি আমি মূঢ়, কিন্তু এই মূঢ়তাটা আসলে কী সেটা আমি বুঝতে চাই; সুতরাং আমি এর ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করবো, আমাদের সত্তায় কী করে এর জন্ম হয় সেটাও জানার চেষ্টা করবো’’— তখন এই অন্বেষণের প্রক্রিয়াই এক মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসে।

‘‘প্রগতি কথাটার তাৎপর্য কী?’’ প্রগতি বলে কি কিছু হয়?

তোমরা দেখো গরুর গাড়ি ঘন্টায় দুই মাইল যায়, আর এক অসাধারণ বস্তু জেটপ্লেন ঘন্টায় ছয়শত বা তার চেয়েও বেশী মাইল যায়। এটা প্রগতি, তাই তো? প্রাযুক্তিক উন্নতি রয়েছে, যেমন আরো ভালোভাবে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাবার ব্যবস্থা, ভালো স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যের সুরক্ষা ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন অন্যপ্রকার প্রগতিও কি আছে? মানসিক উন্নতি বলে কি কিছু হয় অর্থাৎ আমি বলতে চাই সময়ের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক উন্নতি কি সম্ভব? আধ্যাত্মিক উন্নতির যে আদর্শটা— সেটা কি আদৌ আধ্যাত্মিক, নাকি মনেরই একটা আবিষ্কার মাত্র?

আসলে মৌলিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা সত্যিই জরুরী। দুর্ভাগ্যজনক-ভাবেই ঐসব প্রশ্নের আমরা সহজ উত্তর পেয়ে যাই, আর এই সহজ উত্তরগুলোকেই আমরা সমাধান ভাবি। আমরা ভাবি আমাদের সন্দেহ নিবৃত্তি হয়ে গেছে। আমাদের উচিত মৌলিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং সেই প্রশ্নকে তার নিজের কাজ করতে দেওয়া, সেই প্রশ্নকেই আমাদের অন্তরের অন্তরে তার নিজের সত্যতা, নিজের যাথার্থ্য খুঁজতে দেওয়া।

প্রগতির সাথে সময় ব্যাপারটাও থাকে, তাই নয় কি? যাই হোক না কেন, গরুর গাড়ী থেকে জেটপ্লেনে পৌঁছোতে আমাদের শতাব্দীর পর শতাব্দী লেগে গেছে। আমরা মনে করি একইভাবে অর্থাৎ সময়কে ব্যবহার করে বা সময়ের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরকে বা পরমকে খুঁজে বার করবো। ধারণাটা হলো— আমরা এখানে আছি, ঈশ্বর ওখানে কোথাও আছেন, অনেক দূরে কোথাও, এখন এই মধ্যের ব্যবধান অতিক্রম করার জন্য আমাদের সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু, না ঈশ্বর স্থির, না পরম স্থির, না আমরা স্থির। এমন কোনো নিশ্চিত বিন্দু এক্ষেত্রে নেই, যেখান থেকে আমাদের শুরু করতে হবে, এমন কোনো নিশ্চিত বিন্দু নেই যেখানে আমাদের পৌঁছোতে হবে। মানসিক

সুরক্ষার কারণেই আমরা আমাদের মধ্যে একটা স্থির কিছু আছে— এই ধারণাটাকে আঁকড়ে থাকি এবং ভাবি পরমও স্থির, কিন্তু এটা ভ্রম। যে মুহূর্তে অন্তরের বা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আমরা সময় চাই, তখন আমরা যা করি তা আর আধ্যাত্মিক থাকে না, কারণ সত্য— সময়ের অতীত। যে মন সময়ের জালে আটকে পড়ছে সে পরমের অন্বেষণেও সময়ের দাবী করবে। কিন্তু পরম— সময়ের অতীত, এর কোনো স্থির বিন্দু হয় না। আসলে মনকে তার সকল চেতন ও অবচেতন সঞ্চয়কে বিসর্জন দিতে হবে, তবেই সে— ঈশ্বর কী, পরম কী— তা খুঁজতে সমর্থ হবে।

প্রশ্নকারী ঃ *আমি কাছে এলে পাখিরা উড়ে পালায় কেন?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ যখন তুমি কাছে যাও, তখন পাখিরা যদি উড়ে না পালাতো, তাহলে কতোই ভালো হতো— তাই তো? যদি ছুঁতে পারতে, যদি বন্ধু পাতাতে পারতে, কতো ভালো হতো— তাই তো? কিন্তু কী করবে বলো, আমরা মানুষেরা যে ভারী নৃশংস। আমরা পাখি মারি, তাদের উত্যক্ত করি, জাল দিয়ে তাদের ধরি, খাঁচায় বন্দী বানিয়ে রাখি। ভাবো তো, একটা মিষ্টি টিয়া তারের খাঁচায় বন্দী। প্রত্যেক সন্ধ্যায় আকুল হয়ে সে তার সাথীকে ডাকে, ফ্যালফ্যাল করে অন্য পাখিদের আকাশে আকাশে উড়ে যেতে দেখে। আমরা যখন পাখিদের সাথে এমন ব্যবহার করি তখন কীভাবে ভাববো যে তারা আমাদের দেখলেই দূরে পালাবে না? কিন্তু যদি কোনোদিন কোনো নিরালা জায়গায় গিয়ে চুপচাপ বসো, সত্যিই একেবারে সরল হয়ে চুপ করে বসা যাকে বলে তেমন করে বসো, তবে দেখবে পাখিরা একটু একটু করে কাছে আসছে, আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে। তুমি তাদের অতি সতর্ক গতি ভঙ্গি, তাদের নরম নরম পায়ের আঙ্গুল, তাদের ডানায় ভরা প্রাণ আর সৌন্দর্য সব দেখতে পাবে। কিন্তু এমনটির

জন্য অপার ধৈর্য্য চাই, নিজের মধ্যে অণুমাত্র ভয় থাকলে চলবে না, চাই অফুরান ভালোবাসা। কোনো-না-কোনোভাবে প্রাণীরা আমাদের মধ্যের ভয়কে বুঝতে পরে, তাই তারাও ভয় পেয়ে দূরে পালায়। এইসবের জন্যই নিজেকে বোঝা জরুরী।

কোনো গাছের নীচে গিয়ে চুপচাপ বসো, দু-তিন মিনিটের জন্য নয়, কারণ এতো অল্প সময়ের মধ্যে ওরা তোমার উপস্থিতিতে সহজ হতে পারবে না। রোজ যাও, রোজ গিয়ে একই গাছের তলায় শান্ত হয়ে বসো, শীঘ্রই তুমি লক্ষ্য করবে তোমার চারপাশটা আসলে জীবন্ত। দেখবে ঘাসের পাতা সূর্যের আলোয় চকচক করছে, ছোটো ছোটো পাখিগুলো অবিরাম কিছু-না-কিছু করছেই। হয়তো দেখতে পাবে সাপের গায়ের উজ্জ্বল নকশা অথবা আকাশের কোন্ সুদূরে একটা ঘুড়ি হাওয়ার আনন্দে স্থির হয়ে ভেসে আছে। কিন্তু এদের দেখতে গেলে, সেই আনন্দের ঢেউয়ে ভাসতে হলে, নিজের মধ্যে এক সত্যকার প্রশান্তি প্রয়োজন।

প্রশ্নকারী ঃ *আপনার এবং আমার মধ্যে পার্থক্য কী?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ সত্যি কি মৌলিকভাবে আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? হয়তো তোমার গায়ের রঙ পরিষ্কার, আমার রঙটা চাপা, তুমি হয়তো আমার থেকে চালাক, অনেক বেশী জানো, আমি হয়তো গ্রামে থাকি তুমি হয়তো সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াও ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশ্যই আমাদের আকৃতি, আমাদের কথাবার্তা ও ধরণ-ধারণ, আমাদের জ্ঞান, আমাদের পরম্পরা বা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আলাদা। অন্যদিকে আমরা ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ হই বা আমেরিকান, জাপানী, রুশ বা চৈনিক হই, আমাদের মধ্যে কি এক অসামান্য সাদৃশ্য নেই? আমরা সকলেই ভয় পাই, নিরাপত্তা চাই, আমরা ভালোবাসা পেতে চাই, আমরা সকলে খেতে চাই, আমরা সুখী হতে ভালোবাসি। কিন্তু দেখবে

উপরের কতকগুলো পার্থক্য আমাদের মধ্যে মানুষ হিসাবে যে একটা মৌলিক অভিন্নতা রয়েছে, তার চেতনাকেই দুমড়ে-মুচড়ে শেষ করে ফেলে। এই মৌলিক অভিন্নতা, এই অনুরূপতাকে উপলব্ধি করা এবং তার থেকে মুক্ত হওয়া— এক প্রেম, এক গভীর বিচারশীলতার জন্ম দেয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবেই আমরা এই পার্থক্যের জালে আটকা পড়ি, আর তাই জাতি, সংস্কৃতি, বিভিন্ন উপরভাসা পার্থক্য, বিভিন্ন বিশ্বাসের দ্বারা বিভক্ত হয়ে পড়ি। বিশ্বাস একটা অভিশাপ, এটা মানুষে মানুষে বিরোধ বাধায়, একজনকে আর একজনের শত্রু করে তোলে। মন যখন সব বিশ্বাস, সব পার্থক্য আর সব সাদৃশ্যের সীমানা অতিক্রম করে, তখনই সে মুক্ত হয়ে সত্যের অন্বেষণ করতে পারে।

প্রশ্নকারী ঃ *যখন আমি ধূমপান করি তখন কোনো শিক্ষক কেন বিরক্ত হন?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ হয়তো, তিনি তোমাকে আগেও অনেকবার বারণ করেছেন। এর কারণ, ছোটো ছেলেদের শরীরের পক্ষে তো ওটা একদমই ভালো না। কিন্তু তুমি শোনোনি। তোমার ওর স্বাদটা ভালো লাগে তাই তুমি ধূমপান করো এবং শিক্ষকও রেগে যান। এখন তোমাকেই আমি প্রশ্ন করছি— এ ব্যাপারে তুমি কী মনে করো? তুমি কি মনে করো তোমার মতো বয়সে কারোর ধূমপান বা অন্য কোনো অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়া উচিত? যদি এই বয়সেই শরীর ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তুমি ইতিমধ্যেই একটা কিছুর দাসত্ব স্বীকার করে নিলে; তোমার কি মনে হয় না এটা ভয়ঙ্কর জিনিস? বয়স্কদের ক্ষেত্রে হয়তো সেটা তবুও চলে, তবু তাতে চরম সন্দেহ থেকেই যায়। দুর্ভাগ্যজনকভাবেই বয়স্করা কতকগুলো অভ্যাসের দাসত্ব করার ব্যাপারে বিভিন্ন অজুহাত খাড়া করে থাকেন। কিন্তু তুমি এখন তো ছোটো, অপরিণত, এখানো তোমার বিকাশ চলছে— এখনই কেন অভ্যাসের জালে আটকে যাবে,

যা কেবল তোমায় অসংবেদনশীল করে তোলে? যখনই মন কোনো কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তখন ওটা কেবল অভ্যাসের বাঁধা পথেই চলাচল করে, তাই তা ভোঁতা হতে শুরু করে, সকল কিছুর প্রতি তার আর উন্মুক্ততা থাকে না, সে তার সূক্ষ্মবোধক্ষমতা হারাতে থাকে। আর ঈশ্বর কী, সৌন্দর্য কী, প্রেম কী— খোঁজ করতে হলে ঐসব কিছুর খুব প্রয়োজন।

প্রশ্নকারী ঃ *মানুষ বাঘ শিকার করে কেন?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ কোনো কিছুকে হত্যা করার উত্তেজনা উপভোগ করার জন্যই তারা হত্যা করে। আমরা অনেক কাজই অবুঝের মতো করি, যেমন ধরো, পতঙ্গের দুটো ডানা ছিড়ে দিয়ে দেখি কী হয়। আমরা বসে বসে খোশগল্প করি আর অন্যের সম্পর্কে কঠোর কথাবার্তা বলি; কেবল কোনো কিছুকে খাবো বলেই আমরা তাকে হত্যা করি; আমরা তথাকথিত শান্তির জন্য হত্যা করি; আমরা আমাদের দেশের জন্য, আমরা যা বিশ্বাস করি সেই আদর্শের জন্যও হত্যা করি। আমাদের মধ্যে নির্দয়তার একটা লক্ষ্যণীয় অংশ রয়েছে, নয় কি? কিন্তু যদি এটা বুঝতে পেরে আমরা একে সরিয়ে রাখি, তবে কাছ দিয়ে কোনো বাঘের চলে যাওয়ার দৃশ্য কী অসাধারণ। আমরা কয়েকজন সন্ধ্যাবেলা বোম্বের কাছে তেমনই একবার দেখেছিলাম। আমাদেরই এক বন্ধু তাঁর গাড়িতে করে একটা বাঘকে দেখার জন্য আমাদের জঙ্গলে নিয়ে যান। আসলে একজন বলেছিলেন, তিনি নাকি ওর আশেপাশেই কোথাও বাঘটিকে দেখেছেন। আমাদের ফেরার সময় যেই একটা বাঁক পেরোনো হয়েছে, অমনি রাস্তার মাঝখানে সেই বাঘ। হলুদ আর কালো, একটু পাতলা মেদহীন উজ্জ্বল শরীর— প্রাণ আর শক্তির সমন্বয়ে এক দৃঢ় দীপ্ত চলন— কী অসাধারণ সে দেখা। গাড়ির সামনের আলোগুলো সাথে সাথে নিভিয়ে দেওয়া হলো। চাপা-গর্জন করে সে

আমাদের দিকে এগিয়ে এলো, পেরিয়ে গেলো। এতোই কাছ দিয়ে গেল যেন মনে হলো তার শরীর গাড়ির গা ঘেঁসে হয়তো-বা প্রায় ছুঁয়ে গেলো। এক অদ্ভুত দৃশ্য। কেউ যদি একটা বন্দুক ছাড়া এ দৃশ্য দেখে তাতে অনেক বেশী আনন্দ রয়েছে এবং এরমধ্যে এক অদ্ভুত সৌন্দর্যও রয়েছে।

প্রশ্নকারী ঃ *আমাদের এতো দুঃখ কেন?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ দুঃখকে আমরা জীবনের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মেনে নিয়েছি। আমরা এর চারিদিকে বিভিন্ন দর্শনের জাল বুনি, দুঃখের স্বপক্ষে হাজার যুক্তি খাড়া করি। আমরা এমনও বলি, ঈশ্বর লাভের পথে যেতে হলে— দুঃখ সে পথের অন্যতম পাথেয়। অপরপক্ষে দেখো যেহেতু মানুষ মানুষের প্রতি নির্দয়, তাই পৃথিবীতে এতো দুঃখ। এছাড়াও জীবনে অনেক কিছুই আছে যা আমরা বুঝতে পারি না, সেটা দুঃখ আনে— যেমন মৃত্যু, কোনো জীবিকা না থাকা, অথবা কোনো দরিদ্রকে তার দুর্গতির মধ্যে দেখা। আমরা এইসব কিছুকে বুঝতে পারি না। শুধু তাই নয়, একজন যতই সংবেদনশীল হন তিনি ততই কষ্ট পান। এগুলোকে না বুঝে শেষে আমরা দুঃখের সপক্ষে যুক্তি আনি। এই ঘুণে-ধরা কাঠামোটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং এর থেকে বেরিয়ে না এসে আমরা এরই সাথে নিজেদের মানিয়ে নিই। দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে গেলে একজনকে অন্যের ক্ষতি করার ও অন্যের 'ভালো' করার ইচ্ছা থেকে মুক্ত হতে হবে। কারণ তথাকথিত ভালো করা বলতে আমরা যা বুঝি, সেটাও আমাদের সংস্কারেরই ফল।

২২

সহজ ভালোবাসা

প্রত্যেকদিন ভোরে সন্ন্যাসীর পোষাক পরা একটি লোক পাশের বাগানে ফুলের সন্ধানে আসতেন। তাঁর চোখে, তাঁর হাতে ফুলের জন্য একটা লোভ থাকতো। যতটা হাত পৌঁছোতো তার মধ্যের সব ফুল তিনি তুলে ফেলতেন। তিনি নিশ্চয়ই কোনো প্রতিমাকেই ফুল নিবেদন করবেন, পাথরের তৈরী মৃত প্রতিমা। সুন্দর নরম ফুলগুলো, ভোরের সূর্যের আলোয় নিজেদের একটু একটু করে মেলে দিত। সেই সময় তিনি কোমলভাবেও নয়, ভারী নির্মমভাবে তাদের ছিঁড়ে নিতেন। প্রতিদিন বাগানের সব ঐশ্বর্য, সব আভরণ, সব সৌন্দর্যকে তিনি যেন নির্দয়ভাবে শূন্য করে দিতেন। তাঁর ঈশ্বরের অনেক ফুলের ক্ষুধা— অনেক সপ্রাণ জিনিসের আহুতি কোনো এক নিষ্প্রাণ পাথর প্রতিমার জন্যে।

আরেকদিন কিছু ছেলেকে ফুল ছিঁড়তে দেখেছিলাম। তারা অবশ্য কোনো ভাগবানকে সেই ফুল নিবেদন করবে না, তারা কথাবার্তা বলছিল আর নির্বিচারে ফুলগুলোকে, তাদের পাপড়িগুলোকে ছিঁড়ছিল আর এখানে-ওখানে ফেলে দিচ্ছিল। তোমরা কি নিজেকে কখনো এমন কিছু করতে দেখেছো? হাঁটতে হাঁটতে ডালটা ভেঙে নিলে, পাতা ছিঁড়ে দিলে, তাকে কোথাও ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তোমরা কি নিজেদের কোনোদিন এমন অবিবেচকের মতো কাজ করতে দেখোনি?

বয়স্করাও একই রকম। তাঁরা এইসব সপ্রাণ বস্তুর প্রতি তাঁদের ভিতরের নৃশংসতা, অনাদর ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করে থাকেন। কারোর ক্ষতি না করার কথা তাঁরা বলেন, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেক কাজই বৈনাশিক।

কেউ একটা-কি-দুটো ফুল তুললো খোঁপায় রাখার জন্য বা কাউকে ভালোবেসে দেবার জন্য, সেটা বোঝা যায়। কিন্তু তোমরা ফুলকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দাও কেন? বয়স্কদের জীবন উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষে বিষদিগ্ধ, তাঁরা যুদ্ধে একে অন্যকে হত্যা করছেন, অর্থের মাধ্যমে একে অপরকে ভ্রষ্ট করছেন। তাঁদের নিজেদের কদর্য কর্মপন্থা রয়েছে; আর অন্য জায়গার মতো এখানেও তরুণেরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে।

সেদিন তোমাদের মধ্যে একজনের সাথে হাঁটছিলাম। রাস্তায় একটা পাথর পড়েছিল। আমি যখন পাথরটা সরিয়ে দিলাম, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, ‘‘এটা করলেন কেন?’’ এটা কী প্রকাশ করে? এটা কী অন্যের প্রতি সহানুভূতির অভাব, সম্মানের অভাবই প্রকাশ করে না? তোমরা সম্মান দেখাও ভয় থেকে, তাই তো? বড়ো কেউ ঘরে প্রবেশ করলে তোমরা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ো—ওটা কিন্তু সম্মান নয়, ওটা ভয়। যদি সত্যি সম্মানের ভাব তোমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে তোমরা কিন্তু একটা ফুলকে নিয়ে ওভাবে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে পারবে না, তোমরা রাস্তার মাঝখানে পাথর পড়ে থাকলে তা সরিয়ে রাখবে, গাছেদের লালন করবে, বাগানের পরিচর্যায় সাহায্য করবে। কিন্তু আমরা যুবকই হই আর বৃদ্ধই হই, আমাদের মধ্যে অন্যের প্রতি সেই সহানুভূতির ভাব, সেই বিবেচনার ভাবনাটাই নেই। কেন বলতে পারো? আমরা ভালোবাসা কী তা জানিনা বলেই কি এরকম হয়?

তোমরা কি এই সহজ ভালোবাসা কী তা জানো? আমি যৌনপ্রেমের জটিলতা বা ঈশ্বরপ্রেম এইসব নিয়ে কথা বলছি না; কেবল এক

অনাবিল সহজ ভালোবাসা, যার ফলে তুমি সকল কিছুর প্রতি সত্যকারই নম্র, বিনীত ও স্নেহময়। বাড়িতেও তোমরা সেই সহজ ভালোবাসা পাও না, তোমাদের বাবা-মায়েরা বড়ো বেশী ব্যস্ত; সেখানে সত্যকার স্নেহ বা বিনম্রতার অস্তিত্ব নেই, তোমরাও তেমনই এক ভাব নিয়ে এখানে আসো এবং অন্যদের মতোই ব্যবহার করতে থাকো। এই সহানুভূতিসম্পন্নতা, এই সূক্ষ্মবোধ আসে কী ভাবে? এটার অর্থ এমন নয় কিন্তু, যে নিয়ম করে ফুল ছেঁড়া বন্ধ করতে হবে; যখনই কোনো কিছুর বিরুদ্ধে নিয়ম করে সেই কাজকে আটকানো হয়, তখন ঐ পুরো ব্যাপারটার সাথে ভয় জড়িয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো এমন সূক্ষ্ম সহানুভূতিসম্পন্নতা তুমি কী করে লাভ করবে, যাতে তুমি কোনোভাবেই মানুষের, প্রাণীর, ফুলের অর্থাৎ কারোর কোনো ক্ষতি করবে না?

তোমরা কি এইসব ব্যাপারে আগ্রহী? আমার মনে হয়— হওয়া উচিত। যদি সহানুভূতিসম্পন্ন হবার ব্যাপারে তোমাদের আগ্রহ না থাকে তবে তোমরা গূঢ়তম, প্রকৃততম অর্থেই মৃত হয়ে যাবে, অবশ্য অধিকাংশ লোকই তাই। তাঁরা হয়তো দিনে তিনবার খান, তাঁদের একটা জীবিকা আছে, তাঁরা সন্তানেরও জন্ম দিয়েছেন, তাঁরা গাড়ি চালান, ভালো পোশাক পরেন, কিন্তু অধিকাংশ জনই আসলে এক একটা নিশ্চেতন অস্তিত্ব, যাঁরা কেবলমাত্র নামেই এসব করে যাচ্ছেন।

তোমরা কি এই সহানুভূতিসম্পন্নতা, এই সংবেদনশীলতার অর্থ জানো? তোমাদের সব কিছুর প্রতি একটা দয়া, একটা মমত্ব থাকবে। ধরো, দেখছো কোনো প্রাণী ভারী কষ্ট পাচ্ছে এবং তার জন্য কিছু করলে, রাস্তায় পড়ে থাকা পাথরটা সরালে, কারণ কতো মানুষ খালি পায়ে সেখান দিয়ে হেঁটে যান, রাস্তায় পড়ে থাকা পেরেকটা সরিয়ে দিলে, কারণ কারোর গাড়ির চাকায় ওটা ঢুকতে পারে। সংবেদনশীলতার অর্থ হলো মানুষ, পাখী, গাছ তথা সবার প্রতি

খেয়াল রাখা। এরকম নয় যে তাদের সাথে তোমার সম্পর্ক আছে অর্থাৎ সেগুলো তোমার, তাই তুমি খেয়াল রাখো এবং সেইজন্য সহানুভূতি আসে; তা আসে— কারণ, তুমি মানুষের, প্রাণীর, গাছের— সব কিছুর অন্তর্লীন সৌন্দর্যকে জানতে পেরেছো। এমন সংবেদনশীলতা আসে কীভাবে?

যেই মুহূর্তে তুমি সংবেদনশীল, স্বভাবতই তুমি ফুল ছিঁড়ে নাও না; কোনো জিনিসকে নষ্ট না করবার, কোনো মানুষকে আঘাত না করার এক সহজ ইচ্ছা তোমার মধ্যে জন্ম নেয়। যার অর্থ হলো তুমি সব কিছুকে সত্যকার ভালোবাসো, সত্যকার শ্রদ্ধা করো। ভালোবাসাই জীবনের সর্বশেষ কথা। কিন্তু ভালোবাসা বলতে আমরা কী বোঝাতে চাই? আমি কাউকে ভালোবাসি কারণ প্রতিদানে সেও আমাকে ভালোবাসে— এমন যদি হয় তাহলে সেটা কিন্তু ভালোবাসা নয়। ভালোবাসা হলো একটা স্নেহের, একটা মমতার ভাব যেখানে প্রতিদানে কিছু পাবার জন্য মন হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকে না। তোমরা চালাক হতে পারো, অনেক পরীক্ষা পাশও করতে পারো, ডক্টরেট করে উঁচু পদও পেতে পারো, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি সেই সহানুভূতির, অনাবিল স্নেহের, ভালোবাসার ভাব না জেগে থাকে হৃদয় তবে হবে বন্ধ্যা, শূন্য, জীবনের বাকী দিনগুলোয় থাকবে এক অদ্ভুত বিপন্নতা।

সুতরাং হৃদয় যখন প্রেমে, স্নেহে ও মমত্বে মঞ্জরিত হয়ে ওঠে, তখন তোমাদের হাত আর কোনো কিছু নাশ করার জন্য উঠবে না, নির্মমতা তোমাদের মনকে বিকৃত করে তুলবে না, যুদ্ধ নামক ব্যাপারটার আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। তখনই তুমি একজন আনন্দিত মানুষ। যেহেতু তোমার মধ্যে সেই আনন্দময়তা থাকে— তুমি প্রার্থনা করো না, ঈশ্বরের খোঁজাখুঁজিও করো না, কারণ আনন্দই স্বয়ং ঈশ্বর।

এখন প্রশ্ন হলো, কী করে এই ভালোবাসা আমাদের মধ্যে আসবে?

অবশ্যই শিক্ষকদের থেকেই সেটা শুরু হবে। গণিত, ভূগোল, ইতিহাস সম্পর্কে রাশি রাশি তথ্য তোমাদের দেওয়া ছাড়াও যদি তাঁরা হৃদয়ে সে ভালোবাসাকে জাগিয়ে তোলেন, তার সম্পর্কে তোমাদের বলেন, যদি সহজাতভাবেই পথে পড়ে থাকা পাথরটাকে সরিয়ে দেন, যাবতীয় ময়লা কাজগুলো কাজের মানুষটিকে দিয়ে না করান, তাঁর নিজের কাজে, তাঁর খেলায়, তাঁর খাওয়ার সময়, যখন তিনি তোমাদের সাথে বা নিজের সাথে আছেন— তখন যদি সেই অদ্ভুদ জিনিসটার অনুরণন নিজের সত্তায় শুনতে পান আর প্রায়ই তার প্রতি ইঙ্গিত করেন, তাহলে তোমরাও সেই ভালোবাসাকে জানতে পারবে।

তোমার গায়ের রঙ হয়তো পরিষ্কার, তোমার মুখশ্রী হয়তো সুন্দর, তুমি হয়তো অসাধারণ একটা শাড়ি পরেছো বা তুমি হয়তো খেলাধূলায় খুবই ভালো, কিন্তু ভিতরে ভালোবাসা না থাকলে তুমি একজন অসুন্দর মানুষ, সেই শ্রীহীনতার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। অন্যদিকে ঐ ভালোবাসাটুকু থাকলে, হোক না তোমার মুখশ্রী ঘরোয়া অথবা সুন্দর তাতে এক আশ্চর্য বিভা ফুটে ওঠে। ভালোবাসাই জীবনের মহত্তম সম্পদ। এর কথা বলা, এর উচ্ছলধারা সত্তায় প্রতি মুহূর্তে অনুভব করা, একে বাঁচিয়ে রাখা, একে বাড়তে দেওয়া খুব জরুরী। নয়তো পৃথিবীর নিমর্মতার খরতাপে সে ধারা অতি সত্বর শুকিয়ে যেতে থাকে। যখন তোমরা নবীন তখন যদি সে ভালোবাসাকে নিজের ভিতরে অনুভব না করো, সে দৃষ্টিতে মানুষ, প্রাণী, ফুল এসব কিছুকে না দেখো, তাহলে যখন বড়ো হবে, দেখবে, জীবনকে খালি লাগছে, বড়ো একা লাগছে, এক ভয়ের ছায়া তোমার আশেপাশে সব সময় উপস্থিত। কিন্তু যে মুহূর্তে হৃদয়ে সে ভালোবাসার পদধ্বনি শুনবে, তার উপস্থিতির গভীরতা, আনন্দ আর সীমাভাঙা ব্যাপ্তিকে অনুভব করবে, তখন এই পৃথিবীই বদলে গিয়ে তোমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন হয়ে দেখা দেবে।

প্রশ্নকারী ঃ *স্কুলের কোনো অনুষ্ঠানে কেন সবসময়ই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা ধনী ব্যক্তিরাই আমন্ত্রিত হন?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ তোমার কী মনে হয়? তুমি কি নিজে চাও না যে তোমার বাবা একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক হোন? তিনি যদি লোকসভার সদস্য হন, সংবাদপত্রে যদি তাঁর নাম আসে, তুমি কি গর্ববোধ করবে না? যদি তোমাকে তিনি একটা বিরাট বাড়িতে থাকার জন্য নিয়ে যান, বা তিনি ইউরোপ যান এবং সিগারের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে ফিরে আসেন, তুমি কি আহ্লাদিত হবে না?

ধনী ব্যক্তি বা যাঁদের ক্ষমতা আছে, তাঁরা যেকোনো সংস্থার ক্ষেত্রেই লাভদায়ক। সংস্থা তাঁদের তোষামদ করে, বিনিময়ে তাঁরাও সংস্থার জন্য কিছু করেন, এইভাবে দুজনেরই কাজ চলতে থাকে। কিন্তু প্রশ্নটাকে শুধু স্কুল কেন নামী-দামী লোকেদের আমন্ত্রন জানায়— এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। তোমাদের নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে তোমরা নিজেরা কেন নামী-দামী লোক হতে চাও, কেন সবচেয়ে ধনীকে, বিখ্যাতকে অথবা সুপুরুষ ব্যক্তিকে বিবাহ করতে চাও। তোমরা কি প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনোভাবে বড়ো কেউ হতে চাও না? যখন তোমাদের এমন ইচ্ছা থাকে, তখন ভ্রষ্টতার বীজ তোমাদের মধ্যে রয়েছে। আমি কী বলতে চাইছি তোমরা কি বুঝতে পারছো?

স্কুলের অনুষ্ঠানে কেন অর্থশালীদের আমন্ত্রণ করা হয়, সে প্রশ্ন-টাকে একটু সরিয়ে রাখা যাক, কারণ এই সমস্ত অনুষ্ঠানে দরিদ্র লোকেরাও থাকেন। এখন প্রশ্ন হলো তোমাদের মধ্যে কেউ কি ঐ দরিদ্র বা গ্রাম্য লোকেদের পাশে গিয়ে বসবে? আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছো কি— সন্ন্যাসীরা একটা বিশিষ্টতার সাথে বসতে চান, কেমনভাবে তাঁরা সবার সামনে বসতে চান? আমরা সবাই প্রাধান্য চাই, পরিচিতি চাই। সত্যকার ব্রাহ্মণ তিনি, যিনি কারোর

থেকে কিছু প্রত্যাশা করেন না, তার কারণ কিন্তু আত্মাভিমান নয়, আসলে তিনি নিজেই নিজের আলোকস্বরূপ। কিন্তু সেসব আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

আলেকজান্ডার যখন ভারতে আসেন তখনকার একটা গল্প বলি শোনো। রাজ্য জয় তো হলো, তিনি এবার রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে চাইলেন। কেননা সেই ব্যক্তি প্রজাদের মধ্যে এক অদ্ভুত শৃঙ্খলা, সততা এবং কলুষতাহীন মনোভাব জাগিয়েছিলেন। রাজ্যের রাজা বললেন, তিনি একজন ব্রাহ্মণ, তিনি তাঁর গ্রামে ফিরে গেছেন। কিন্তু আলেকজান্ডার আদেশ দিলেন তিনি যেন এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। রাজা লোক পাঠালেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ এলেন না, কারণ নিজের খ্যাতি কারোর কাছে প্রকাশ করার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ ছিল না। দুর্ভাগ্যজনকভাবেই ঐ ধরণের চেতনা আমরা হারিয়েছি। আমাদের ভিতরটা খালি, বিমর্ষ, সেখানে অদ্ভুত এক দমবন্ধ-করা গতিহীনতা। আমরা মানসিক দিক থেকে ভিখারী; তাই কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছি, কাউকে একটা খুঁজে বেড়াচ্ছি, যদি একটু উদ্দীপনার উত্তাপ, একটু আশার আলো, একটু আশ্রয়ের নিশ্চিন্ততা পাওয়া যায়, আর এই আশাতেই আমরা অতি সাধারণ জিনিসগুলোকেও কুশ্রী করে তুলছি।

কোনো বিখ্যাত আধিকারিক এসে কোনো ইমারতের শিলান্যাস করার মধ্যে তো কোথাও কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এর পিছনের যে ভাবনাটা কাজ করে সেটাই কলুষতা আনে। তোমরা কোনোদিন গ্রামে যাও? তোমরা কখনো তাঁদের সাথে কথা বলো না, তাঁদের জন্য অনুভব করো না, কোনোদিন নিজে গিয়ে দেখো না যে তাঁরা কতো কম খাবার পান, কীভাবে দিনের-পর-দিন তাঁরা বিশ্রামহীনভাবে পরিশ্রম করে যান। এটা ঠিক নয় যে আমি কয়েকটা ব্যাপারে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি বলে, তোমরা অন্যের আলোচনায়

নেমে পড়বে। শুধু বসে আলোচনা কোরো না, সেখানে যাও, নিজের চোখে তাঁদের অবস্থাটা দেখো, সেখানে কিছু করো, গাছ লাগাও, তাঁদের সাথে কথা বলো, তাঁদের এখানে ডাকো, তাঁদের ছেলেমেয়েদের সাথে খেলো। তখন দেখবে এক ভিন্ন ধরণের সমাজ জন্ম নিচ্ছে, কারণ এখানে তখন ভালোবাসা সব কিছুতে সহায়তা করছে। যেখানে ভালোবাসার স্থান নেই, এমন সমাজ অনেকটা একটা দেশের মতো যে দেশে নদী নেই, এক ধূ ধূ মরুভূমি। কিন্তু যেখানে নদী আছে সে দেশ উর্বর, সমৃদ্ধ ও সুন্দর। আমাদের মধ্যে অধিকাংশই ভালোবাসা ছাড়াই বড়ো হই, তাই আমরা এরকম এক কদর্য সমাজ তৈরী করেছি এবং তাতে ঐ ধরণেরই লোক বসবাস করে।

প্রশ্নকারী ঃ *আপনি বলেন নির্মিত প্রতিমায় ঈশ্বর থাকেন না, কিন্তু অন্যে বলে সেখানেই ঈশ্বর অধিষ্ঠিত। যদি আমরা আমাদের হৃদয়ে পূর্ণ বিশ্বাস রাখি, শ্রদ্ধা রাখি, তখন তাঁর শক্তি স্বয়ং সেখানে প্রকট হয়। পূজার সত্যতা কী?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ পৃথিবী যেমন লোকে ভর্তি ঠিক তেমনই মতামতেও ভর্তি। এবং তোমরা ভালোকরেই জানো মতামত জিনিসটা কী। তুমি একটা কিছু বলবে, আর একজন আর একটা কিছু বলবে। প্রত্যেকেরই নিজের নিজের মতামত আছে, কিন্তু সেটাই সত্য নয়। তাই কে ওটা বলছেন সেটা না দেখে নিজেই তার সত্যতা খুঁজে বার করো। মতামত এক রাত্রির মধ্যে পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু সত্য পরিবর্তিত হয় না।

এখন তুমি নিজে খুঁজে বার করতে চাও মানুষের নির্মিত প্রতিমায় কি সত্য বা ঈশ্বর রয়েছে? এই নির্মিত প্রতিমা আসলে কী? এটা মনের একটা কল্পনা। পাথর বা কাঠের বা অন্য কোনো ধাতুর উপর হাতের দ্বারা সৃষ্ট এক সামগ্রী। এই নির্মিতি মনের একটা কল্পনার

প্রকাশ। এখন তুমি কি মনে করো মনঃকল্পিত এই মূর্তিই ঈশ্বর, অবশ্য তোমারই চারপাশে লক্ষ লক্ষ মানুষের দাবী কিন্তু সেটাই।

এখন তোমার বক্তব্য হলো, যদি মনের— সেই প্রতিমা বা মূর্তিটিতে বিশ্বাস থাকে, অকপট শ্রদ্ধা থাকে, তাহলে সেই মূর্তি মনকে শক্তি দেয়। অবশ্যই প্রথমে মন মূর্তি নির্মাণ করে, তারপর নিজ নির্মিতি থেকেই শক্তি সংগ্রহ করতে থাকে। মন তো চিরন্তনভাবে এই খেলাটাই খেলছে ঃ মূর্তি গড়ছে এবং তার থেকে শক্তি, সুখ, সিদ্ধি সংগ্রহ করছে; ফলত ভিতরের অপূর্ণতা, শূন্যগর্ভতা থেকেই যাচ্ছে। তাই লক্ষ লোকে কী বলল কিংবা মূর্তিটা মোটেই জরুরী নয়, প্রয়োজন তোমার মন কীভাবে ক্রিয়া করে তা লক্ষ্য করা, তাকে বুঝতে পারা।

মন ঈশ্বরকে বানায়, আবার তাকে ধ্বংস করে। মন দয়ালুও হয়, আবার কঠোরও হয়। মনের অনন্যসাধারণ সব নির্মাণের ক্ষমতা আছে। এ কোনো মতামতকে আঁকড়ে ধরতে পারে, বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারে, আবার প্রচণ্ড গতিশীল জেট-প্লেন আবিষ্কারও করতে পারে। এটা বিরাট, সুন্দর সেতু বাঁধতে পারে, মাইলের পর মাইল রেললাইন পাততে পারে, এমন গণনার যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারে যার কর্মদক্ষতা মানুষের ক্ষমতার অতীত। কিন্তু এ হেন মন পরমকে, সত্যকে তৈরী করতে পারে না। সেইজন্যই তোমায় নিজেকে খুঁজে দেখতে হবে সত্য কী।

পরম কী, তার অন্বেষণের জন্য মন কে তার সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত হতে হবে, একেবারে স্থির হতে হবে। এই স্থিরতাই হলো পূজা। পথের ভিক্ষুককে কোনোরকমে পাশ কাটিয়ে মন্দিরে যাওয়া আর সেখানে ফুলের মালা নিবেদন করা কোনো পূজা নয়। তোমরা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করতে চাও, তার কারণ তোমরা তাকে ভয় পাও, আর এটা কিন্তু পূজা নয়। যখন তোমরা মনের সব কিছুকে বুঝতে পারো মন সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে যায়। এমন কিন্তু নয় কোনোভাবে

একে শান্ত করা হয়েছে। মনের সেই শান্ততাই হলো পূজা। সেই প্রশান্তির মাঝেই সত্যের, সুন্দরের, ঈশ্বরের আগমন ঘটে।

প্রশ্নকারী ঃ *আপনি একদিন বলেছিলেন আমাদের শান্ত হয়ে বসা উচিত এবং আমাদের মনের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা উচিত। কিন্তু যেই সচেতনভাবে তা নিরীক্ষণ করতে যাই অমনি চিন্তাগুলো লুপ্ত হতে থাকে। তাহলে যখন মনই দ্রষ্টা এবং মনই দৃশ্য তখন কী করে আমরা আমাদের মনকে দেখবো?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ প্রশ্নটা জটিল। এর সাথে অনেকগুলো ব্যাপার জড়িয়ে আছে।

এবার দেখবো দ্রষ্টা কি সত্যি আছে, নাকি শুধু দেখাই রয়েছে? ভালো করে লক্ষ্য করো। সত্যি কি চিন্তাকারী রয়েছে, নাকি শুধু চিন্তা রয়েছে? অবশ্যই চিন্তাকারীর কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রথমে চিন্তা থাকে, চিন্তাই চিন্তাকারীর সৃষ্টি করে— যার অর্থ চিন্তার ক্রিয়ায় এক বিভাজন এসে গেলো। যখন এই বিভাজন আসে তখনই লক্ষ্যকারী এবং যা সে লক্ষ্য করছে, দ্রষ্টা এবং দৃশ্য এই ব্যাপারগুলো এসে পড়ে। প্রশ্নকারী যেমন বলছে : যদি তুমি তোমার মনকে লক্ষ্য করো বা কোনো চিন্তাকে লক্ষ্য করো, তাহলে চিন্তা লুপ্ত হয়ে যায়, ক্ষীণ হতে থাকে; কিন্তু আসলে সেখানে দেখাটাই থাকে, দ্রষ্টা নয়। যখন তুমি কোনো ফুলকে দেখো, যখন তুমি এটাকে কেবল 'দেখো' সেই মুহূর্তে কি কোনো স্বতন্ত্র সত্তা থাকে— যে দেখে ? নাকি সে সময় কেবল 'দেখা' থাকে? ফুলটাকে দেখে তুমি বলো ''কী সুন্দর এটা, আমি এটা চাই'', এইভাবেই 'আমি'— কোনো কামনা, ভয়, লোভ বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে দিয়ে দেখার ক্রিয়ার মধ্যে এসে পড়ে। এইসব কামনা, ভয়, লোভ বা উচ্চাকাঙ্ক্ষাই 'আমি' সৃষ্টি করে, এদের ছাড়া 'আমি'র কোনো অস্তিত্ব নেই।

যদি এই প্রশ্নটার গভীরে প্রবেশ করো, তাহলে দেখতে পাবে যখন মনের সম্পূর্ণ শান্ত অবস্থা আসে— যেখানে চিন্তা ক্রিয়াশীল নয়, তাই সেখানে কোনো দ্রষ্টা, কোনো অনুভবকারী থাকে না; সেই স্তব্ধতার নিজস্ব একটা সৃষ্টিশীল বোধ থাকে। সেই প্রশান্ত অবস্থায় মন অন্য একটা কিছুতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু কোনো পদ্ধতির দ্বারা, কোনো বিশেষ নিয়মের দ্বারা, কোনো বিশেষ অভ্যাসের দ্বারা বা কোনো অন্ধকার কোণে বসে মনকে একাগ্র করার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে কিন্তু মন কোনোদিন সেই শান্ত অবস্থায় পৌঁছোতে পারে না। যখন তোমার মন কী করে ক্রিয়া করে সেটাকে তুমি উপলব্ধি করো, তখনই সেই নীরবতা আসে। মন পাথরের প্রতিমা তৈরী করেছে যা লক্ষ মানুষ পূজা করে, মন গীতা লিখেছে, মন ধর্মকে সংগঠিত করেছে, অগুণতি বিশ্বাসকে সংঘটিত করেছে। কিন্তু সত্য কী, তাকে খুঁজতে হলে মনের সৃষ্ট এইসব কিছুকে তোমাদের অতিক্রম করতে হবে।

প্রশ্নকারী ঃ *মানুষ কি কেবল মন এবং মস্তিষ্ক নাকি তাদের অতিক্রম করে আরো বেশী কিছু?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ তুমি বলো কী করে খুঁজে বার করবে? শঙ্করাচার্য বা বুদ্ধ বা আরো অন্যান্য যাঁরা আছেন, তুমি যদি তাঁদের কথা বিশ্বাস করো বা মেনে নাও বা নিজে নিজে কিছু কল্পনা করো, তাহলে তুমি কিন্তু সত্য কী সেটার জন্য অন্বেষণ করছো না।

তোমার কাছে একটাই মাত্র পথ আছে, তা হলো মন; মন আবার মস্তিষ্কও। তাই এই ব্যাপারের সত্যতা জানবার জন্য তোমাদের মনের প্রকৃতিকে বুঝতে হবে, তাই তো? যদি মন কুটিল হয়, কোনো কিছুকেই সোজাভাবে দেখতে পারবে না। মন যদি সীমিত হয়, তবে কী করে সে সেই সীমাশূন্যকে জানবে? মনই দেখবার

একমাত্র পথ, তাই সত্যকার দেখতে গেলে মনকে সোজা হতে হবে, তাকে বিভিন্ন সংস্কার, ভয়ের জঞ্জালমুক্ত হতে হবে। মনকে সমস্তরকম জ্ঞান থেকে মুক্ত হতে হবে, তার কারণ জ্ঞান মনকে অন্যদিকে চালিত করে, তাকে বিক্ষিপ্ত করে, বিকৃত করে। মনের কিন্তু কোনো কিছু আবিষ্কার করার, কোনো কিছু কল্পনা করার, কোনো কিছু চিন্তা করার অসম্ভব ক্ষমতা রয়েছে। মনকে সহজ এবং স্বচ্ছ হতে গেলে কি এইসব ক্ষমতাগুলোকেও একপাশে সরিয়ে রাখতে হবে না? এক অকলুষিত মন, যে মন অগণিত অভিজ্ঞতা, অনুভবের মধ্যে দিয়ে গিয়েও জ্ঞান থেকে, সমস্ত অভিজ্ঞতার ভার থেকে মুক্ত, সেই মনই— মন বা মস্তিষ্কের অতীত কিছু আছে কি না তা খুঁজে পেতে পারে। তা না হলে তুমি যেটা আবিষ্কার করবে আসলে সেটা তোমারই অভিজ্ঞতার রঙে রঙীন কিছু, আর তোমার সব অভিজ্ঞতাই তোমার সংস্কার থেকে জন্ম নেয়।

প্রশ্নকারী ঃ *প্রয়োজন এবং লোভের মধ্যে পার্থক্য কী?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ তুমি কি জানো না? কখন তোমার প্রয়োজন পূরণ হয় তুমি কি বুঝতে পারো না? যখন তুমি লোভী, কিছু কি তোমাকে বলে দেয় না যে তুমি লোভী? একেবারে নীচের দিক থেকে শুরু করো, বুঝতে সুবিধা হবে। যখন তোমার যথেষ্ট কাপড়-জামা-গয়না, এবং অন্যান্য বস্তু-সামগ্রী থাকে, তখন তার সম্বন্ধে তোমাকে কোনো দর্শন খাড়া করতে হয় না। কিন্তু যে মুহূর্তে তোমার প্রয়োজন লোভের সীমায় প্রবেশ করে, তুমি একটা দর্শন খাড়া করো, তার যাথার্থ্য প্রমাণ করো, তার কোনো-না-কোনো একটা ব্যাখ্যা খুঁজে বার করো। ধরো, একটা ভালো হাসপাতালের অনেকগুলো বেড প্রয়োজন, বিশেষ পরিচ্ছন্নতাও প্রয়োজন, জীবাণুনাশক, এটা-সেটা প্রয়োজন। একজন ভ্রাম্যমান ব্যক্তির হয়তো একটা গাড়ির প্রয়োজন, একটা ওভারকোটের

প্রয়োজন। এগুলো প্রয়োজন। তুমি যে জীবিকায় রয়েছো সেটার জন্য একটা দূর অবধি তোমার জ্ঞান প্রয়োজন। তুমি ইঞ্জিনিয়ার হলে কিছু ব্যাপারে তোমার জ্ঞান থাকতেই হবে। কিন্তু এই জ্ঞানই লোভ চরিতার্থতার হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। মন লোভের মাধ্যমে যা কেবল প্রয়োজনসাধনের জন্যই দরকার সেগুলোকেই আত্মোৎকর্ষের কাজে লাগায়। যদি ঠিক ঠিক লক্ষ্য করো দেখবে এটা খুবই একটা সরল প্রক্রিয়া। যদি তুমি তোমার প্রয়োজনের ব্যাপারে সচেতন হও, তখন তুমি দেখতে পাবে কীভাবে লোভের অনুপ্রবেশ ঘটছে। দেখবে মন কেমন করে প্রয়োজনের সামগ্রীকে— নিজের ক্ষমতা, নিজের গুরুত্ব বাড়াবার তথা আত্মসম্প্রসারণের কাজে ব্যবহার করছে, তখন প্রয়োজন আর লোভের পার্থক্য অতি সহজেই অনুভব করবে।

প্রশ্নকারী ঃ *যদি মন এবং মস্তিষ্ক একই হয় তাহলে কেন কোনো চিন্তা বা কোনো আবেগকে মস্তিষ্ক বলল ভালো নয়, মন কিন্তু তাকে বয়ে নিয়েই চলল?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ আসলে কী ঘটে দেখো। ধরো, তোমার হাতে একটা পিন ফোটানো হলো। তোমার স্নায়ু এই সংবাদ মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে গেলো, মস্তিষ্ক সাথে সাথে বলে এটা ব্যথা। মন এই ব্যথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো, তুমি হয় পিনটা সরিয়ে দিলে, না হয় অন্য কোনো একটা ব্যবস্থা করলে। কিন্তু এমন অনেক জিনিস আছে মন করেই চলে, অথচ সে জানে সেগুলো কুশ্রী, সেগুলো মূঢ়তা। মন জানে ধূমপান করা মূঢ়তার নামান্তর, তবু একজন ধূমপান করেই যায়। কেন? আসলে ধূমপানের যে অনুভূতিটা সেটাকে সে ভালোবাসে, ব্যস, ঐটুকুই। কিন্তু পিনটা ফোটার মতোই তীব্রভাবে যদি মন ধূপমানের স্থূলতার ব্যাপারে সচেতন হতো, তাহলে সে তখনই সেটা সমাপ্ত করতো। কিন্তু মন পরিষ্কারভাবে একে দেখতে চায় না কারণ ধূমপান

তার কাছে একটা আনন্দদায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। লোভ, হিংসা এইসবের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। যদি তোমার হাতের পিনটা ফোটার মতোই তোমার লোভ তোমার কাছে যন্ত্রণাদায়ক কিছু হতো, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে অতিক্রম করতে, এর সম্পর্কে মনগড়া কোনো দর্শন তৈরী করতে না। যদি হিংসার সম্পর্কে তোমার সম্পূর্ণ সচেতনতা থাকতো, তাহলে অহিংসা সম্পর্কে অসংখ্য বই লিখতে না; ওগুলো আবর্জনা, তুমি তো ওগুলো অনুভব করো না, ওগুলো সম্বন্ধে মুখে বলো। যদি কিছু খেলে তোমার ভয়ঙ্কর পেট ব্যথা হয়, তাহলে নিশ্চয় সেটা তুমি খেয়েই যাবে না? তুমি সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে সরিয়ে রাখবে। একইভাবে যদি তুমি বুঝতে পারতে ঈর্ষা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিষাক্ত কোবরার দংশনের মতো ভয়ঙ্কর, মৃত্যু-দায়ী, তাহলে তুমি ঐগুলোর প্রতি সজাগ হয়ে উঠতে। কিন্তু দেখবে এইসব ব্যাপারে মন কিন্তু খুব কাছ থেকে পরিষ্কারভাবে নিরীক্ষণ করতে চায় না, কারণ এদের মধ্যেই এর স্বার্থ নিহিত আছে। এ কখনো স্বীকার করবে না ঈর্ষা, লোভ, লালসা হলো বিষাক্ত। তখন মন বলে, ‘আচ্ছা এসো, অহিংসা সম্পর্কে নির্লোভ হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করি, কিছু আদর্শ ঠিক করা যাক’। একদিকে এইসব কার্যকলাপ চলে, অন্যদিকে মন এইসব গরল বহন করে নিয়ে চলতে থাকে। এইসব জিনিস কতোটা দূষিত, কতোটা বিষিত, কতোটা বৈনাশিক নিজে খুঁজে বার করো, দেখবে সঙ্গে সঙ্গে এটাকে তুমি ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু যদি তুমি মুখে বলো ‘না, এটা উচিত নয়’ অথচ আগের মতোই সব চালিয়ে যাও তাহলে ওটা ভণ্ডামি হবে। একটা জিনিস হও— হয় উত্তপ্ত হও, নয়তো শীতল থাকো।

২৩

একাকীত্ব ও একত্ব

পৃথিবীতে এতো মনোরঞ্জনের পথ এতো চিত্ত বিনোদন চলছে, এখানে সকলেই আজ দর্শক, কুশীলব খুব কম। ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক, তাই না? এক টুকরো খালি সময় আমাদের হাতে এসে পড়েছে কী আমাদের চিত্ত বিনোদনের পথ খোঁজা শুরু হয়। আমরা কোনো একটা গুরুগম্ভীর বিষয়ের উপরে লেখা বই বা একটা উপন্যাস বা একটা পত্রিকায় ডুবে যাই। আর আমেরিকায় থাকলে রেডিও বা টিভি চালিয়ে দাও, কোনো একটা কিছু নিয়ে অনর্গল কথা বলেই যাও। নিজেরা নিজেদের হাতে থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সর্বদা একটা মনোরঞ্জনের, একটা বিনোদনের পথ খোঁজা চলতেই থাকে। একা থাকা, বা এইসব মনোরঞ্জন বা আমোদ-প্রমোদ ছাড়া থাকার কথা ভাবলেই এক রন্ধ্রহীন ভয় আমাদের পেয়ে বসে। কোনো উন্মুক্ত প্রান্তরে বা বনের পথে না কথা বলে, গান না গেয়ে নিজের ভিতরটা আর বাহিরের প্রকৃতিকে দেখতে দেখতে শান্ত হয়ে হাঁটার মানুষ আমাদের মধ্যে খুব কমই আছেন। আসলে এসব আমরা পারি না, কারণ আমাদের ভিতরে ভিতরে এক একঘেয়েমির ক্লান্তি। সেই একই কাজ করে যাওয়া— হয় পড়া, নয় পড়ানো অথবা বাড়ীর কাজ অথবা অন্য কোনো চাকরি— ছকে বাঁধা দিনচর্যা। তাই কোনো ফাঁকে যদি একটু খালি সময় বার করতে পারি,

তখন মনকে হালকা কোনো আমোদের স্রোতে ভাসাই, নয়তো কোনো গুরুগম্ভীর বিনোদনের পথে পা বাড়াই। বই পড়ি, বায়োস্কোপে যাই, অথবা ধর্মের দিকে হাত বাড়াই। ব্যাপারটা সেই একই। ধর্মও এখন সেই দিনগত পাপক্ষয় থেকে পালাবারই একটা পথে পরিণত হয়েছে। ভিতরের ক্লান্তি, একঘেয়েমি, অবসন্নতার শ্বাসরোধী অনুভূতি থেকে পালাবার এক বেশ গুরুগম্ভীর পথ।

জানিনা তোমরা এগুলো কখনো লক্ষ্য করেছো কি না। অধিকাংশ লোকই নিরন্তর কোনো-না-কোনো কাজে ব্যস্ত; যেমন পূজা করা, বার বার কিছু শব্দের পুনরাবৃত্তি করা, কোনো-না-কোনো বিষয়ে দুশ্চিন্তা করা ইত্যাদি ইত্যাদি; আর কারণটা হলো তাঁরা নিজেদের সাথে একা থাকতে ভয় পান। যদি মনকে কোনোরকমের মনোরঞ্জনের পথে না নিয়ে গিয়ে কখনো একা থাকতে চেষ্টা করো, তাহলে দেখবে কতো তাড়াতাড়ি তুমি নিজের থেকে পালাতে বা নিজেকে ভুলতে চাইছো। এইজন্য এই বিশাল ব্যবসায়িক চিত্তবিনোদন, স্বয়ংকৃত বিনোদন আমাদের সভ্যতার একটা আবশ্যকীয় অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি লক্ষ্য করো দেখবে সারা পৃথিবীতে মানুষ দিনে দিনে আরো বেশী বিক্ষিপ্তচিত্ত, আরো বেশী কৃত্রিম, জটিল এবং জড়বাদী হয়ে উঠছে। অসংখ্য সুখ, একটার পর একটা প্রকাশিত হওয়া অগুণতি বই, সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় চিত্তাকর্ষক খবরা-খবর একটাই ব্যাপার প্রমাণ করে, তা হলো আমরা প্রতিনিয়ত বিনোদনের মধ্যে ডুবে থাকতে চাই। ভিতরে ভিতের এক নিশ্চেতন জড়িমা, এক রিক্ততা, অসহায়রূপে এক সাধারণ অস্তিত্ব। সেই কারণে আমাদের যে কোনো সম্পর্ককে, এমনকী এই সমাজসংস্কার প্রভৃতিও আসলে আমরা নিজেদের থেকে পালাবার কাজেই ব্যবহার করি। জানিনা কোনোদিন লক্ষ্য করেছো কি না, অধিকাংশ লোকই কী ভীষণ একাকী। সেই একাকীত্ব থেকে পালাতে গিয়ে তাঁরা মন্দিরে,

মসজিদে, চার্চে যাচ্ছেন, ভালো ভালো পোশাক-আশাক পরে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে একত্রিত হচ্ছেন, টেলিভিশন দেখছেন, রেডিও শুনছেন, বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকছেন এবং এই তালিকা কিন্তু অনেক অনেক দীর্ঘ।

তোমরা কি জানো, এই একাকীত্ব জিনিসটা কী ? হয়তো তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ শব্দটার সাথে পরিচিত নও, কিন্তু অনুভূতিটা তোমাদের সকলেরই জানা। যদি কোনোসময় একাই হাঁটতে যাও অথবা কোনো বই ছাড়া থাকো, আশেপাশে কথা বলার মতো কেউ না থাকে, দেখবে কতো তাড়াতাড়ি তোমরা বিরক্ত হয়ে উঠছো। যেন একঘেয়েমিজনিত এক ক্লান্তি ভিতরে চেপে বসছে। তোমরা অনুভূতিটা ভালো করেই জানো, কিন্তু কেন এই রকম হয় সেটা তোমরা জানো না। কোনোদিন তোমরা এটাকে বোঝার চেষ্টা করোনি, এটা কী সে ব্যাপারে কোনোদিন অনুসন্ধান করোনি। যদি এই ক্লান্তিটার ব্যাপারে একটু অনুসন্ধান করো, দেখবে কারণ হলো একাকীত্ব। এই একাকীত্ব থেকে পালাবার জন্যই আমরা কারো সাথে থাকতে চাই, আমাদের হরেক-রকমের মনোরঞ্জনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কতো রকমের চিত্তবিনোদন রয়েছে— গুরু, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, প্রার্থনা অথবা আধুনিকতম উপন্যাস। ভিতরের এই একাকীত্বের কারণেই আমরা এই বিরাট জীবনের একটা দর্শকমাত্র হয়েই রয়ে যাই; কিন্তু যদি আমরা এই একাকীত্বকে বুঝতে পারি, তাকে অতিক্রম করতে পারি, তাহলে আমরাও এই বিরাট জীবনের স্পন্দনে স্পন্দিত, তার সুরে ছন্দিত হতে পারব।

আসলে অধিকাংশ মানুষই জানেন না কী করে একা বাঁচতে হয়, সেইজন্যই তাঁরা বিবাহ করছেন, আরো অসংখ্য সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করছেন। এর মানে কিন্তু আমি এমন কিছু বলছি না যে একজনের একা থাকা উচিত; কিন্তু যদি ভালোবাসা পাবে

বলেই তোমরা বিবাহ্ করো, অথবা একঘেয়ে লাগছে, বিরক্ত লাগছে তাই নিজেকে ভুলে থাকবার জন্য তোমরা কাজ বা জীবিকাকে ব্যবহার করো, তাহলে দেখবে, তোমাদের জীবন কোথায় একটু নিজেকে ভোলানো যাবে, কোন পথে গেলে একটু চিত্তবিনোদিত হবে— তারই এক রন্ধ্রহীন খোঁজে পরিণত হয়েছে। আমাদের মধ্যে খুব কম জনই এই একাকীত্বের ভয়কে অতিক্রম করে; কিন্তু করা উচিত, কারণ এর সীমানার বাহিরেই জীবনের বিরাট বিভব ছড়িয়ে আছে।

একাকীত্ব (loneliness) এবং একত্ব (aloneness) এই দুয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। একেবারে ছোটো ছাত্রেরা হয়তো এই একাকীত্বের অনুভূতিটার সাথে পরিচিত নও। কিন্তু বড়োরা প্রত্যেকেই সেই অনুভূতিটার সাথে পরিচিত : সব কিছু থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন— এমন এক অনুভূতি, কোনো স্পষ্ট কারণ ছাড়াই হঠাৎ হঠাৎ ভয় পাওয়া। যখন মন হঠাৎ বুঝতে পারে সে কোনো কিছুর উপর নির্ভর করতে পারে না, কোনো বিনোদন, কোনো মনোরঞ্জনই তার এই ভিতরের শূন্যতাকে ভরে দিতে পারে না— সে ভয় পায়। এটাই একাকীত্ব। কিন্তু একত্ব একেবারেই অন্য জিনিস। যখন তুমি একাকীত্বের মধ্যে দিয়ে গেছো, তাকে উপলব্ধি করেছো তখন এই একত্বের অবস্থা আসে। এ এক অদ্ভুত মুক্ত অবস্থা। এই একত্বের অবস্থায় তুমি মানসিকভাবে কারোর উপর কখনো নির্ভর করো না, কারোর কাছে মানসিক আশ্রয় চাও না, তার কারণ হলো তুমি আর— সুখ, আরাম, সন্তুষ্টি এগুলোর পিছনে দৌড়োচ্ছো না। তখনই মন সম্পূর্ণভাবে একক (alone) এবং সেই মনই সৃষ্টিশীল।

এই একাকীত্বের যন্ত্রণার মুখোমুখি হওয়া, আমাদের সকলের পরিচিত সেই অদ্ভুত শূন্যতার মুখোমুখি হওয়া, যখন তা আসে ভয়ে সংকুচিত না হওয়া, রেডিও চালিয়ে না দেওয়া অথবা নিজেকে কোনো কাজে হারিয়ে না ফেলা, কোনো প্রেক্ষাগৃহে ছুটে না যাওয়া বরং

সেই একাকীত্বকে দেখা, তার ভিতরে প্রবেশ করা, তাকে উপলব্ধি করা হলো শিক্ষার অঙ্গ। এমন কোনো মানুষ নেই, যে ভিতর কাঁপিয়ে দেওয়া এই একাকীত্বকে অনুভব করেনি বা করবে না। আমরা সবসময় কোনো বিনোদনের বা কোনো সন্তুষ্টির তথা যৌনসুখ, ঈশ্বর আরাধনা বা প্রচুর কাজ অথবা মদ্যপান, কবিতা লেখা অথবা মুখস্থ করা কিছু শব্দাবলীকে পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে একাকীত্ব থেকে পালিয়েছি আর পালিয়েছি। তাই যখন সেই উদ্বেগময় মুহূর্তগুলো আসে, আমরা তাকে বুঝতে পারি না।

তাই একাকীত্বের এই যন্ত্রণা যখন আসবে, তার মুখোমুখি হও; এর থেকে পালিয়ে যাবার কথা একবারও না ভেবে, সোজাসুজি এর দিকে তাকাও। যদি পালাও একে বুঝতে পারবে না, সারাজীবন তোমার সাথে ছায়ার মতো এ থেকে যাবে। কিন্তু যদি একে বুঝতে পারো এবং একে অতিক্রম করো, তখন দেখবে পালাবার কোনো প্রয়োজন নেই; চিত্তসন্তুষ্টি বা আমোদের কোনো তৃষ্ণাই আর নেই কারণ মন এমন কোনো ঋদ্ধ অবস্থাকে জেনেছে, যা সকল কলুষতার, ক্ষয়ের, ভঙ্গুরতার অতীত।

এই সবই শিক্ষার অঙ্গ। বিদ্যালয়ে যদি কেবলমাত্র পরীক্ষা পাশের জন্যই কতকগুলো বিষয়কে পড়ো তবে ঐ পড়াশুনাই একাকীত্ব থেকে পালাবার পথ হয়ে দাঁড়াবে। এটা নিয়ে একটু ভাবো, তবে বুঝতে পারবে। শিক্ষকদের সাথে এই নিয়ে আলোচনা করলে বুঝতে পারবে তাঁরা কী ভীষণ একাকী, আর তোমরাও কতো একাকী। কিন্তু যাঁদের অন্তরের অন্তরে দেখা দিয়েছে সেই নিবিড় ঐক্য (alone), যাদের মন এবং হৃদয় একাকীত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত তারাই সত্য মানব, কারণ তারাই পরম কী তা আবিষ্কার করেন, তারাই সময়াতীতের স্পর্শ লাভ করেন।

প্রশ্নকারী ঃ *সজাগতা আর সংবেদনশীলতার পার্থক্য কী?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ আদৌ কি কোনো পার্থক্য আছে? একটা ব্যাপার তোমরা সকলেই জানো— যখন প্রশ্ন করা হয় তখন সবচেয়ে জরুরী হলো নিজেই তার সত্যতা খুঁজে বার করা। অন্যে কী উত্তর দিল সেটার মূল্য খুবই কম। এখন সবাই মিলে আমরা সজাগতা কী সেটা দেখার চেষ্টা করবো।

তুমি দেখো কোনো গাছের প্রতিটা পাতাকে বৃষ্টি এসে ধুয়ে-মুছে ঝকঝকে করে দিয়ে গেছে, সূর্যের আলো জলের উপর পড়ে চিক্‌চিক্‌ করছে, বা কোনো পাখীর উজ্জ্বল রঙ্গীন ডানাকে সে আলো আরো উজ্জ্বল করেছে, গ্রামীণ লোকেরা ভারী ভারী বোঝা নিয়ে শহরের পথে চলেছে; তুমি তাদের হাসি শুনতে পাও অথবা কোনো কুকুর ডাকছে বা কোনো বাছুর তার মাকে ডাকছে এমন কতো কিছুই শুনতে পাও। এইসবই সজাগতা, তোমার চারিপাশে যা যা ঘটে চলেছে তার প্রতি তোমার সজাগতা, নয় কি? এবার এটাকে আর একটু কাছে নিয়ে এসো— তুমি তোমার সাথে অন্য ব্যক্তিদের, তোমার বিভিন্ন ধারণার, বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্ককে লক্ষ্য করো। কোনো বাড়ি বা কোনো রাস্তা সম্পর্কে তোমার অনুভূতির ব্যাপারে তুমি সচেতন। যখন কেউ তোমাকে কিছু বলে তোমার প্রতিক্রিয়া কী, কেমনভাবে তোমার মন সব কিছুর মূল্যায়ন করছে, সব কিছুর বিচার করছে, কোনো কিছুর সাথে অন্য কোনো কিছুর তুলনা করছে, কোনো কিছুকে দোষারোপ করছে— তুমি এগুলোকে লক্ষ্য করো। এগুলো সবই সজাগতার এক-একটা দিক, এমনভাবেই এটা উপরের স্তরে শুরু হয়, তারপর গভীর থেকে গভীরতর হয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই এই সজাগতা একটা দূর অবধি দিয়ে থেমে যায়। আমরা বিভিন্ন শব্দ শুনি, গান শুনি, অনেক সুন্দর, অনেক কুৎসিত জিনিস দেখি, কিন্তু তাদের প্রতি আমাদের ভিতরের

প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমরা সচেতন নয়। আমরা কেবলমাত্র বলি ‘এটা সুন্দর’ ‘ওটা কুৎসিত’ এবং এগিয়ে যাই। আমরা কোনোসময় সন্ধান করি না সুন্দরই-বা কী আর অসুন্দরই-বা কী। তোমার প্রতিক্রিয়াগুলোকে দেখা, তোমার নিজের প্রতিটা চিন্তার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আরো আরো বেশী সচেতন হওয়া, কেমনভাবে তোমার মন তোমার বাবা-মা, শিক্ষক, তোমার জাতি এবং সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত— তাকে লক্ষ্য করা— এই সবই সজাগতার এক একটা অংশ, তাই নয় কি?

মন তার নিজের চিন্তার প্রক্রিয়ার যতোই গভীর স্তরে প্রবেশ করতে থাকে, ততই সে উপলব্ধি করে কীভাবে প্রতিটা চিন্তা অতীত জ্ঞান দ্বারা সংস্কারাবদ্ধ, কীভাবে তা অতীত দ্বারা প্রভাবিত, আর তখনই এক সহজ শান্ততা আসে। এটা মানে কিন্তু একেবারেই এরকম নয় যে মন তখন ঘুমিয়ে পড়ে। ঠিক উল্টোটাই ঘটে, মন তখন অসম্ভব সজাগ, কোনো মন্ত্র বা একই শব্দের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে না বা কোনো বিশেষ নিয়ম বা অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সে এক বিশেষ কাঠামো লাভ করে না। এই প্রশান্ত সচেতন অবস্থাও সজাগতার অংশ। যদি তুমি আরো গভীরে প্রবেশ করো তাহলে দেখবে যে ব্যক্তি সচেতন এবং যে বস্তু সম্পর্কে সে সচেতন— এই দুয়ের মধ্যে আর কোনো বিভেদ থাকে না।

এখন প্রশ্ন হলো সংবেদনশীলতার অর্থই-বা কী? কোনো কিছুর বর্ণ এবং তার আকৃতিকে বুঝতে পারা, কেউ কী বলল এবং তোমার প্রত্যুত্তরই-বা কী তার ব্যাপারে সচেতন থাকা; বিচারশীল হওয়া, সুরুচি থাকা, ভদ্র মার্জিত আচার-আচরণ করা; রুক্ষ বা কঠোর না হওয়া, কাউকে শারীরিক বা মানসিকভাবে আঘাত না করা অথবা এর সম্পর্কে অসচেতন না থাকা; কোনো সুন্দর কিছুকে দেখা এবং তার সাথে থাকা; কোনো কিছু সম্পর্কে স্থির ধারণা না করে নিয়ে, বিরক্ত না হয়ে

যা বলা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে তাকে শোনা যাতে মন সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে, তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে— এই সবই হলো সংবেদনশীলতা, তাই নয় কি? তাহলে এখন বলোতো সজাগতা আর সংবেদনশীলতার মধ্যে খুব একটা কিছু পার্থক্য কি আছে? আমার তো তা মনে হয় না।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবে, মন যতক্ষণ কোনো কিছুকে দোষ দিচ্ছে, কোনো কিছুর বিচার করছে, বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ধারণা গঠন করছে, বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছোচ্ছে, সেগুলোকে আঁকড়ে ধরে থাকছে, ততক্ষণ মন সজাগও নয়, সংবেদনশীলও নয়। যখন তুমি অন্যদের সাথে রুক্ষ অথবা কঠোর ব্যবহার করো, যখন একটা ফুলকে ছিঁড়ে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও, যখন অন্যান্য প্রাণীদের সাথে তুমি নিষ্ঠুর ব্যবহার করো, যখন একটা সুন্দর আসবাবের উপর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নিজের নাম খোদাই করো, অথবা চেয়ারের একটা পা ভেঙ্গে ফেলো, যখন তুমি খাওয়ার সময়ের ব্যাপারে অনিয়মিত, এবং সাধারণভাবে তোমার আচার-ব্যবহার মন্দ— তখন এই প্রত্যেকটা জিনিস খুব স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দেয় তুমি সংবেদনশীল নও। এটা আরো বলে তোমার মন সচেতনতার সাথে নমনীয় হতে, মানিয়ে নিতে সমর্থ নয়। তাই শিক্ষার এটাও একটা কাজ, তা যাতে ছাত্রকে সংবেদনশীল হতে সাহায্য করে, ফলে ছাত্র কেবল সব কিছু মেনে নেবে বা তাদের বিরুদ্ধে যাবে এমন নয়, বরং জীবনের সমগ্র প্রক্রিয়াটির ব্যাপারে সে সচেতন হয়ে উঠবে। সংবেদনশীল লোকেরা হয়তো অসংবেদনশীল লোকেদের থেকে জীবনে অনেক বেশী কষ্ট পাবেন। কিন্তু একবার যদি তাঁরা এই পুরো ব্যাপারটাকে উপলব্ধি করেন এবং তাঁদের নিজের দুঃখ, নিজের আঘাতকে অতিক্রম করেন, তাহলে তাঁরা অসাধারণ কিছু আবিষ্কার করবেন।

প্রশ্নকারী ঃ *যখন কেউ হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় আমরা হাসি কেন?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ এটা সহানুভূতিহীনতার লক্ষণ। পরপীড়ন বলে একটা ব্যাপার আছে। তোমরা কি জানো এই শব্দের অর্থ কী? মার্কুই-দো-সাদে নামক একজন লেখক এক ব্যক্তি সম্পর্কে একটি বই লিখেছিলেন। সে ব্যক্তি অন্যকে আঘাত দিতেন, অন্যকে তীব্র যন্ত্রণা দিতেন এবং অন্যের সেই কাতরতা দেখে উল্লাস অনুভব করতেন। সেখান থেকে স্যাডিজিম শব্দটা এসেছে। যার অর্থ অন্যের দুর্দশা, অন্যের কাতরতা থেকে তৃপ্তি পাওয়া, উল্লাস করা। নিজেকে লক্ষ্য করো, দেখো সেই একই অনুভূতি তোমার মধ্যেও ক্রিয়া করছে না তো? এটা হয়তো ততটা স্পষ্টরূপে নেই, তবু যদি এটা থাকে তাহলে অন্যের পড়ে যাওয়া দেখে এটা তোমার মধ্যে একটা হাসির আবেগ এনে দেবে। এইভাবেই তা নিজেকে প্রকাশ করে। যাঁরা তোমাদের থেকে কোনো-না-কোনো কিছুতে উচ্চস্থানে আছেন তোমরা তাঁদের টেনে নীচে নামাতে চাও, তোমরা অন্যের সম্পর্কে অবিবেচনাপূর্ণ মন্তব্য করো, অন্যের আলোচনা করো, এগুলো সবই অসংবেদনশীলতার প্রকাশ। এরমধ্যে অন্যকে আঘাত দেবার ব্যাপারটা লুকিয়ে থাকে। কেউ ইচ্ছে করে, প্রতিশোধস্পৃহা থেকে অন্যকে আঘাত করলো, আবার কেউ নিজের অজান্তেই কোনো কথা বলে বা কোনো ইঙ্গিত করে বা এক বিশেষ ধরণের দৃষ্টি দিয়ে অন্যকে আঘাত করলো; কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই অন্যকে আঘাতের সেই স্পৃহা কাজ করছে। এখন খুব অল্প সংখ্যকই মানুষ আছেন, যাঁরা এই বিকৃত সুখকে সম্পূর্ণরূপে নিজের জীবন থেকে সরিয়ে রাখতে পারেন।

প্রশ্নকারী ঃ *আমাদের একজন অধ্যাপক বলেন, আপনি যা যা বলেন বাস্তবে তার রূপায়ণ সম্ভব নয়, ওগুলো অব্যবহারিক। তিনি বলেন, একশো কুড়ি টাকা মাইনেতে ছটা ছেলে আর ছটা মেয়েকে পালন করে, তারপর যদি আপনি একই কথা বলেন তো ঠিক আছে। এ*

ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

কৃষ্ণমূর্তি ঃ প্রথম কথা আমার বেতন যদি একশো কুড়ি টাকা হতো, তাহলে আমি ছয়টা ছেলে আর ছয়টা মেয়ের জন্ম দিতাম না। দ্বিতীয়ত আমি যদি একজন অধ্যাপক হতাম তাহলে সেটা হতো আমার সমর্পণ, সেটাকে আমি একটা চাকরি হিসাবে নিতাম না। যেকোনো স্তরে শিক্ষকতা কোনো ব্যবসা নয়, কোনো চাকরি নয়, এটা হলো নিজেকে সঁপে দেওয়া, এটা নিজেকে উৎসর্গ করার একটা ক্রিয়া। এই উৎসর্গ বা সমর্পণ কথাটার অর্থ কি বুঝতে পারছো? উৎসর্গীকৃত হওয়ার অর্থ নিজের সত্তার সারকে সেখানে সম্পূর্ণ-রূপে ঢেলে দেওয়া, প্রতিদানে কিছু না আশা করা, যেমন কোনো ফকির বা কোনো সন্ন্যাসী, কোনো মহান শিক্ষক বা বিজ্ঞানসাধক হয়ে থাকেন। কখনোই তেমন নয় কয়েকটা পরীক্ষার গণ্ডি পেরোলাম আর নিজেকে অধ্যাপক মনে করতে শুরু করলাম। আমি সেই সমস্ত সমর্পিত ব্যক্তির কথা বলছি যাঁরা শিক্ষকতাতেই নিবেদিত প্রাণ, অর্থের জন্য নয় গভীরভাবে ভালোবাসেন বলেই তাঁরা শিক্ষকতাকে স্বয়ংবরণ করেছেন। এমন শিক্ষক যদি থেকে থাকেন, তিনি বাস্তবিকতার সাথেই ছেলেমেয়েদের আমি যা বলছি তা শেখাতে পারবেন। কিন্তু যে শিক্ষক বা অধ্যাপকের কাছে শিক্ষকতা অর্থ উপার্জনের একটা উপায় মাত্র, তিনি অবশ্যই বলবেন, আমি যা যা বলছি তা ব্যবহারিক নয়।

এবার বলতো এই ব্যবহারিক বা প্র্যাকটিক্যাল কথাটার মানে কী? একটু ভাবো। যেভাবে আমরা এখন বেঁচে আছি, যেভাবে আমরা শিক্ষা দিচ্ছি, যেভাবে ভ্রষ্টাচার ও যুদ্ধের সাথে আমাদের সরকার চলছে তোমরা কি এগুলোকে প্র্যাকটিক্যাল বলবে? তবে কি উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্র্যাকটিক্যাল, লোভ প্র্যাকটিক্যাল? উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরম প্রতিযোগিতার জন্ম দেয় এবং সেইজন্য তা ব্যক্তিকে নষ্ট করে। লোভ আর অধিকারলিপ্সার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ, সবসময়— যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব ও

দুর্গতির অপচ্ছায়ার মধ্যে থেকে সব কিছুকে গ্রাস করে চলে; তাহলে কি বলছো এগুলো ব্যবহারিক? নিশ্চয় নয়। আমার এইসব কথার ভিতর দিয়ে আমি তো বারবার তোমাদের সামনে সেইটাই প্রকাশ করার চেষ্টা করছি।

পৃথিবীতে ভালোবাসাই সবচেয়ে কার্যকরী জিনিস। ভালোবাসা, করুণাময় হওয়া, লোভী না হওয়া, উচ্চাকাঙ্ক্ষী না হওয়া, অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিজে চিন্তা করা— এগুলোই সত্যকার কার্যকরী বস্তু। এগুলোই একটা কার্যকরী, সুখী সমাজের জন্ম দেয়। কিন্তু যে শিক্ষক নিজেকে সঁপে দেননি, যাঁর মধ্যে সেই ভালোবাসা স্পন্দিত হচ্ছে না, তাঁর হয়তো নামের পিছনে কয়েকটা শব্দ বসেছে, তিনি বিভিন্ন বই থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন, যেগুলো তিনি তোমাদের সরবরাহ করছেন, অথচ ঠিক এইটাই কার্যকরী নয়, কারণ এগুলো সম্পর্কে তিনি নিজে কোনোদিন চিন্তাভাবনা করেননি। ভালোবাসা এই তথাকথিত শিক্ষার থেকে অনেক অনেক বেশী ব্যবহারিক। এই শিক্ষা এমন ব্যক্তির সৃষ্টি করে যারা একা দাঁড়াতে অক্ষম, যেকোনো সমস্যা নিয়ে নিজে মৌলিকভাবে চিন্তা করতে অসমর্থ।

এটাও সজাগতার একটা অংশ। দেখো, এইসব বাস্তবিকতার প্রতি সজাগ হও : তাঁরা সব কোণে দাঁড়িয়ে ভিতরে ভিতরে হাসছেন এবং একই সময় গম্ভীরতা সহকারে নিজের কাজটাও চালিয়ে যাচ্ছেন।

আসল সমস্যাটা অন্য জায়গায়। অধিকাংশ বয়স্ক লোকই তাঁদের নিজেদের জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারেননি, তবুও নির্দ্বিধায় তাঁরা বলেন, ‘‘আমি তোমাদের বলে দেবো কোন্‌টা প্র্যাকটিক্যাল আর কোনটা নয়।’’ শিক্ষকতাই জীবনের মহানতম কাজ। যদিও একে তুচ্ছ করে দেখা হয় তবুও এটা সবচেয়ে উচ্চ, সবচেয়ে পবিত্র এক কাজ। কিন্তু শিক্ষককে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হতে হবে;

তাঁর হৃদয়, মন, তাঁর সমগ্র সত্তাকে উজাড় করে দিলে, সেই উৎসর্গ থেকে অনেক জিনিসই সম্ভব হয়ে উঠবে।

প্রশ্নকারী ঃ *শিক্ষা গ্রহণ করা সত্ত্বেও যদি আধুনিক বিশ্বের বিলাসিতা আমাদের বিনষ্ট করে তাহলে এমন শিক্ষার অর্থ কী?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ আমার মনে হচ্ছে তুমি ভুলভাবে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করছো। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম একজনের নিশ্চয় প্রয়োজন, তাই নয় কি? কেউ যখন শান্ত হয়ে কোনো ঘরে বসে, তখন সেই ঘরটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন, হয়তো ঘরটায় কোনো আসবাব নেই, শুধু একটা মাদুর আছে। ঘরটার আকারও যেন ঠিক হয় এবং সঠিক মাপের জানালা যেন থাকে। যদি একটা ছবি থাকে, তাহলে যেন কোনো সুন্দর ছবি থাকে, যদি ফুলদানিতে ফুল থাকে তবে তাতে যেন যে ব্যক্তি সে ফুল সাজিয়েছেন তাঁর প্রাণের প্রৈতির চিহ্ন থাকে। ব্যক্তির সঠিক খাবার এবং ঘুমাবার জন্য একটা শান্ত জায়গা প্রয়োজন। এগুলো সবই আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের অংশ এবং আধুনিক পৃথিবী এগুলো আমাদের দেয়। তুমি কি বলতে চাইছো এই স্বাচ্ছন্দ্য, এইটুকু আরামই তথাকথিত শিক্ষিত মানুষকে বিনষ্ট করছে? নাকি এই তথাকথিত শিক্ষিত মানুষেরা তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দিয়ে, তাঁদের লোভ দিয়ে, প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য এই স্বল্পতম আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যকে নষ্ট করছে। উন্নত দেশগুলিতে আধুনিক শিক্ষা মানুষকে আরো বেশী জড়বাদী করে তুলছে, সেইজন্য বিলাসিতার বিভিন্ন উপকরণ, বিভিন্ন পথ মনকে নষ্ট করছে, বিকৃত করছে। ভারতের মতো দরিদ্র দেশগুলোতে শিক্ষা তোমাদের একেবারে নতুন এক সংস্কৃতির সৃষ্টির ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করছে না, তোমাদের মধ্যে বিপ্লবের আগুন জ্বালাচ্ছে না। আমি বিপ্লবী হওয়া বলতে কী বোঝাই, তা আগেই বলেছি। এর অর্থ বোমা

ছোঁড়া বা অন্যদের হত্যা করা কিন্তু একেবারেই নয়। এইগুলো যাঁরা করে থাকেন আদপেই তাঁরা বিপ্লবী নন। সত্যকার বিপ্লবী সকল প্রকার প্রলোভন থেকে মুক্ত, সকল মতাদর্শ থেকে মুক্ত, সমষ্টির অগুণতি কামনার পরিণাম যে সমাজ— তার বন্ধন থেকে মুক্ত। কিন্তু তোমাদের শিক্ষা তোমাদের তেমন ধরণের বিপ্লবী হতে সহায়তা করছে না। অপরপক্ষে এটা তোমাদের মানিয়ে নেবার শিক্ষা দিচ্ছে, যা আছে তাকে একটু-আধটু সংস্কার করার শিক্ষা দিচ্ছে।

সুতরাং আধুনিক পৃথিবী যে আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্য তোমাদের দিচ্ছে— সেটা নয়, তথাকথিত শিক্ষাই তোমাদের নষ্ট করছে। তোমাদের গাড়ি বা ভালো রাস্তা কেন থাকবে না? কিন্তু দেখবে আধুনিক প্রযুক্তি এবং তাদের আবিষ্কারকে যুদ্ধের কাজে লাগানো হচ্ছে অথবা চিত্ত-বিনোদনের তথা একজন যাতে নিজের কাছ থেকে নিজে পালাতে পারে সেই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। মন এইসব যান্ত্রিক উপকরণের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। আধুনিক শিক্ষা বহু যন্ত্র নির্মাণে সহায়তা করছে, যেমন যেটা তোমাদের রান্নায়, পরিষ্কার করায়, ইস্ত্রি করায় বা গণনা করায়— এমন আরো হাজার একটা বিষয়ে সাহায্য করে এবং যাতে তোমাদের সবসময় এইসব ব্যাপার নিয়ে না ভাবতে হয়। এইসব উপকরণ প্রয়োজন, কিন্তু এই উপকরণের জঙ্গলে পথ হারিও না, বরং সম্পূর্ণ নতুন কিছু করার জন্য নিজেদের মুক্ত করো।

প্রশ্নকারী ঃ *আমি বড়ো কালো, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই তো ফরসা লোকেদের পছন্দ করে। কী করে তাদের কাছ থেকে প্রশংসা পাবো?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ আমার মনে হয় কিছু কিছু কসমেটিক্‌স আছে, যেগুলো চামড়ার রঙকে একটু পরিষ্কার করে, কিন্তু এতে কি তোমার সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবে? তুমি তো আবার সেই অন্যের চোখে তোমার

জন্য একটু মুগ্ধতা, একটু প্রশংসা দেখতে চাইবে, সামাজিকভাবে বিশিষ্ট কেউ হতে চাইবে। এই যে নিজেকে আলাদা করে প্রমান করবার, তথা বিশিষ্ট কেউ হতে চাওয়ার মধ্যে যে সংগ্রাম, তার মধ্যে সবসময় কোথাও একটা দুঃখের জ্বালা থাকবে। তুমি প্রশংসিত হতে বা আলাদা কেউ হতে চাইলে এই শিক্ষাই তোমায় নষ্ট করবে, কেননা তা তোমায় এই সমাজেই বিশিষ্ট কেউ হতে সাহায্য করবে, আর এই সমাজটাতো ইতিমধ্যেই পচতে শুরু করেছে। আমরা আমাদের লোভ, ঈর্ষা, ভয় দিয়ে এই সমাজটাকে গড়েছি। একে এড়িয়ে গিয়ে অথবা এটা একটা মায়া এই অভিধা দিলেই সমাজে কোনো রূপান্তর আসবে না। সঠিক শিক্ষার ধারাই এই লোভ, ভয়, সবকিছু অধিকারের লিপ্সার আবর্জনাকে সাফ করবে, তবেই আমরা একেবারে এক নতুন সংস্কৃতি, এক অন্য পৃথিবী গড়ে তুলতে পারবো। যখন মন সত্যিই নিজেকে বুঝতে চায় এবং দুঃখ থেকে মুক্ত হয়, তখনই সঠিক শিক্ষা সম্ভব।

২৪

প্রাণশক্তি

আমাদের বর্তমান সময়ে 'অনুশাসন' হলো অন্যতম প্রধান সমস্যা এবং সমস্যাটা যথেষ্ট জটিল। দেখবে সমাজ ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত বা অনুশাসিত করতে চায়; সমাজ বিশেষ কোনো ধর্মীয় বা সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক ছাঁচে ব্যক্তির মনকে ঢালতে চায়, সেই অনুযায়ী তাকে গড়তে চায়।

এখন প্রশ্ন হলো অনুশাসনের কি সত্যি কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে? ব্যাপারটা একটু ভালো করে শোনো, তাড়াতাড়ি 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে ফেলো না। যখন আমরা ছোটো থাকি, আমরা মনে করি অনুশাসনের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, আমাদের যেটা যেমন ভালোলাগে সেটা সেরকম করতে দেওয়া উচিত এবং একেই আমরা স্বাধীনতা বলে মনে করি। কিন্তু অনুশাসনের সমস্যাটাকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি না করে, শুধু শুধু বলা— এটা থাকা উচিত বা উচিত নয় অথবা আমাদের স্বাধীন হওয়া উচিত— এসবের খুব অল্প মূল্য আছে।

একজন সাচ্চা খেলোয়াড় কিন্তু সবসময় নিজেকে চরম নিয়মের মধ্যে রাখেন, তাই তো? খেলার আনন্দের জন্য এবং শারীরিকভাবে নিজেকে তার উপযুক্ত রাখার জন্য সঠিক সময় ঘুমাতে যাওয়া, ধূমপান না করা, সঠিক খাবার খাওয়া অর্থাৎ সুস্বাস্থ্যের জন্য যা যা নিয়মপালন করতে হয় সেগুলো তিনি মেনে চলেন। তাঁর এই যে নিয়ম মেনে

চলা, এ কিন্তু তাঁর উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া নয়। এরমধ্যে কোথাও কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না। এটা, খেলার আনন্দই তাঁর মধ্যে সহজাতভাবে এনে দেয়।

এখন প্রশ্ন হলো এই শৃঙ্খলা বা অনুশাসন কি মানুষের শক্তিকে বাড়ায় না কমায়? সারা পৃথিবীতে প্রত্যেক ধর্ম, সব দর্শনের সম্প্রদায় মনের উপর অনুশাসনের ভার চাপিয়ে দেয়, যেটার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ থাকে, প্রতিরোধ থাকে, মানিয়ে নেওয়া থাকে, দমন করা থাকে। এগুলো কি আদৌ জরুরী? অনুশাসন যদি শক্তির মুক্তি ঘটায় ও শক্তি উত্তরোত্তর বাড়াতে থাকে তবে এর মূল্য আছে, কিন্তু যদি এটা মানবীয় শক্তিকে অবদমিতই করে তাহলে এটা কিন্তু ক্ষতিসাধক, এটা বৈনাশিক। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে শক্তি রয়েছে। প্রশ্নটা হলো অনুশাসনের মাধ্যমে শক্তি কি আরো সক্রিয়, আরো জীবন্ত ও অফুরান হয়ে ওঠে, নাকি যেটুকু আছে সেটাকে অনুশাসন শেষ করে দেয়। এটাই মূল বিচার্য বিষয়।

অনেক মানুষের মধ্যে খুব কম শক্তি থাকে। সমাজ ও তথাকথিত শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ, তাদের রক্তচক্ষুর শাসন, শোভন-অশোভনের মানদন্ড সেটুকু শক্তিকেও অবদমিত করে, নষ্ট করে। এইভাবে ব্যক্তির শুধু অনুকরণের সামর্থ্যই রয়ে যায়, তারা সমাজের প্রাণহীন সভ্যে পরিণত হয়। যারা আরো বেশী কিছু খোঁজ শুরুর জন্য তাদের যাত্রা শুরু করতে চায়, এই অনুশাসন কি তাদের আরো বেশী শক্তির পাথেয় দিতে পারে? অনুশাসন কি তাদের জীবনকে আরো ঋদ্ধ, আরো পূর্ণপ্রাণ করে তুলতে পারে?

তোমাদের এই তারুণ্য শক্তিতে পূর্ণ, তাইতো? তোমরা খেলাধূলা করতে চাও, কথাবার্তা বলতে চাও, তোমরা একটুও চুপ করে বসতে পারো না। তোমাদের সত্তায় প্রাণের যৌবনের আকুলতা। কিন্তু ঠিক তারপরেই কী ঘটে? তোমরা ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকো, আর

তোমাদের শিক্ষকেরাও ঐ শক্তিকে বিশেষ আকার দিয়ে তাকে বিভিন্ন ছাঁচে ঢালতে ঢালতে তাকে ক্ষীণ করতে থাকেন, এইভাবে চলেই একসময় তোমরা প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী বা পুরুষ হয়ে ওঠো। 'তোমাদের একজন ভালো নাগরিক হতে হবে, তোমাদের এই বিশেষ বিশেষভাবে ব্যবহার করতে হবে'— এসবের চাপ দিয়ে যে অবশিষ্ট শক্তিটুকু তোমাদের মধ্যে বেঁচে ছিল সমাজ সেটুকুও দমন করার কাজটা সম্পন্ন করে দেয়। এইপথেই তারুণ্যের শক্তিতে উপচে পড়া ভাণ্ডারকে তথাকথিত শিক্ষা আর সমাজের বাধ্যবাধকতা মিলে নিঃশেষ করে দেয়, নষ্ট করে দেয়।

এখন প্রশ্ন হলো তোমাদের মধ্যে যে শক্তি আছে অনুশাসনের মাধ্যমে কি তাকে আরো বাড়ানো যায়? যদি তোমাদের মধ্যে অল্প শক্তি থাকে, তাহলেও কি সেটা বাড়ানো যায়? যদি তা সম্ভব হয় তাহলে অনুশাসনের একটা অর্থ আছে, আর যদি তা না হয়, অনুশাসন যদি শক্তিকে নষ্টই করে তাহলে একে সরিয়ে রাখতে হবে।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই যে শক্তি আছে, সেটা কী? চিন্তন, অনুভব, আগ্রহ, উদ্যম, লোভ, অভীপ্সা,লালসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ঘৃণা— এগুলো সবই শক্তির বিভিন্ন রূপ। ছবি আঁকা, নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করা, সেতু নির্মাণ করা, রাস্তা তৈরী করা, জমি চাষ করা, খেলা, কবিতা লেখা, গান করা, নাচা, মন্দিরে যাওয়া, পূজাপাঠ করা— এই সবই শক্তির প্রকাশ; শক্তি আবার— ভ্রম, বিভিন্ন উপদ্রব এবং দুর্গতিও সৃষ্টি করে। অতি সূক্ষ্ম গুণগুলো আর যা সব কিছুকে নাশ করে— দুটোই কিন্তু সমানভাবে মানবীয় শক্তির প্রকাশ। কিন্তু শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা, তাকে বিভিন্ন অনুশাসনের দ্বারা খর্ব করা, একদিকে তাকে প্রবাহিত হতে দেওয়া, অন্যদিকে তার গতিরোধ করা, তাকে প্রতিরোধ করার এই প্রক্রিয়া যেন সামাজিক সুবিধারই

কাজে লাগছে। কোনো বিশেষ সংস্কৃতির ছাঁচে মনকে ঢেলে ফেলা হচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়ায় শক্তিও ক্রমশঃ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হলো, এই যে শক্তি, যা কোনো-না-কোনোরূপে আমাদের সকলের মধ্যে বিদ্যমান, তাকে কি বাড়ানো যায়, তার মধ্যে কি নতুন প্রাণসঞ্চার করানো যায়? যদি তাই হয় তবে কী করার জন্য? এই শক্তি কীসের জন্য? এই শক্তি কি যুদ্ধের কাজে যাতে লাগে তারজন্য? জেট-প্লেন এবং অন্যান্য অসংখ্য মেসিন আবিষ্কারের জন্য? কোনো গুরুকে অনুসরণ করা, পরীক্ষা পাশ করা, সন্তানোৎপাদন করা, এটা বা সেটা নিয়ে অবিরাম চিন্তা করতে পারার জন্য? নাকি সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায় একে ব্যবহার করা যায়, যাতে আমাদের সকল কর্মের আত্মীয়তা এমন কিছুর সাথে হতে পারে যা এইসব কিছুর সীমাকে অতিক্রম করে, তথা যা এইসব কিছুর অতীত। এমন আশ্চর্য শক্তির আধার যে মানব মন, তা যদি ঈশ্বর কী— তার অনুসন্ধান না করে, তাহলে তা ক্ষতি এবং দুর্গতি সৃষ্টির কাজেই ব্যবহৃত হয়। পরমকে খুঁজতে হলে শক্তির অজস্রতা প্রয়োজন, আর যদি মানুষ সে পথে না যায়, তাহলে উপদ্রব সৃষ্টিকারী পথে সে তার শক্তি ক্ষয় করতে থাকে। তখন সমাজকে সেইসব আবার নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এখন প্রশ্ন হলো, সত্য বা পরমকে খোঁজার জন্য কি এ শক্তিকে মুক্ত করে দেওয়া সম্ভব, এবং এই অন্বেষণের প্রক্রিয়াতেই ব্যক্তি এমন এক সত্তায় পরিণত হয়— যে মানুষ জীবনের মৌলিক প্রশ্নগুলোকে বুঝতে পারে এবং সমাজ কখনই কোনোভাবে তাকে নষ্ট করতে পারে না? এগুলো কি বুঝতে পারছো, নাকি একটু বেশী কঠিন হয়ে যাচ্ছে?

মানুষ স্বয়ং হলো শক্তি, তাই মানুষ যদি সত্যের খোঁজ না করে এই শক্তিই বৈনাশিক হয়ে ওঠে; সেইজন্য সমাজ ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে একটা নির্দিষ্ট আকার দেয়, সেই শক্তির স্বতঃস্ফূর্ততাকে

নষ্ট করে। পৃথিবীর অধিকাংশ বয়স্ক লোকেদের ক্ষেত্রে সেটাই ঘটেছে। একটা ব্যাপার হয়তো তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে, যে মুহূর্তে তোমরা সত্যি কিছু করতে চাও সেই মুহূর্তে সেই কাজ করার জন্য তোমাদের মধ্যে শক্তি আসে। ধরো তুমি সত্যিই কোনো একটা খেলা খেলতে চাইছো, তখন কী ঘটে? তৎক্ষণাৎ দেখবে তারজন্য প্রয়োজনীয় শক্তি তোমার কাছে আসে। তখন এই শক্তি নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে, তখন তোমাদের বাহিরের কোনো অনুশাসনের প্রয়োজন হয় না। সত্যের খোঁজে শক্তি নিজেই নিজের অনুশাসন তৈরী করে। যে মানুষ পরমকে খোঁজে, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সে সঠিক নাগরিকে পরিণত হয়। অবশ্যই তা বিশেষ কোনো সমাজ বা সরকারের তৈরী করা ছাঁচের সাথে মেলে না।

সুতরাং ছাত্র ও শিক্ষক উভয় মিলেই একসাথে ঈশ্বর, পরম বা সত্যকে অন্বেষণের প্রয়োজনে প্রচণ্ড শক্তির মুক্তির জন্য কাজ করতে হবে। সত্যকে খোঁজের মধ্যে দিয়েই একটা অনুশাসন আসবে। তখন তোমরা কেবল একজন হিন্দু, পার্সী, কোনো বিশেষ সমাজ বা সংস্কৃতি দ্বারা সীমিত থাকবে না, তোমরা হবে সত্যকার স্বয়ং-সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তা। স্কুল বর্তমানে যা করছে, তাতে ছাত্রদের শক্তি আরো ক্ষীণ, আরো স্তিমিত হয়ে পড়ছে। কিন্তু স্কুল যদি ছাত্রদের সত্যের খোঁজের জন্য শক্তির জাগৃতি ঘটানোর সহায়ক হয়, তাহলে দেখবে এই অনুশাসনের সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন অর্থ আছে।

কেন তোমাদের বাড়ীতে, ক্লাসে, হোস্টেলে সবসময় তোমাদের বলা হয়— তোমাদের কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়? অবশ্যই বাকী সমাজের মতোই তোমাদের পিতামাতা, তোমাদের শিক্ষকরা উপলব্ধি করেননি যে, মানবের অস্তিত্বের একটাই উদ্দেশ্য, আর তা হলো— সত্যের খোঁজ করা, ঈশ্বরের খোঁজ করা। যদি অতি স্বল্প সংখ্যক কিছু শিক্ষকও এই ব্যাপারটা বুঝতে পারেন এবং এই

অন্বেষণে তাদের সমগ্র মনোযোগ দেন, তবে তাঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের এক শিক্ষার ধারা নিয়ে আসবেন এবং ভিন্ন ধরণের সমাজও নির্মাণ করবেন।

এটা কি লক্ষ্য করোনি তোমাদের আশেপাশের মানুষ অবশ্য তারমধ্যে তোমাদের মাতা-পিতা এবং শিক্ষকরাও আছেন— তাঁদের কতো কম শক্তি আছে? যদিও তাদের শরীর এখনো পুরোনো হয়নি, তবুও তাঁরা ধীরে ধীরে প্রাণ-নিঃস্ব হতে চলেছেন। কেন এমন হয়? সমাজের জবরদস্তি, তার বাধ্যবাধকতাগুলো মেনে নিতে, মানিয়ে নিতে নিতে, আঘাত পেতে পেতে তাঁদের এমন হয়েছে। জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো— যে মনের অ্যাটমিক্-সাব্মেরিন বা জেট-প্লেন তৈরী করার ক্ষমতা আছে; যার এমন কাব্য, এমন গদ্য নির্মাণের ক্ষমতা আছে; যে পৃথিবীকে সৌন্দর্যে পূর্ণ করে দিতে পারে অথবা তাকে ধ্বংসও করতে পারে, সেই অদ্ভুত, অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মনকে মুক্ত করা। আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বর কী, পরম কী তার অন্বেষণ— এটা না উপলব্ধি করলে, সেই একই শক্তি বিধ্বংসী হয়ে দাঁড়ায়, তখন সমাজ বলে ‘আমাদের ব্যক্তির শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তাকে একটা খোপ-কাটা ছাঁচের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে’।

আমার মনে হয় শিক্ষার কাজ হলো করুণা, সত্য, ঈশ্বরের খোঁজে এ শক্তিকে মুক্ত করে দিতে সহায়তা করা, এটাই ব্যক্তিকে এক সত্যিকারের মানুষে পরিণত করে। কিন্তু এইসব কিছুকে উপলব্ধি না করে কেবল অনুশাসনের কোনো অর্থ হয় না, তখন তা বিনাশী হয়ে ওঠে। তোমাদের প্রত্যেককে এমনভাবে শিক্ষিত হবে যাতে স্কুলের চৌহদ্দি পেরিয়ে যখন তোমরা বিরাট বিশ্বে প্রবেশ করবে, তোমরা যেন প্রাণে, মেধায় পূর্ণ থাকো। সত্যকে খোঁজার জন্য যেন থাকে প্রাণের অজস্রতা, না হলে সমাজের বিরাট অন্ধকার জঠরে তোমরা তলিয়ে যাবে। তোমরা নষ্ট হবে, বাকী জীবনটা দুঃখে,

অবসাদে অবনত হয়ে যাবে। নদী তার নিজের তট নিজেই তৈরী করে, সেই তটই আবার নদীকে ধারণ করে; তেমনই যে শক্তি সত্যকে খোঁজে, কোনো অনুশাসনের বাধ্যতা ছাড়াই সে তার আপন নিয়ম, আপন শৃঙ্খলা আপনি-ই তৈরী করে। তারপর নদী যেমন সমুদ্রকে খুঁজে নেয়, সে শক্তিও নিজের মুক্তি খুঁজে নেয়।

প্রশ্নকারী ঃ *ইংরেজ কেন ভারতে শাসন করতে এসেছিল ?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ দেখবে যাঁদের বেশী শক্তি আছে, বেশী দক্ষতা আছে, বেশী উদ্দীপনা আছে, হয় তাঁরা তাঁদের থেকে কম শক্তিসম্পন্ন প্রতিবেশীদের জীবনে দুর্দশা আনেন, নয়তো তাদের উন্নতিসাধন করেন। একসময় ভারত সমগ্র এশিয়াকে সঞ্জীবিত করেছিল। ভারতের লোকেদের এক সৃষ্টিশীল উদ্দীপনা ছিল। তাঁরা চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, বর্মায় ধর্মপ্রচার করেছিলেন। অন্যান্য দেশের ব্যবসাবাণিজ্য প্রধান ছিল; তার হয়তো দরকারও ছিল, তবু ব্যবসার সাথে তার দুর্গতিও ছিল, কিন্তু এটাই জীবন। আবার একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো যাঁরা সত্যকে বা ঈশ্বরকে খোঁজেন, তাঁদের মধ্যে শক্তির স্ফুরণও অনেক বেশী ঘটে। এই অদ্ভুত শক্তিকে তাঁরা কেবল নিজেদের মধ্যেই নয় অন্যের মধ্যেও মুক্তরূপে প্রবাহিত করাতে পারেন। আসলে এঁরাই সত্যকার বিপ্লবী। কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট বা যাঁরা একটু আধটু সংস্কার করেন তাঁরা কোনো বিপ্লবীই নন। বিজেতা এবং শাসক সময়ের সাথে আসে আবার কোথায় হারিয়েও যায়, কিন্তু মৌলিক মানবীয় সমস্যা একই থেকে যায়। আমরা সবাই অন্যের উপর অধিকার চাই, অন্যকে দমন করতে চাই, হয় আমরা স্বীকার করে নিই, নয়তো প্রতিরোধ করি। কিন্তু যাঁরা সত্যের অন্বেষণ করেন তাঁরা সকল সমাজ সকল সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

প্রশ্নকারী ঃ *ধ্যানের সময়েও ব্যক্তি সত্য কী অনুভব করে বলে তো মনে হয় না; দয়া করে বলবেন সত্য কী?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ আপাতত সত্য কী সে প্রসঙ্গটা সরিয়ে রাখা যাক। দেখা যাক ধ্যান কী? আপনাদের বিভিন্ন গ্রন্থাদি এবং গুরুরা ধ্যান বলে আপনাদের যা শিখিয়েছেন আর আমি ধ্যান বলে যা বোঝাতে চাইছি দুটো কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। নিজের মনকে বোঝবার প্রক্রিয়াই হলো ধ্যান। যদি আপনি আপনার চিন্তাভাবনাগুলোকেই সঠিকরূপে না বুঝতে পারেন, তবে আপনি যা কিছুই ভাবুন না কেন তার কোনো ভিত্তি নেই। নিজের চিন্তাগুলোকে অনুধাবন করাই হলো আত্মবোধ। এই আত্মবোধের ভিত্তি না থাকলে চিন্তা উপদ্রব সৃষ্টি করে। প্রত্যেক চিন্তার একটা তাৎপর্য আছে। মন যদি সেটাকে দেখতে না পায় এবং অবশ্যই একটা বা দুটো চিন্তা নয়— প্রত্যেক চিন্তাকে— যখনই, তার সৃষ্টি হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে যদি তাদের তাৎপর্যকে অনুধাবন না করে, তাহলে শুধু শুধু কোনো আদর্শকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকলে বা কোনো মূর্তিতে বা মন্ত্রে একাগ্র হলে তা নিরর্থক। অবশ্য এগুলোকে ধ্যান বলে বলা হয়। এগুলো আসলে একপ্রকার আত্মসম্মোহন ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাহলে প্রশ্ন হলো, যখন শান্ত হয়ে বসে আছেন, কথা বলছেন, খেলছেন, তখন আপনার মধ্যে ওঠা প্রত্যেক চিন্তার, প্রত্যেক প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে কি আপনি সজাগ? তাদের তাৎপর্যকে কি উপলব্ধি করছেন? যদি চেষ্টা করেন, দেখবেন আপনার প্রত্যেক চিন্তার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সজাগ থাকা কী দুরূহ কাজ; তার কারণ অতি দ্রুততায় চিন্তা একটার উপর আর একটা জমতে থাকে। কিন্তু যদি একবার এই চিন্তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চান, যদি সত্যি এ কী নিয়ে গঠিত এবং এর সমস্ত কিছুকে জানতে চান,

তবে দেখবেন এর গতি কমে আসছে, আপনিও একে লক্ষ্য করতে পারছেন। এই চিন্তার গতি কমে আসা, এবং প্রত্যেক চিন্তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাই হলো ধ্যানের প্রক্রিয়া। যদি এর গভীরে প্রবেশ করেন, প্রত্যেক চিন্তার প্রতি যদি সজাগ হন, তবে অজস্র অস্থির চিন্তা— যেগুলো ভিতরে নিজেরা নিজেদের সাথে বিরোধ বাধাচ্ছে, লড়াই চালাচ্ছে— তাদের ভাণ্ডার যে মন— তা নীরব হতে থাকে। মন সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে যায়। তখন সেখানে কোনো ইচ্ছা, কোনো বাধ্যকতা, কোনো ভয় থাকে না। সেই স্তব্ধতায় সত্যের স্পর্শ পাওয়া যায়। সেখানে সত্যকে অনুভব করে এমন কোনো 'আমি'র অস্তিত্ব থাকে না। আসলে মনের সেই স্তব্ধতায় সত্য আসে। যে মুহূর্তে 'আমি' এলো তার মানে দর্শক বা অনুভবকারী চলে এলো। চিন্তা থেকেই এই অনুভবকারীর সৃষ্টি। তাই চিন্তার অনুপস্থিতিতে তারও কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

প্রশ্নকারী ঃ *আমরা যদি কোনো ভুল করি, কেউ যদি সেটা দেখিয়েও দেয়, তবু কেন সেই ভুল আবার করি?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ তোমার কী মনে হয়? কেন তোমরা ফুল ছিঁড়ে ফেলো, চারাগাছগুলোকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দাও, আসবাব নষ্ট করো, এখানে সেখানে কাগজ ফেলে দাও? অথচ এইসব না করার জন্য তোমাদের বহুবার বলা হয়েছে। ভালো করে শোনো, বুঝতে পারবে। যখন এইগুলো তোমরা করো, তখন একটা অবিবেচনার অবস্থায় থাকো। তখন তোমাদের মধ্যে না থাকে কোনো সচেতনতা, না থাকে এর সম্পর্কে কোনো চিন্তা, মন তখন ঘুমন্ত। তাই এইসব অবিবেচনাপূর্ণ কাজগুলো তোমরা করো। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা সম্পূর্ণরূপে সচেতন হবে, পূর্ণরূপে 'সেই স্থানে' উপস্থিত থাকবে, ততক্ষণ তোমাদের কিছু করতে বারণ করার কোনো মানেই হয় না। কিন্তু

যদি শিক্ষকরা তোমাদের বিচারশীল হতে এবং এই গাছ, পাখী, নদী আর পৃথিবীর অজস্র বিচিত্রতাকে আনন্দের সাথে দেখতে সাহায্য করেন, তখন একটা ছোটো ইঙ্গিতই যথেষ্ট হবে। তার কারণ তখন তোমরা তোমাদের চারিপাশের এবং তোমাদের মধ্যের সব কিছু সম্পর্কে সংবেদনশীল, উন্মুখ হয়ে উঠবে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবেই জন্মক্ষণ থেকে মৃত্যুক্ষণ অবধি, তোমাদের কী করতে হবে আর কী করতে হবে না— এই বলে বলেই তোমাদের সংবেদনশীলতাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। একদিকে তোমাদের বাবা-মা, শিক্ষক, সমাজ, ধর্ম, পুরোহিত; অন্যদিকে তোমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ, ঈর্ষা সবাই মিলে বলে চলে— এটা করা যাবে, ওটা করা যাবে না। এই কর্তব্য আর অকর্তব্যের টানাপোড়েন থেকে মুক্ত, অথচ সংবেদনশীল আর সেইজন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবেই দয়ালু হওয়া এবং লোককে আঘাত না করা, যেখানে সেখানে কাগজ ছুঁড়ে না ফেলা, রাস্তায় পড়ে থাকা কোনো পাথরকে সরিয়ে না ফেলে দিয়ে পাশ কাটিয়ে না যাওয়া— এইসব কিছুর জন্য চাই গভীর বিচারশীলতা। শিক্ষার উদ্দেশ্য তোমাদের নামের পিছনে কয়েকটা শব্দ যোগ করে দেওয়া নয়, বরং তার কাজ হলো যাতে তোমরা সংবেদনশীল, সজাগ বা করুনাময় হও তারজন্য তোমাদের মধ্যে বিচারশীলতাকে উজ্জীবিত করা।

প্রশ্নকারী : *জীবন কী, কীভাবে আমরা সুখী হতে পারি?*

কৃষ্ণমূর্তি : একটা বাচ্চা ছেলের কাছ থেকে আসা এটা একটা সুন্দর প্রশ্ন। জীবন কী? যদি কোনো ব্যবসায়ীকে এই একই প্রশ্ন করা হয়, তিনি নির্দ্বিধায় বলবেন জীবন হলো জিনিস বেচা, টাকা রোজগার করা— কারণ, দিনের শুরু থেকে রাত্রি অবধি সেটাই তাঁর জীবন। একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ বলবেন জীবন হলো কোথাও পৌঁছোনোর

জন্য, কিছু পাওয়ার জন্য একটা সংগ্রাম। কোনো ব্যক্তি যিনি ক্ষমতা এবং পদমর্যাদা অর্জন করেছেন বা যিনি কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো দেশের শীর্ষস্থানে আছেন, তাঁর জীবন তাঁর নিজের তৈরী কর্মে পূর্ণ। একজন শ্রমিকের কাছে, অবশ্য এদেশের হলে তো কথাই নেই, জীবন হলো অবকাশ ছাড়া অন্তহীন কাজ করে যাওয়া; ক্লেদের মধ্যে ক্লেশের মধ্যে খিদের জ্বালা নিয়ে বেঁচে থাকা।

এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, এই সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে, এই অনাহার আর দুর্গতির মধ্যে দিয়ে কি মানুষ সুখী হতে পারে? অবশ্যই পারে না। তাহলে সে কী করে? কোনো প্রশ্নই সে তোলে না, কোনোসময় জিজ্ঞাসা করে না 'জীবন কী'। সে সুখ সম্পর্কে বিভিন্ন দর্শন তৈরী করে। একদিকে যখন সে অন্যকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে, অন্যদিকে তখন সৌভ্রাতৃত্বের চকচকে বুলি আওড়ায়। সে কোনো মহত্তম সত্তার অথবা পরমাত্মার উদ্ভাবন করে, তার আশা সেই মহত্তম সত্তাই একদিন তাকে অক্ষয় আনন্দ উপহার দেবে। কিন্তু খুঁজলে আনন্দ কোনোদিনই আসে না, এটা একটা উপজাত কিছু। সত্তায় যখন করুণা থাকে, প্রেম থাকে, কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে না, মন কেবল নিঃশব্দে সত্যকে খুঁজে চলে, তখনই আনন্দ আসে অনাহুতের মতো।

প্রশ্নকারী ঃ *আমরা কেন নিজেদের মধ্যে লড়াই করি?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ আমার মনে হয় বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও এই একই প্রশ্ন করেন, নয় কি? আমরা লড়াই করি কেন? আমেরিকা রাশিয়ার বিরুদ্ধে, চীন পশ্চিমের বিরুদ্ধে। আমরা মুখেতো শান্তির বানী প্রচার করি, আর পিছনে যুদ্ধের আয়োজন করি। কেন? আমার মনে হয় বাস্তব সত্যটা হলো অধিকাংশ মানুষই আমরা প্রতিযোগিতা ভালোবাসি, যুদ্ধ ভালোবাসি, না হলে তো আমরা এইসব বন্ধ করতাম। যুদ্ধে আবার বেঁচে থাকবার তীব্র অনুভূতি লাভ করা যায়, এটাও একটা

বাস্তব সত্য। আমাদের বিশ্বাস, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্য সবরকমের সংগ্রামই আবশ্যক। কিন্তু বেঁচে থাকবার এই পথ নাশকতা নিয়ে আসে। সংগ্রাম-সংঘর্ষ ছাড়াও বেঁচে থাকবার পথ রয়েছে। এটা একটা পদ্মের সহজ প্রাণের প্রবর্তনায় ফুটে ওঠার মতো— কোনো সংগ্রাম নেই, এ কেবল রয়। কোনো কিছুর শুদ্ধ বিরাজমানতাতেই তার সৌন্দর্য, তার মাধুর্য। কিন্তু আমাদের এভাবে শিক্ষিত করে তোলা হয় না। আমাদের প্রতিযোগিতার জন্য, লড়াইয়ের জন্য তৈরী করা হয়; আমাদের সৈনিক, উকিল, পুলিশ, অধ্যাপক, প্রিন্সিপাল, ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য তৈরী করা হয়; আর সকলেই সকলকে হারিয়ে উপরে উঠতে চায়। সাফল্যের তৃষ্ণা আমাদের প্রত্যেকের। অনেকের মধ্যে একটা বাহ্যিক নম্রতার ভান আছে, কিন্তু যাঁরা সত্যিই আন্তরিকভাবে নম্র, তাঁরাই সুখী এবং একমাত্র তাঁরাই কখনো লড়াই করে না।

প্রশ্নকারী ঃ *মন কেন অন্যকে এবং নিজেকেও ভুলভাবে ব্যবহার করে?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ এই ভুলভাবে ব্যবহার করার অর্থ কী? একটা লোভী উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ঈর্ষান্বিত মন অথবা পরম্পরা ও বিশ্বাসের বোঝায় ভারী মন, একটা নিষ্ঠুর মন বা অন্যকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে এরকম মন, উপদ্রব বা উৎপাত করবেই এবং এইরকম মন যে সমাজই নির্মাণ করুক না কেন— তাতে সংঘর্ষই হবে প্রতি মুহূর্তের বাস্তব। মন নিজেকে উপলব্ধি না করলে তার সব ক্রিয়াই হবে ধ্বংসমূলক, আত্মবোধ না থাকলে মন শত্রুতার জন্ম দিয়ে চলবে। সেইজন্যই শুধু বইপত্র থেকে কিছু শিখলেই হবে না, নিজেকে জানা হলো অতি প্রয়োজনীয়। কোনো বই এই আত্মবোধ তোমাদের দিতে পারবে না। একটা বই আত্মবোধ সম্পর্কিত কয়েকটা তথ্য

তোমাদের সামনে তুলে ধরতে পারে। কিন্তু নিজে ক্রিয়ারত অবস্থায় নিজেকে জানা হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। মন যখন তার সাথে অন্য সব কিছুর সম্পর্কের আয়নায় নিজেকে দেখে, সেই নিরীক্ষণ থেকেই আত্মবোধ আসে। সেই উপলব্ধি ছাড়া— আমরা জীবনে যে জটিল জট পাকিয়েছি, তা খুলতে পারবো না এবং পৃথিবীতে আজ যে ভীষণ দুর্দশা, তারও শেষ করতে পারবো না।

প্রশ্নকারী ঃ *যে মন সাফল্য খোঁজে, আর যে মন সত্যকে খোঁজে তারা কি আলাদা ?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ মন সত্যই খুঁজুক আর সফলতাই খুঁজুক সে একই। কিন্তু মন যতক্ষণ সাফল্য খোঁজে, সে সত্যকে পায় না। সত্যকে উপলব্ধির অর্থ হলো মিথ্যা বস্তুর অন্তর্গত সত্যটাকে দেখা এবং সত্যকে সত্য রূপেই দেখা অর্থাৎ যেটা ঠিক যা তাকে সেইভাবেই দেখা।

২৫

সংগ্রামহীন জীবন

কোনোদিন একথা কি ভেবেছো কেন মানুষের যতো বয়স হতে থাকে ততই সে তার জীবনের সকল আনন্দ হারাতে থাকে? এখন তোমরা যারা ছোটো তারা বেশ সুখী; কিছু ছোটোখাটো সমস্যা আছে, পরীক্ষার চিন্তা আছে, কিন্তু এইসব বাদ দিয়েও তোমাদের জীবনে সেই আনন্দের উচ্ছলতা আছে, তাই তো? তোমাদের মধ্যে সহজতার সাথে, সরলতার সাথে জীবনকে গ্রহণ করা আছে, হালকাভাবে সুখী মনোভাব নিয়ে সব কিছুকে দেখা আছে। কিন্তু যতো আমাদের বয়স হয় ততই আমরা সব কিছুর ওপার থেকে আসা যে অকথিত আনন্দের বাণী তার অতলস্পর্শী অর্থকেই হারাতে থাকি। আমাদের মধ্যে অধিকাংশই যখন তথাকথিত পরিণতি লাভ করি তখন আনন্দের সাথে, সীমাহারা আকাশের সাথে, অপরূপ পৃথিবীর সাথে, সৌন্দর্যের সাথে কেন আমাদের সংযোগ ছিন্ন হয়, কেনই-বা তাদের প্রতি আমরা উদাসীন হয়ে উঠি?

যখন কেউ নিজেকে এই প্রশ্নগুলো করে, মনের মধ্যে অনেক উত্তর, অনেক ব্যাখ্যা ভিড় জমায়। আমরা আমাদের নিয়েই ব্যস্ত, আমরা আত্মকেন্দ্রিক, এটা হলো একটা ব্যাখ্যা। আমরা বিশিষ্ট কেউ একজন হওয়ার চেষ্টা করি, কিছু অর্জন করার চেষ্টা করি, আমাদের যে প্রতিষ্ঠা তাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করি। আমাদের সন্তান-সন্ততি

থাকে, অন্যান্য দায়িত্ব থাকে, আমাদের উপার্জন করতে হয়। এই বাহিরের সব কিছুই একদিন আমাদের উপর চেপে বসে, আমাদের ভারী করে তোলে আর আমরা বেঁচে থাকবার আনন্দকেই হারিয়ে ফেলি। চারিদিকে বয়স্ক লোকেদের মুখের দিকে একবার তারিয়ে দেখো— এক নৈরাশ্যের ছায়া, দুশ্চিন্তার রেখা, হয়তো-বা রুগ্নতাও দেখতে পাবে। দেখবে কেমন বীতস্পৃহ, কেমন নির্লিপ্ত ভাব; মাঝে মাঝে আবার তাঁরা চরম বিরক্তিপূর্ণ উদ্ভট আচরণ করে বসেন। কোনোদিন কি নিজেকে জিজ্ঞাসা করোনি কেন এমন হয়? অথবা যদি-বা কেউ জিজ্ঞাসা করে, কতোগুলো নিরর্থক ব্যাখ্যাতেই সে সন্তুষ্ট হয়ে যায়।

কাল সন্ধ্যায় নদীতে এক বিরাট পালতোলা নৌকা দেখলাম। পাল ফুলে উঠছে পশ্চিমের বাতাসে। সে টানেই নৌকো চলছে ভেসে। শহরের জন্য জ্বালানী কাঠে ভর্তি এক বিরাট নৌকা। সূর্য ডুবছিল, আর তার সাথে বিরাট আকাশের নীচে বয়ে যাওয়া নৌকা মিলে এক অনন্য রূপ সৃষ্টি করল। মাঝি চুপচাপ হাল ধরে বসে, সে নৌকোকে শুধু পথ দেখাচ্ছিল, সেখানে আর কোনো চেষ্টা কোনো তৎপরতা ছিল না। বাকী সব কাজ উদ্দাম হাওয়ার। অন্যভাবে বলা যায় যদি আমরা সংগ্রাম ও সংঘর্ষের সমস্যাকে বুঝতে পারি, উপলব্ধি করতে পারি, তাহলে হয়তো সুখে, হাসিমুখে ঐভাবেই সংগ্রামহীন বাঁচা বাঁচতে পারবো।

আমার মনে হয় এই প্রচেষ্টাই আমাদের নষ্ট করে। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তকে যেন আমরা সংগ্রাম করতে করতেই খরচা করে ফেলি। যদি তোমাদের চারপাশের বয়স্ক লোকেদের লক্ষ্য করো, দেখবে তাঁদের জীবনটা যেন সংঘর্ষ দিয়ে তৈরী এক বিরাট শৃঙ্খল। কখনো নিজের সাথে, কখনও স্বামীর সাথে, কখনও স্ত্রীর সাথে, কখনও প্রতিবেশীর সাথে বা সমাজের সাথে এই সংঘর্ষ

চলছেই। এই বিরামহীন সংঘর্ষেই শক্তি ক্ষয় হয়। কিন্তু একজন আনন্দিত মানুষ যিনি সত্যকার সুখী, তিনি কিন্তু এই প্রচেষ্টার জালে আটকা পড়েন না। প্রচেষ্টাহীন মানে কিন্তু— সক্রিয়তার সমাপ্তি, নিস্পৃহ বা নির্জীব নিশ্চেতনা নয়। বরং যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাবান, যাঁর মধ্যে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা রয়েছে, তিনিই একমাত্র এই প্রচেষ্টা বা সংঘর্ষ থেকে মুক্ত।

এবারে দেখো, যেই মুহূর্তে আমরা 'চেষ্টাশূন্য'ভাবে বাঁচা যায় শুনলাম সেই মুহূর্তেই আমরা যে অবস্থায় কোনো প্রচেষ্টা নেই, কোনো দ্বন্দ্ব নেই— তেমন অবস্থাকে চাইতে শুরু করলাম, সেটাকে আমাদের একটা উদ্দেশ্য, একটা আদর্শে পরিণত করলাম, এবং তারজন্য চেষ্টা করতে শুরু করে দিলাম। যেই মুহূর্তে আমরা এগুলো করি, সেই মুহূর্তেই আমরা বাঁচার আনন্দকেই হারিয়ে ফেলি। যেটা পাওয়ার জন্য আমাদের এই সংঘর্ষ, প্রচেষ্টা— সেই জিনিসটা পৃথক পৃথক হতে পারে, সংঘর্ষ কিন্তু থেকেই গেলো। সকল সংঘর্ষই আসলে এক। কেউ— সামাজিক সংস্কারসাধনের জন্য, ঈশ্বরকে খোঁজার জন্য, নিজের সাথে তার স্বামীর বা স্ত্রীর বা প্রতিবেশীর সম্পর্ক ভালো করার জন্য অথবা গঙ্গা তীরে বসে কোনো গুরুকে পূজা করার জন্য তথা এমন বহু কিছুর জন্যই সংগ্রাম বা চেষ্টা চালাতে পারেন। ওগুলো সবই সেই কিছু পাওয়ার জন্য, কিছু হওয়ার জন্য সংগ্রাম করা, চেষ্টা করা। সুতরাং 'কী' পাওয়ার উদ্দেশ্যে— এই সংগ্রাম বলো, সংঘর্ষ বলো বা চেষ্টাই বলো সেটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং সংগ্রাম জিনিসটা আসলে কী সেটা বোঝাটা হলো জরুরী।

এবার দেখা যাক, আমাদের মনের পক্ষে কি এটা সম্ভব যে, আকস্মিকভাবে কিছু সময়ের জন্য নয়, বরং সবসময়ের জন্য, সম্পূর্ণরূপে এই সংগ্রাম থেকে, এই চেষ্টা থেকে সে মুক্ত হতে পারে এবং এর ফলে সে এমন এক আনন্দময় অবস্থার আবিষ্কার করতে পারে— যেখানে উচ্চতর বা নিম্নতর বলে কোনো বোধ থাকে না?

আসলে আমাদের অসুবিধা হলো মন একটা হীনতাবোধ অনুভব করে (একে হীনমন্যতা বলা যেতে পারে)। তাই সে সবসময় অন্য কিছু একটা হয়ে ওঠার চেষ্টা করতেই থাকে অথবা নিজের পরস্পরবিরোধী ইচ্ছাগুলোর মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করে। কেন আমাদের মনে সবসময় এই সংগ্রাম চলছেই এই মুহূর্তে তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক বিচারশীল ব্যক্তিই জানেন কেন তার নিজের অন্তরে এবং বাহিরে সবসময় এই সংঘর্ষ চলছে। আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আমাদের লোভ, আমাদের ঈর্ষা, আমাদের প্রতিযোগিতার মনোভাব— নিষ্ঠুর নিপুণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়— এইগুলোই আমাদের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে বাধ্য করে। সুতরাং আমরা কেন সংগ্রাম করি, তা জানার জন্য আমাদের কোনো মনোবিজ্ঞানের বই পড়ার দরকার নেই। মন সম্পূর্ণরূপে এই সংগ্রাম থেকে মুক্ত হতে পারে কি না সেটার খোঁজ করাই মুখ্য ব্যাপার।

আসলে আমরা যে সংঘর্ষটা করি সেটা হলো আমরা যা এবং আমাদের যা হওয়া উচিত বা আমরা যা হতে চাই তার মধ্যের সংঘর্ষ। এখন প্রশ্ন— এইসব ব্যাখ্যার পথে না গিয়ে মনের পক্ষে এই সংঘর্ষের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে কি উপলব্ধি করা সম্ভব যাতে এই সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটে? যে নৌকাটা হাওয়ার সাথে ভেসে যাচ্ছিল, তেমনই সংঘর্ষহীন কি আমাদের মন হতে পারে? এটা একটা প্রশ্ন। ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয় কীভাবে সংগ্রামহীন অবস্থায় আমাদের উত্তরণ ঘটবে। এমন অবস্থায় উন্নীত হওয়ার প্রচেষ্টাই তো একটা সংগ্রাম, তাই ওভাবে কখনই ঐ অবস্থায় পৌঁছোনো সম্ভব নয়। মন কীভাবে বিরামহীন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তাকে যদি প্রতি মুহূর্তে লক্ষ্য করো— অবশ্যই এখানে আর একটা ব্যাপার হলো একে কেবল পর্যবেক্ষণ করতে হবে, একে পরিবর্তন করার কোনো চেষ্টা করলে হবে না এবং মনের উপর এক বিশেষ অবস্থা— যার নাম তোমরা

শান্তি দিয়েছো, তাকেও চাপিয়ে দিলে হবে না, তখন দেখবে মন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সংঘর্ষ করা বন্ধ করে; এমন অবস্থায় মন প্রচুর শিখতে পারে। শেখা সেই সময় কেবল কতকগুলো তথ্য সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তখন মনের সীমানার বাহিরে যে বিরাট ঐশ্বর্য রয়েছে, তার আবিষ্কার চলতে থাকে। যে মন এ আবিষ্কার করে সে আনন্দের সাহচর্য লাভ করে।

নিজেদের লক্ষ্য করো, সকাল থেকে রাত্রি অবধি মন কেন সংগ্রাম করছে, কেমনভাবে এই সংগ্রামে শক্তির ক্ষয় হচ্ছে। কেন এই সংগ্রাম— যদি তারই ব্যাখ্যা নিয়ে পড়ে থাকো তাহলে ঐ ব্যাখ্যাতেই নিজের পথ হারাবে আর সংগ্রামও যেমন চলছিল তেমনই চলতে থাকবে। কিন্তু যদি তুমি ব্যাখ্যাগুলোকে পাশে সরিয়ে রেখে মনকে শান্তভাবে নিরীক্ষণ করো, যদি মনকে নিজেকেই নিজের সংগ্রাম সম্পর্কে অবহিত হতে দাও বা সচেতন হতে দাও শীঘ্রই লক্ষ্য করবে এমন এক অবস্থা আসছে, সেখানে কোনো সংগ্রাম নেই, কিন্তু এক অদ্ভুত সজাগতা রয়েছে। সেই সজাগতায়— উচ্চতর বা নিম্নতর, কোনো বড়ো লোক বা নগণ্য লোক, কোনো গুরু কিছুরই অস্তিত্ব নেই। ঐসব মূর্খামি, উদ্ভট ব্যাপার-স্যাপার সব কিছু কোথায় তালিয়ে গেছে, কারণ মন তখন সজাগ। যে মন সম্পূর্ণরূপে সজাগ, সেই আনন্দময়।

প্রশ্নকারী ঃ *আমি কিছু কাজ করতে চাই। কিন্তু অনেকবার চেষ্টা করেও তাতে সফল হইনি। এখন কি ঐ চেষ্টাটা ছেড়ে দেবো, নাকি চালিয়ে যাবো?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ সফল হওয়া মানে কোথাও পৌঁছোনো, কিছু অর্জন করা এবং আমরা সফলতার আরাধনা করি, তাই তো? কোনো দরিদ্র ছেলে যখন বড়ো হয়ে কোটিপতি হলো বা অতি সাধারণ কোনো ছাত্র প্রধানমন্ত্রী হলো, তখন তাকে বাহবা দেওয়া হয়, তার গুণগান করা

হয়; এইজন্যই প্রত্যেক ছেলে বা মেয়ে কোনো-না-কোনো উপায়ে সফল হতে চায়।

এখন দেখা যাক সফলতা বলে আদৌ কি কিছু আছে, নাকি এটা একটা ধারণা বা আদর্শ যেটার পিছনে মানুষ ধাওয়া করে। যেখানে পৌঁছোতে চাইছো, সেখানে পৌঁছোবার সাথে সাথেই সামনে আর একটা কিছু এসে পড়ে, যেখানে এখনো তোমাকে পৌঁছোতে হবে। আর যতক্ষণ এই সাফল্যের পিছনে ধাওয়া করা থাকবে, ততক্ষণ সংগ্রাম ও সংঘর্ষও থাকবে, তাই তো? যা চেয়েছো সেটা পেলেও বিরাম নেই, কারণ তুমি আরো একটু উঁচুতে যেতে চাও, আরো একটু বেশী কিছু পেতে চাও। বুঝতে পারছো? সাফল্যের পিছনে দৌড়োনো আসলে 'আরো' পাওয়ার একটা ইচ্ছে। যে মন অবিরাম 'আরো' চেয়েই চলেছে, সে মন কোনো বুদ্ধিমান মন নয়; অপরপক্ষে সে মন একটা অতি সাধারণ স্থূল মন, তার কারণ এই 'আরো' চাওয়ার অর্থ নিরন্তর সংগ্রাম করে যাওয়া, আর এই সংগ্রামের ছাঁচ বা নকশাগুলোও আসলে সমাজেরই ঠিক করে দেওয়া।

সর্বোপরি সন্তুষ্টি-বা কী, অসন্তুষ্টিই-বা কী? অসন্তুষ্টি বা অতৃপ্তি হলো 'আরো' পাওয়ার জন্য সংগ্রাম, আর সন্তুষ্টি হলো সেই সংগ্রামের সমাপ্তি। কিন্তু যদি এই 'আরো'র এবং কেন মন এটাকে চায়, তার পুরো প্রক্রিয়াটাকে উপলব্ধি না করো তাহলে কোনোদিন সেই সন্তোষ আসবে না।

ধরো পরীক্ষায় অসফল হলে, তখন তুমি আবার পরীক্ষা দেবে, তাই তো? যেকোনোভাবেই হোক পরীক্ষা ব্যাপারটাই একটা চরম দুর্ভাগ্যজনক জিনিস, এটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে প্রকাশ করে না, তোমাদের মেধার সত্যমূল্যও প্রকাশ করে না। বহুলাংশে পরীক্ষায় সফল হওয়া স্মৃতিশক্তির চতুরতার একটা খেলা বলতে পারো; কোনো কোনো সময় এটা ভাগ্যের উপরও নির্ভরশীল। কিন্তু তোমরা পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করো এবং অসফল হলে বারবার চেষ্টা করো। আমাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক জীবনেও ব্যাপারটা একইরকমের। আমরা কোনো একটা কিছু পাওয়ার জন্য অনবরত সংগ্রাম করেই চলেছি, কিন্তু আমরা একবার থেমে খুঁজে দেখি না—যার জন্য এতো দৌড়-ঝাঁপ করছি, সেই জিনিসটার আদৌ কোনো মূল্য আছে কি না। আমরা সেইসব জিজ্ঞাসাও করি না, আমরা সেটা আবিষ্কারও করি না; আমরা কেবল আমাদের বাবা-মা আমাদের সমাজ, গুরুরা যে যে কথা বলেছেন সেইটাকে সঠিক বলে মেনে নিয়ে বসে থাকি। যখন এই 'আরো' ব্যাপারটার সম্পূর্ণ অর্থটা ভালো করে বুঝতে পারবো, তখন আমাদের জীবন থেকে সফলতা বিফলতার চিন্তাগুলোই চলে যাবে।

দেখবে আমরা কেবল পরীক্ষায়ই নয়, জীবনেও অসফল হতে, ভুল করতে ভয় পাই। এখানে ভুল করাটা একটা চরম ব্যাপার, কারণ লোকে আমাদের নিয়ে আলোচনা করবে, আমাদের তিরস্কৃত হতে হবে। কিন্তু ভুল করবে না কেন? পৃথিবীর অন্যান্য লোকেরাও কি ভুল করছে না? যদি তোমরা ভুল না করো তাহলে পৃথিবী কি এই ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে? যদি ভুল করতে ভয় পাও তাহলে কোনোদিনই শিখবে না। বয়স্ক ব্যক্তিরা অনবরত ভুল করেই চলেছেন, কিন্তু তাঁরা চান না তোমরা কোনো ভুল করো, সেইজন্য তোমাদের সহজ উদ্দীপনাকে তাঁরা নষ্ট করে দেন। আসলে তাঁরা ভীত, কারণ ভুল করার, প্রশ্ন করার, লক্ষ্য করার, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মধ্যে দিয়ে তোমরা হয়তো এমন কিছুর সন্ধান পেলে যাতে—তাঁদের, সমাজের, অতীতের ঐতিহ্যের প্রভাবকে, তাঁদের কর্তৃত্বকেই তোমরা অস্বীকার করলে। তাই তোমাদের সামনে অনুসরণের জন্য সাফল্যের আদর্শটাকে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং লক্ষ্য করবে এর সাথে সম্মান ব্যাপারটাকে জড়িয়ে রাখা হয়।

সুতরাং, আমরা সফলতা, 'আরো' চাই— এই পথেই চিন্তা করি এবং বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত সমাজ এই 'আরো'র মূল্যায়ন করে। অন্যভাবে বলতে গেলে, সমাজ খুব সচেতনভাবেই সাফল্যের কতোগুলো মাপকাঠি ঠিক করে রেখেছে, সেই অনুযায়ী সে তোমার সফলতা অসফলতা নির্ণয় করে। কিন্তু কোনো কিছুর সাথে যদি তোমার নিবিড় সংযোগ থাকে, সমস্ত সত্তা দিয়ে যদি সেটা করতে ভালোবাসো, তাহলে তোমার কাছে সফলতা বিফলতার কোনো অর্থ থাকে না। কোনো বুদ্ধিমান মানুষই সফলতা বিফলতার ব্যাপারে উৎসাহী নন। কিন্তু এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। তোমাদের সাথেও এইসব বিষয় নিয়ে কেউ আলোচনা করে না। বুদ্ধিমান মানুষ কোনো জিনিসের বাস্তব সত্যটা দেখতে চায়, সমস্যাটাকে বুঝতে চায়— তারা কোনোদিন সফলতা-অসফলতার দৃষ্টি দিয়ে কোনো কিছুকে দেখে না। যখন আমরা যেটা করছি, তা না ভালোবেসে করি, তখনই আমাদের ঐভাবে দেখা শুরু হয়।

প্রশ্নকারী ঃ *মৌলিকভাবেই কেন আমরা স্বার্থান্বেষী? আচার-ব্যবহারে আমরা নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা করি, কিন্তু যে মুহূর্তে আমাদের নিজেদের স্বার্থ এসে আমাদের সামনে দাঁড়ায় আমরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠি, অন্যের প্রয়োজন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে উঠি।*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ আমার মনে হয় সর্বপ্রথম যেটা জরুরী তা হলো নিজেকে স্বার্থান্বেষী বা নিঃস্বার্থ বলার প্রয়োজন নেই, কারণ মনের উপর শব্দের প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে। আপনি কাউকে 'স্বার্থান্বেষী' বলুন, সে সঙ্গে সঙ্গে ম্রিয়মাণ হয়ে যায়; তাঁকে একজন 'অধ্যাপক' বলুন, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর প্রতি পরিবর্তন হয়ে যাবে; তাঁকে 'মহাত্মা' বলুন, দেখবেন তাঁর চারদিকে একটা দীপ্তি দেখতে পাবেন। 'উকিল', 'ব্যবসায়ী' 'রাজ্যপাল', 'চাকর', 'প্রেম', 'ঈশ্বর'— এই শব্দগুলোর প্রতি নিজের

প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করুন, দেখবেন আপনার স্নায়ুর উপর, আপনার মনের উপর এইসব শব্দের এক অদ্ভুত প্রভাব রয়েছে। শব্দগুলো কিছু ক্রিয়া সম্পর্কে বলে, আবার পদমর্যাদার একটা অনুভূতিও নিয়ে আসে; তাই প্রথম কাজ হলো বিশেষ শব্দের সাথে নিজের বিশেষ অনুভূতি, ভাবনা জুড়ে দেওয়ার যে অচেতন অভ্যাস তা থেকে মুক্ত হতে হবে। স্বার্থান্বেষী শব্দটা কোনো কিছু মন্দ, যা একেবারে আধ্যাত্মিক নয়, এমন কিছু প্রকাশ করে— মন এভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত। সেইজন্য যে মুহূর্তে কারোর সম্পর্কে বা কোনো কিছু সম্পর্কে আপনি শব্দটা ব্যবহার করেন, সেই মুহূর্তে যার সম্পর্কে এটা ব্যবহার করলেন, মন তাকে দোষারোপ করলো। তাই যে মুহূর্তে আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন আমরা মূলত স্বার্থান্বেষী' তখন কিন্তু এক নিন্দার ভাবনা চলেই এলো।

একটা ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে, বিশেষ শব্দ আমাদের মধ্যে ভালো বা মন্দের তথা স্বীকৃতি বা নিন্দার এক স্নায়বিক, ভাবগত বা বৌদ্ধিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ধরুন, যখনই আপনি নিজেকে একজন ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি বলেন, তৎক্ষণাৎ আপনি খোঁজের পথে আর এগোচ্ছেন না, আপনি ঈর্ষার সমগ্র প্রক্রিয়াটির গভীরে যাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছেন। একইভাবে কিছু লোক আছেন যাঁরা বলেন সৌভ্রাতৃত্বের জন্য তাঁরা কাজ করছেন, কিন্তু তাঁদের প্রতিটা কাজই এর সম্পূর্ণ বিরোধী। অথচ তাঁরা এটা দেখতে পান না, কারণ তাঁরা ভ্রাতৃত্ব শব্দটার একটা বিশেষ অর্থ মেনে বসে আছেন, শব্দটা দ্বারাই তাঁরা প্রভাবিত। তাঁরা তার থেকে বেশী ভিতরে আর যান না, তাই এ শব্দটা যে স্নায়বিক বা আবেগমথিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সেইসব ছাড়া, এর বাস্তব সত্যতাকে, এর অন্তর্গত সত্যটাকে কোনোদিন খুঁজে পান না।

সুতরাং প্রথম কথা হলো শব্দের সাথে সংযুক্ত প্রশংসা বা নিন্দার

ভাবনা ছাড়া বা অনুভূতি ছাড়া আমরা কোনো কিছুর বাস্তবিকতাকে দেখবো, তাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবো। নিন্দা বা প্রশংসার ভাবনা ছাড়াই আপনারা যদি কোনো কিছুর বাস্তবতাটাকে দেখতে পারেন, তাহলে দেখবেন এই পর্যবেক্ষণের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই মন নিজের এবং সত্যের মাঝখানে যে দেওয়ালগুলো তুলে রেখেছিল, তারা ভেঙ্গে পড়ছে।

লক্ষ্য করুন, যাঁকে লোকে মহান ব্যক্তি বলে তাঁর সাথে কীভাবে মিলিত হন। 'মহান ব্যক্তি' কথাটাই আপনাকে প্রভাবিত করে। সংবাদপত্র, কিছু বই, তাঁর অনুগামীরা সবাই বলে তিনি মহান এবং আপনার মনও তা মেনে নেয় অথবা আপনি হয়তো ঠিক উল্টো দৃষ্টিভঙ্গিটা নেন এবং বলেন 'কী বোকা উনি, আদৌ মহান নন'। কিন্তু যদি এই প্রভাবগুলো থেকে মনকে মুক্ত করে সরলভাবে পুরোটার বাস্তবতাকে দেখেন, তখন ঐ ব্যক্তির সাথে মেলাটাই সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে যাবে। ঠিক একইভাবে 'গ্রামবাসী' শব্দটার সাথে জড়িয়ে থাকা দারিদ্র, নোংরা, বিবর্ণতা অথবা আর যা যা রয়েছে সেইসব ভাবনা আপনার চিন্তাকে প্রভাবিত করে। কিন্তু মন যখন এইসব প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যায়, যখন সে ভালো বা মন্দ বলে না, কেবল দেখে, পর্যবেক্ষণ করে, তখন সে আর নিজেতেই নিজে মগ্ন থাকে না, তখন স্বার্থান্বেষী কোনো মানুষ নিঃস্বার্থ হওয়ার চেষ্টা করছে, এমন কোনো ব্যাপারও থাকে না।

প্রশ্নকারী : *কেন মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ভালোবাসা পেতে চায়, এবং যদি সে না পায় অন্যান্যদের মতো সে একজন বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রত্যয়পূর্ণ মানুষ হয় না?*

কৃষ্ণমূর্তি : তোমার কি মনে হয় অন্যেরা সব প্রত্যয়ে পূর্ণ? তাঁদের চালচলন আত্মম্ভরি হতে পারে, তাঁদের হাবভাবও তেমনই হতে পারে,

কিন্তু আত্মপ্রত্যেয়ের যে প্রদর্শন তাঁরা করেন, তার পিছনেই থাকে এক বন্ধ্যা শূন্যতা, মূঢ়তা, অতি সাধারণ মানসিকতা। কোনো সত্যকার প্রত্যেয়ের কোনো অস্তিত্বই সেখানে থাকে না। এখন প্রশ্ন কেন আমরা ভালোবাসা পেতে চাই? তুমি কি তোমার বাবা, মা, শিক্ষক বা বন্ধুবান্ধবদের থেকে ভালোবাসা পেতে চাও না? যদি বয়স্ক লোক হন তবে তাঁরা তাঁদের স্ত্রীর থেকে, স্বামীর থেকে, সন্তান-সন্ততির থেকে, তাঁর পথপ্রদর্শক গুরুর কাছ থেকে ভালোবাসা পেতে চান। কেন আমাদের মধ্যে সবসময় ভালোবাসা পাওয়ার জন্য এমন তৃষ্ণা দেখা যায়? ভালো করে দেখো। তুমি ভালোবাসা চাও কারণ তুমি ভালোবাসো না, যে মুহূর্তে তুমি ভালোবাসো কেউ তোমাকে ভালোবাসলো বা ভালোবাসলো না— সেদিকে তুমি ফিরেও তাকাও না। যতক্ষণ তুমি অন্যের কাছ থেকে ভালোবাসা চাইছো, তার অর্থ তোমার মধ্যে ভালোবাসা নেই। যদি তুমি তোমার সত্তায় ভালোবাসাই অনুভব না করো, তুমি একজন শ্রীহীন নিষ্ঠুর মানুষ। তখন কেন অন্যে তোমায় ভালোবাসবে? যখন তোমার মধ্যে ভালোবাসা স্পন্দিত হয় না তখন তুমি মৃত, তোমার চাহিদাটাও তাই মৃত। কিন্তু তোমার হৃদয় যদি ভালোবাসার ঐশ্বর্যে পূর্ণ থাকে, তুমি অন্যের সামনে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়াও না। আসলে একটা শূন্য হৃদয়ই খুঁজে বেড়ায় কী করে নিজেকে পূর্ণ করবে, আর গুরুদের পিছনে দৌঁড়ে অথবা আরো হাজার পথে ভালোবাসা খোঁজার মধ্যে দিয়ে কিন্তু সে শূন্য কলস কোনোদিন পূর্ণ হয় না।

প্রশ্নকারী ঃ *বয়স্ক লোকেরা চুরি করে কেন?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ তোমরাও কি কখনো কখনো চুরি করো না? এমন কি শোনোনি একটা বাচ্চা ছেলে যেটা চায় সেটা সে অন্য কারোর থেকে চুরি করছে? এটাই আমরা জীবনভর করতে থাকি। বয়স্ক লোকেরা

এটা চালাকির সাহায্যে করেন, তাঁরা অনেক ভালোভালো শব্দের মোড়কে এগুলো ঢাকা দিয়ে রাখেন। তাঁরা সম্পদ, ক্ষমতা, পদ— এইসব কিছু চান, তারজন্য মিথ্যার সাথে সহযোগিতা করেন, বিভিন্ন পরিকল্পনা করেন, শ্রুতিমধুর কোনো দর্শন খাড়া করেন। তাঁরা চুরি করেন, কিন্তু তাকে চুরি বলা হয় না। তারজন্য বেশ সম্মানজনক সব শব্দ ব্যবহার করা হয়। এখন প্রশ্ন আমরা চুরি করি কেন? প্রথমতঃ এই মুহূর্তে সামাজিক পরিকাঠামো যেরকম আছে তাতে অসংখ্য মানুষ বেঁচে থাকবার জন্য যে ন্যুনতম জিনিস সেগুলোই পান না। সমাজেরই একটা অংশ পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র, একটু আশ্রয়ই পান না। সুতরাং তাঁরা সেই সমস্যা মেটানোর জন্য কখনও কখনও চুরি করে থাকেন। কিছু আবার আছেন তাঁরা খাদ্য পর্যাপ্ত নেই বলে চুরি করেন এমন নয়, তাঁরা হলেন সমাজবিরোধী। তাঁদের কাছে চুরিটা একটা খেলা, একটা উত্তেজনা, যার অর্থ তাঁদের সঠিক শিক্ষা নেই। সত্যকার শিক্ষা মানে কতকগুলো তথ্য মুখস্থ করে পরীক্ষার প্রাচীরটা পেরোলাম এমন নয়, এর অর্থ জীবনের তাৎপর্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা। উঁচু স্তরের চুরিও রয়েছে,অন্যের ধারণাগুলো বা জ্ঞান চুরি করা, যতক্ষণ আমরা 'আরো' চাওয়ার পিছনে দৌড়োবো ততক্ষণ আমরা চুরি করেই যাবো।

এখন প্রশ্ন হলো কেন আমরা সদাসর্বদা চাইছি, ভিক্ষাপাত্র এগিয়ে দিচ্ছি, চুরি করছি? কারণ আমাদের মধ্যে কিছুই নেই, অন্তরের দিক থেকে বা মানসিক দিক থেকে আমরা একটা খালি ড্রামের মতো। ভিতরটা খালি বলেই কিছু-না-কিছু দিয়ে আমরা তা পূরণ করতে চাইছি, তা কেবল চুরির মালেই নয়, অন্যদের অনুকরণের মধ্যে দিয়েও এই প্রক্রিয়া চলছে। তোতাবৃত্তিও একরকমের চুরি। তুমি নগণ্য, কিছু না, কিন্তু অন্যের মধ্যে কিছু একটা আছে, তিনি বিশেষ কেউ, তাঁকে অনুকরণের মধ্যে দিয়ে তুমি ওঁর গৌরবের

কিছু অংশ পেতে পারো। এই মিথ্যাচার সারা জীবন চলতে থাকে, সংখ্যায় খুব কম লোক আছেন যাঁরা এর থেকে মুক্ত। তাই যেটা অনুসন্ধান করা সবচেয়ে জরুরী, সেটা হলো— এই অন্তরের শূন্যতা কি আদৌ পূর্ণ করা যায়। যতক্ষণ মন কোনো কিছু দিয়ে এর রিক্ততাকে পূর্ণ করার চেষ্টা করে, ততক্ষণ এ শূন্যই থেকে যায়, ব্যর্থই থেকে যায়। কিন্তু যে মুহূর্তে মন এই শূন্যতাকে ভরার চেষ্টাকে বন্ধ করে, তখন শূন্যতার কোনো অস্তিত্বই আর থাকে না।

২৬

মনের অতীত যে বিরাট

তোমরা কি জানো মৌন হয়ে, সোজা, স্থিরতার সাথে বসা কী সুন্দর? কোনো একটা গাছ যাতে একটাও আর পাতা নেই, সব ঝরে গেছে— তার দিকে দেখাও যেমন দরকার, ওটাও তেমনই দরকার। পিছনে সকালের হালকা নীল আকাশ, তাতে এই রিক্ত শাখার সূক্ষ্ম সৌন্দর্যকে কোনোদিন দেখেছো? এই রিক্ত শাখা গাছের অন্তর্লীন সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে, অবশ্য বসন্ত, গ্রীষ্ম বা শরৎ যে ঋতুই বলো, সর্বদা গাছেদের এক অসাধারণ সৌন্দর্য রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর আসা যাওয়ার সাথে সাথে তাদের সৌন্দর্য পরিবর্তিত হয়। নিজের জীবনযাপনের পদ্ধতি, তার ধারা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করা যেমন প্রয়োজন, ঐসব কিছুকে লক্ষ্য করাও কিন্তু তেমনই প্রয়োজন।

আমরা রাশিয়ায় বা আমেরিকায় বা ভারতে যেখানেই থাকি না কেন আমরা কিন্তু মানুষ, এই কারণেই আমাদের কতকগুলো সাধারণ সমস্যা আছে। নিজেদের আলাদা করে হিন্দু বা আমেরিকান বা রাশিয়ান মনে করাটা আমার মনে হয় অবান্তর। অবশ্যই এই বিশ্ব— রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, জাতিগত এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিভক্ত। কিন্তু এই বিভাগগুলোর উপর জোর দিলে, ব্যাপারটা পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণার জন্ম দেয়। এই সময়ে আমেরিকা

হয়তো সমৃদ্ধ; যার মানে হলো তাদের অনেক যন্ত্রপাতি, অনেক রেডিও, অনেক টেলিভিশন আছে; এর সাথে খাদ্যের ব্যাপারে বলতে গেলে, তাদের অনেক উদ্বৃত্ত খাবার রয়েছে। অন্যদিকে এদেশে আছে অনাহার, নোংরা, প্রচুর জনসংখ্যা, বেকারত্ব। কিন্তু যে প্রান্তেই আমরা থাকি না কেন আমরা মানুষ, এবং আমরা আমাদের নিজস্ব মানবীয় সমস্যা তৈরী করেই চলি। এখন, যেটা বোঝা আমার মনে হয় সবচেয়ে জরুরী তাহলো শুধু শুধু নিজেদের হিন্দু, আমেরিকান বা ইংরেজ বা সাদা, খয়েরি, কালো, হলুদ চামড়ার মানুষ হিসাবে চিন্তা করে আমরা কিন্তু নিরর্থক নিজেদের মধ্যে কতকগুলো প্রাচীর তুলছি।

বর্তমানে মূল সমস্যাটা হলো সারা পৃথিবীতে আধুনিক শিক্ষা কতকগুলো যন্ত্রবিৎ গড়ে তুলছে মাত্র। কী করে জেট-প্লেন বানাতে হবে, ভালো রাস্তা, ভালো গাড়ি তৈরী করতে হবে, অত্যাধুনিক নিউক্লিয়ার সাবমেরিন সমুদ্রের গভীরে নিয়ে যেতে হবে— এইসবই আমরা শিখছি আর এতো সব যন্ত্রের জঙ্গলে আমরা এটাই ভুলে যাচ্ছি, আমরা হলাম মানুষ। আমরা মনের সামগ্রী দিয়ে হৃদয়টাকে পূর্ণ করে ফেলছি। আমেরিকাতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, আরো আরো বেশী মানুষকে প্রতিদিনের দীর্ঘ সময়ের পরিশ্রমের হাত থেকে মুক্ত করছে। এদেশেও একই জিনিস শুরু হয়েছে। এখন এটা একটা বিরাট সমস্যা, কী করে আমরা সেই সময়টাকে ব্যবহার করবো। বিরাট কারখানা, যেগুলো হাজার হাজার মানুষের কর্মস্থল, সেইসব কারখানা ভবিষ্যতে কিছু টেকনিশিয়ান দিয়ে চালিয়ে নেওয়া হবে, তখন যাঁরা ওখানে কাজ করেন তাঁদের কী হবে? এছাড়া তাঁদের হাতে তখন অনেক সময়ও থাকবে। যদি শিক্ষা এই সমস্যা এবং তার সাথে অন্যান্য মানবিক সমস্যাকে গুরুত্ব দিতে না শুরু করে, তাহলে জীবন কিন্তু অন্তঃসারশূন্য হয়ে যাবে।

এমনিই আমাদের জীবন খালি, নয় কি? হয়তো তোমাদের কলেজের ডিগ্রি থাকবে, হয়তো বিবাহ করবে, প্রতিষ্ঠিত হবে, কেউ হয়তো খুব চালাকচতুর হবে বা কারোর কাছে অনেক অনেক তথ্য থাকবে, কেউ সাম্প্রতিকতম বইগুলোর ব্যাপারে জানবে; কিন্তু যতক্ষণ হৃদয়টাকে মনের জিনিসে ভর্তি করবে, জীবনে এক অভাব এক শূন্যতা এক কদর্যতা থেকেই যাবে, আর এমন অন্ধকার অস্তিত্বের অর্থও খুবই কম। হৃদয় যখন মনের সকল বস্তুর স্পর্শ থেকে মুক্ত হয় তখনই জীবনে সৌন্দর্য ও অর্থ দেখা দেয়।

দেখছো তো এটা আমাদের সকলেরই সমস্যা। এটা কোনো কাল্পনিক সমস্যা, যাতে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই— এমন কিন্তু নয়। যদি মানুষ হিসাবে পৃথিবীর এবং তার সব কিছুর প্রতি কেমনভাবে খেয়াল রাখতে হবে না জানি, যদি কীভাবে আমাদের সন্তান-সন্ততিকে ভালোবাসতে হবে না জানি, যদি নিজেদের নিয়েই নিজেরা বা দেশের উন্নতি বা সফলতা নিয়েই ব্যস্ত থাকি, তাহলে আমরা কিন্তু পৃথিবীকে কুরূপ করে তুলবো; আর ঠিক এটাই আমরা এখন করে চলেছি। কোনো দেশ ধনী হতে পারে, কিন্তু যখন অন্য দেশ ক্ষুধার তাড়নে চিৎকার করছে তখন সেই ঐশ্বর্য হলো বিষ। আমরা সবাই মানুষ, এ পৃথিবীও আমাদের সকলের; স্নেহময় ভালোবাসায় এই পৃথিবী আমাদের সকলের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, আর আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করে দেবে।

সুতরাং শিক্ষা তোমাদের শুধুমাত্র কতকগুলো পরীক্ষার জন্যই তৈরী করে তুলবে না, তোমাদের জীবনের সম্পূর্ণ ব্যাপারটা, যার-মধ্যে— যৌন কামনা-বাসনা, জীবিকা অর্জন, হাসি, উদ্দীপনা, ঐকান্তিকতা, চিন্তার সুগভীরতা— এইসব কিছু রয়েছে, তাকে বুঝতেও সাহায্য করবে। আবার ঈশ্বরের খোঁজও একটা সমস্যা কারণ ওটাই আমাদের জীবনের ভিত্তি। সঠিক ভিত ছাড়া কোনো ইমারতই বেশী

সময়েই জন্য দাঁড়াতে পারে না। তেমনই ঈশ্বর বা সত্যকে খোঁজা না থাকলে, আমাদের সব চতুর আবিষ্কার এক অর্থহীন ব্যাপারে পরিণত হয়।

শিক্ষকরা যেন অবশ্যই তোমাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করেন, কারণ তোমাদের যখন ষাট বছর বয়স হবে তখন নয়, এখন এই ছোটো থেকে তোমাদের ঐসব বুঝতে হবে। ষাট বছরে কোনোদিন ঈশ্বরকে খুঁজে পাবে না, কারণ অধিকাংশ ব্যক্তিই ঐ বয়সে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। খুব ছোটো থেকেই এই খোঁজ শুরু করতে হবে, তাহলেই সঠিক বনিয়াদ গড়ে উঠবে। তখন মানুষের নিজের তৈরী সব ঝড়ঝঞ্ঝার মুখোমুখি হয়েও তোমাদের বাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকবে। তখন আনন্দের সাথে বাঁচতে পারবে; কারণ তখন শাড়ি-গয়না-গাড়ি-রেডিও, কে তোমাকে ভালোবাসলো, কে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করলো, এক কথায় সেই আনন্দ এইসব কোনো কিছুর উপরই নির্ভর করে না। তোমার ধনসম্পত্তি আছে বা পদমর্যাদা আছে বা জ্ঞান আছে অর্থাৎ কিছু আছে বলে তুমি আনন্দিত এমন নয়, তুমি আনন্দিত কারণ তোমার জীবন স্বয়ং অর্থময়। আর যখন প্রতি মুহূর্তে তুমি পরমকে খুঁজছো, তখনই সেই অর্থকে আবিষ্কার করবে। এই সত্য বা পরম সব কিছুতে বিরাজমান, একে খুঁজতে কোনো মন্দির, গীর্জা, মসজিদে যেতে হবে না বা কোনো আচার-অনুষ্ঠান করতে হবে না।

পরমকে খুঁজতে হলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এর উপর জমে থাকা যে ধুলো তাকে পরিষ্কার করতে জানতে হবে; আমার এ কথাটাকে বিশ্বাস করো, পরমকে খোঁজাই হলো সত্যকার শিক্ষা। যে কোনো একজন চালাকচতুর লোক কতকগুলো বইপত্র পড়ে কতগুলো তথ্য সংগ্রহ করে একটা পদ অর্জন করতে পারেন; নিজের প্রয়োজনে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যকে ব্যবহার করতে পারেন;

কিন্তু এটা মোটেই শিক্ষা নয়। কয়েকটা বিষয় পড়া শিক্ষার এক ক্ষুদ্র অংশ। কিন্তু দুঃখের বিষয় জীবনের এক বিরাট অংশের জন্য আমাদের কোনোপ্রকারেই প্রস্তুত করা হয় না। ফলে তাকে বোঝবার জন্য আমাদের কাছে কোনো সঠিক পথ থাকে না।

কী করে জীবনের মুখোমুখি হবো, যাতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন, আমাদের রেডিও, গাড়ি, উড়োজাহাজ অর্থাৎ এসবের অর্থময়তা এমন একটা কিছুর সাথে যুক্ত হয়, যা এদের গ্রহণ করে, যার মধ্যে এইসব কিছু সমাবিষ্ট কিন্তু যা অব্যর্থভাবেই এইসব কিছুর অতীত— সেই খোঁজই হলো শিক্ষা, অন্যভাবে বলা যায় শিক্ষা ধর্মের সাথে শুরু হওয়া উচিত। কিন্তু পুরোহিত, চার্চ বা কোনো মতবাদ, কোনো ধরণের বিশ্বাসের (হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ) সাথে সেই ধর্মের কোনো সংস্রব নেই। ধর্ম হলো ভিতরে কোনো রকমের উদ্দেশ্য না রেখে ভালোবাসা, উদার হওয়া, করুণাময় হওয়া; আর তখনই-তো আমরা আসল মানুষ হবো। কিন্তু পরমের অন্বেষণ না করলে তো এ উদারতা, এ করুণা, এ প্রেম জীবনে ফলবান হয় না।

দুঃখের বিষয় জীবনের সেই সম্পূর্ণ বিশাল ক্ষেত্রই তথাকথিত শিক্ষা দ্বারা অবহেলিত, উপেক্ষিত। তোমাদের বইপত্র দিয়ে ব্যস্ত রাখা হয়, যার অর্থ খুবই কম। তোমাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নিয়ে ব্যস্ত রাখা হয় যার অর্থ আরো আরো কম। ওগুলো তোমাদের জীবিকা অর্জনে সাহায্য করে, আর সেদিক দিয়েই তার কিছু অর্থ আছে। অনেক কারখানা প্রায় সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় মেসিন দ্বারাই পরিচালিত হবে, তাই এখন থেকেই কীভাবে আমাদের এই বিরাট অবসরকে সঠিকরূপে ব্যবহার করবো তারজন্য শিক্ষিত হতে হবে। সেইসময় যেন আমরা কোনো একটা আদর্শের পিছনে ছুটে না বেড়াই। আমরা যেন আমাদের অস্তিত্বের বিরাট ক্ষেত্র— যার সম্পর্কে আমরা একেবারে অচেতন, একেবারে কিছুই জানিনা—

তারই অনুসন্ধান করি, তাকে যেন বুঝতে চেষ্টা করি। উপরচালাকিতে ভরা একটা তার্কিক মনের বাদানুবাদই জীবনের শেষ কথা নয়। মনের অতীত যে বিরাট, যে অনন্ত রয়েছে, যে অপরিমিত সৌন্দর্য রয়েছে, মন কোনোদিন তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সেই অপরিমিততাতে এক সীমাহারা আনন্দ, এক মহিমা রয়েছে। তার মাঝে থাকা, তাকে অনুভব করাই হলো শিক্ষার পথ। এই শিক্ষা যদি না থাকে, তাহলে বহুসময় ধরে চলে আসা যে বিদ্ঘুটে বিশৃঙ্খলা, তাকেই তোমরা বয়ে নিয়ে চলবে।

সুতরাং ছাত্ররা এবং শিক্ষকেরা উভয়েই এ ব্যাপার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কোরো। অভিযোগগুলোকে সরিয়ে রাখো, এগিয়ে এসো, এমন এক কেন্দ্র নির্মাণ করো যেখানে ধর্মকে তার সঠিক অর্থেই খোঁজা হয়, তাকে ভালোবাসা হয়, তারজন্য নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করা হয়, তাতে বাঁচা হয়। তখন দেখবে জীবন অসামান্য ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছে, যার সামনে বিশ্বের সম্মিলিত সব ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টকেও দরিদ্র লাগবে।

প্রশ্নকারী ঃ *মানুষ এতো জ্ঞান সঞ্চয় করলো কীভাবে? বস্তুগতভাবেই-বা তার এতো প্রগতি হলো কীভাবে? কোথা থেকে সে এতো বিশাল শক্তি আহরণ করলো?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ ‘‘কীভাবে মানুষ এতো জ্ঞান সঞ্চয় করলো?’’ এটা খুবই সহজ। আপনারা কিছু জানেন এবং সেটা আপনারা আপনাদের সন্তানদের হাতে তুলে দেন, তারা কিছু সংযোজন করে এবং তাদের সন্তানদের হাতে তুলে দেয়, এইভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেই ধারা চলতে থাকে। আমরা ধীরে ধীরে এই জ্ঞান সংগ্রহ করি। আমাদের প্রপিতামহেরা জেট-প্লেন বা আজকের ইলেকট্রনিক্সের চমৎকারগুলো সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। কিন্তু কৌতুহল-প্রয়োজন-

যুদ্ধ-ভয়-লোভ এই জ্ঞানকে ধীরে ধীরে বাড়িয়েছে।

এখন জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত জিনিস ঘটে। আপনি হয়তো অনেক জানেন, মনের ভাণ্ডার তথ্যে পূর্ণ করে ফেলছেন। কিন্তু অদ্ভুতভাবেই যে মন জ্ঞানের কুয়াশায় আচ্ছন্ন, তথ্যের ভারে গতিহীন, সেই মন কোনো কিছু আবিষ্কারে সমর্থ নয়। সে হয়তো জ্ঞানের দ্বারা বা কৌশলের দ্বারা কোনো আবিষ্কৃত কিছুকে ব্যবহার করতে পারবে; কিন্তু আবিষ্কার ব্যাপারটা একেবারে মৌলিক, এটা একেবারেই জ্ঞান নিরপেক্ষ ব্যাপার, হঠাৎই মনে তার বিস্ফোরণ ঘটে। আবিষ্কারের আকস্মিক বিস্ফোরণ— সেটাই প্রয়োজন। অধিকাংশ ব্যক্তি বিশেষতঃ এই দেশে জ্ঞান দ্বারা, পুরোনো ঐতিহ্য দ্বারা, বিভিন্ন মতামত দ্বারা, বাবা-মা বা প্রতিবেশীরা কী বলবে এই ভয়ে প্রতিটা ব্যাপারে এমনই অবদমিত হয়ে থাকেন, তাঁদের ভিতরের প্রত্যয়টাই নষ্ট হয়ে গেছে। তাঁরা যেন এক একটা প্রাণ-নিঃস্ব অস্তিত্ব। আসলে জ্ঞানের ভার মনকে ঐ দশায় নিয়ে যায়। জ্ঞান প্রয়োজনীয়, কিন্তু সেই 'অন্য কিছু'র অনুপস্থিতিতে এটা হানিকারক। বিশ্বে চারিদিকে যা যা ঘটছে এগুলো সেটাই প্রমাণ করে।

পৃথিবীতে কী কী ঘটছে একবার দেখুন। একদিকে অসাধারণ সব আবিষ্কারগুলো রয়েছে, র‍্যাডার মাইলের পর মাইল দূরের কোনো প্লেনের আসার খবর দিয়ে দিচ্ছে, সাবমেরিন একবারও জলের বাইরে না এসে সারা পৃথিবী ঘুরে ফেলতে পারে, যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে কেউ বোম্বাই থেকে বেনারস বা নিউইয়র্ক যখন খুশি কথা বলতে পারেন। জ্ঞান থেকে এইসবের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু 'কিছু একটা' যেন নেই, আর সেইটার অনুপস্থিতির জন্যই এই সমস্ত জ্ঞানের অপব্যবহার চলছে। অনবরত যুদ্ধ লাগছে, ধবংস হচ্ছে, মানুষ দুর্দশার শেষ সীমায় চলে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ দুমুঠো খিদের অন্নটুকু পর্যন্ত পাচ্ছেন না। সারাদিনে তাঁরা একবারই খেতে পান,

হয়তো-বা তাও পান না; অথচ আপনারা তার কিছুই খবর রাখেন না। আপনারা আপনাদের কিছু বইপত্র, আপনাদের নিজস্ব কতকগুলো তুচ্ছ সমস্যা, অথবা বেনারস, দিল্লী, বোম্বাইয়ের কোনো এক কোণে নিজেদের সুখ নিয়েই ব্যস্ত। একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন আপনাদের অনেক জ্ঞান থাকতে পারে, কিন্তু সেই 'অন্য কিছু' যার মধ্যে মানুষ বাঁচে, যাতে আনন্দ আছে, যাতে উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্য আছে, যাতে প্রাণ উজ্জ্বল উৎসবে অজস্র অফুরাণ— তার অনুপস্থিতিতে আমরা আমাদের বিরাট জ্ঞানকে নিজেদের ধ্বংসের কাজেই লাগাবো।

বস্তুগতভাবেও একই কথা প্রযোজ্য। বস্তুগতভাবে বিকাশ ধীরে ধীরে হয়েছে। এই বিরাট শক্তি মানুষ কোথা থেকে পেল? প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মহান আবিষ্কারক বা যাঁরা অনুসন্ধান চালিয়েছেন, তাঁদের বিরাট শক্তি ছিল, কিন্তু আমাদের অধিকাংশেরই শক্তি খুব কম, তাই নয় কি? আমরা যখন ছোটো থাকি, আমরা খেলি, খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠি, আমরা নাচি, গান গাই, কিন্তু যেই আমরা বড়ো হই, আমাদের সব ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এটা কি লক্ষ্য করেছেন? আমরা চিন্তাগ্রস্থ গৃহবধূতে পরিণত হই অথবা কেবল জীবিকার জন্যই রোজ অফিসে যাই, ঘন্টার-পর-ঘন্টা কাজ করি, এভাবেই দিনের-পর-দিন, মাসের-পর-মাস কেটে যায়। এরপর খুব অল্প শক্তি থেকে যায় অথবা থাকেই না। যদি আমাদের শক্তি থাকে তবে হয়তো আমরা এই পচা গলা সমাজটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আসবো, হয়তো এমন কিছু করে বসবো যাতে চারিদিকে এক বিক্ষোভ ওঠে, তাই যাতে আমাদের মধ্যে শক্তি না থাকে, তার দিকে সমাজ ভালোভাবে লক্ষ্য রাখে। তার শিক্ষা, তার ঐতিহ্য, তার তথাকথিত ধর্ম, সংস্কৃতি দ্বারা ধীরে ধীরে সেই শক্তিকে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর করে তোলে। প্রকৃত শিক্ষার কাজ হলো সে শক্তিকে জাগ্রত করা,

তার স্ফুরণ ঘটানো, তাকে নিরন্তর গতিশীল করা, সুতীব্র করা অথচ তার মধ্যে যেন এক সহজ নিয়ন্ত্রণও থাকে। এই শক্তিই পরমকে আবিষ্কারের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করবে। তখন সেই শক্তি সব সীমাকে অতিক্রম করে। সে শক্তি আর কোনো দুর্গতি সৃষ্টি করে না বরং সে স্বয়ং এক নতুন সমাজের নির্মাণ করে।

এগুলো একটু ভালো করে শুনুন, সরিয়ে রেখে দেবেন না, কারণ এসব সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। এর সাথে সহমত হওয়া বা একে অস্বীকার করার দরকার নেই, বরং যা বলা হচ্ছে সেটা সত্য কি না সেটা খুঁজে বার করুন। উদাসীন হয়ে থাকবেন না ঃ হয় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠুন অথবা ঠাণ্ডা হয়ে থেকে যান। যদি এইসব কিছুর সত্যতাকে দেখতে পান এবং সত্যকার উদ্দীপিত হন, সেই উত্তাপ, সেই শক্তি বাড়তে থাকবে এবং নতুন সমাজ তৈরী করবে। বর্তমান সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে থেকে কিছু বিপ্লবের বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে সেই শক্তি নিজের ক্ষয় করবে না। ঐ সব বিপ্লব আসলে সমাজকারার চারদেওয়ালকে আর একটু সুসজ্জিত করা মাত্র।

সুতরাং শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের মূল সমস্যা হলো, কী করে আমাদের যা শক্তি রয়েছে তাকে সংরক্ষণ করা যাবে, তাকে আরো উজ্জীবিত করা যাবে, সে শক্তির এক আশ্চর্য বিস্ফোরণ ঘটানো যাবে। এরজন্য গভীর বোধ প্রয়োজন। শিক্ষকদের নিজেদের শক্তিই খুব সীমিত। তথ্যের ভারে তাঁরা পীড়িত, তলিয়েছেন নিজেদের সমস্যার অতলে, তাঁদের শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে, তাই এই সৃজনশীল শক্তির জাগরণের জন্য তাঁরা ছাত্রদের সাহায্য করতে পারবেন না। তাই এইসব ব্যাপার শিক্ষকদের এবং ছাত্রদের উভয়েরই বোঝা সমান জরুরী।

প্রশ্নকারী ঃ *যখন আমি বলি, অন্য ধর্ম অনুসরণ করবো, আমার বাবা-*

মা রেগে যান কেন?

কৃষ্ণমূর্তি ঃ প্রথমতঃ তাঁরা তাঁদের ধর্মের প্রতি আসক্ত। তাঁরা যদিও মনে করেন না যে তাঁদের ধর্মই একমাত্র ধর্ম, তবু একথা বিশ্বাস করেন তাঁদের ধর্মটাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেইজন্য স্বভাবত তাঁরা চান তোমরাও সেটা অনুসরণ করো। উপরন্তু এটাও চান, তোমরা যেন তাঁদের বিশেষ চিন্তাধারা, তাঁদের সম্প্রদায়, তাঁদের জাতি, তাঁরা যে শ্রেণীর মানুষ এইসব কিছুকে আঁকড়ে থাকো। এইগুলোই কিছু কিছু কারণ। এছাড়া যদি অন্য ধর্ম অবলম্বন করো তবে তুমি পরিবারের ক্ষেত্রেও এক উপদ্রব হয়ে উঠবে।

কিন্তু ধরো তুমি এক সংগঠিত ধর্ম ছেড়ে আর একটা ধর্ম গ্রহণ করলে, তখন কী ঘটে? তুমি কি আসলে এক কারাগার ছেড়ে অন্য কারাগারে প্রবেশ করোনি। যতক্ষণ মন কোনো বিশ্বাসে বাঁধা থাকে, ততক্ষণ তার বন্দিত্ব থেকেই যায়। তুমি হিন্দুর ঘরে জন্ম নিয়ে খ্রিষ্টান হয়ে গেলে তোমার বাবা-মা হয়তো খুব রাগারাগি করবেন। সে ব্যাপারটা আসলে তুচ্ছ ব্যাপার। যেটা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে সেটা হলো— তুমি আসলে পুরোনো নিয়মনীতি, মতবাদ প্রভৃতির জায়গায় কতকগুলো নতুন নিয়মনীতি, মতবাদ বসাচ্ছো। তুমি হয়তো একটু বেশী সক্রিয় হয়ে উঠতে পারো অথবা ‘এটায়’ ‘সেটায়’ একটু বেশী হতে পারো, কিন্তু তখনও তুমি সেই কতকগুলো বিশ্বাস, কতকগুলো মতবাদের বন্দীশালার বন্দী।

সুতরাং ধর্ম পরিবর্তন কোরো না। ওতো কারাগারের ভিতরে থেকে বিদ্রোহ করার মতো, বরঞ্চ এই কারার প্রাচীর ভেঙ্গে বেরিয়ে নিজে খুঁজে বার করো সত্য কী, ঈশ্বর কী। তখনই তার একটা অর্থ আছে, এটা তোমাকে আশ্চর্য জীবনীশক্তি দেবে। না হলে শুধু শুধু এক কয়েদ থেকে বেরিয়ে আরেক কয়েদে ঢুকে, কোন কয়েদটা ভালো সেটা নিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করা একটা বাল্যখিল্য ব্যাপার

হয়ে দাঁড়াবে।

এই যে বিভিন্ন বিশ্বাসের প্রাচীর— তাকে ভাঙতে গেলে একটা পরিণত মনের প্রয়োজন, একটা বিচারশীল মনের প্রয়োজন। সে মন কারাগৃহটার প্রকৃতিটাকে বুঝবে, সে একটা কারার সাথে অন্য কারার তুলনা করবে না। কোনো কিছুকে বুঝতে গেলে অন্য কারোর সাথে তাকে তুলনা করলে হবে না। তুলনার মধ্যে দিয়ে নয়— যখন তুমি সেই জিনিসটাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করো, তখনই উপলব্ধি আসে। এই সংগঠিত ধর্মগুলোর প্রকৃতি নিয়ে যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করো, তবে দেখবে তারা সবই এক। হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, মুসলিম ধর্ম, খ্রিষ্টান ধর্ম অথবা কমিউনিজম যেটা ধর্মেরই অন্য একটা রূপ, খুব আধুনিকতম রূপ— এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যে মুহূর্তে তুমি বন্দীশালাকে চিনতে পারবে; বিশ্বাসের, আচার-অনুষ্ঠানের, পুরোহিতের কার্যপ্রণালী প্রভৃতির মধ্যে থাকার পরিণামকে বুঝতে পারবে, তখন তুমি আর কোনোদিন কোনো ধর্মের ছাতার তলায় আশ্রয় নেবে না; তার কারণ হলো, যে মানুষ সকল রকমের বিশ্বাস থেকে মুক্ত সে-ই সব বিশ্বাসের অতীত সেই অমেয়কে আবিষ্কার করে।

প্রশ্নকারী ঃ *চরিত্র গড়ে তোলার সঠিক উপায় কী?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ চরিত্রবান হওয়ার অর্থই হলো— অসত্যকে প্রতিরোধ করা আর সত্যতে স্থির থাকা, কিন্তু এভাবে চরিত্র গঠন কঠিন, কারণ আমাদের কাছে আমরা নিজেরা কী ভাবি তার থেকেও বইগুলো, শিক্ষকেরা, বাবা-মা, দেশের সরকার এরা কে কী বলেছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। নিজে চিন্তা করা, সত্য কী নিজে তা খুঁজে বার করা এবং তাতে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকা, তারজন্য জীবন— দুঃখ বা সুখ যা-ই আনুক তার দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া— এইসবই চরিত্র গঠন করে।

ধরো, কোনো সংস্কারক বা কোনো ধর্মীয় গুরু বলেছেন বলে নয়, তুমি নিজেই চিন্তাভাবনা করেছো এবং তার ফলে যুদ্ধে তোমার কোনো বিশ্বাস নেই। তুমি এই নিয়ে খোঁজখবর করেছো, একে প্রশ্ন করেছো, এ নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছো। তুমি অন্তর থেকে উপলব্ধি করেছো খাদ্যের জন্যই হোক, ঘৃণার জন্যই হোক অথবা দেশের প্রতি তথাকথিত ভালোবাসার জন্যই হোক— হত্যা কোনোক্ষেত্রেই সঠিক নয়। যদি এই ব্যাপারটা গভীরভাবে অনুভব করো, এবং যে কোনো পরিস্থিতিতেই তথা তোমাকে জেলে যেতে হতে পারে অথবা কোনো কোনো দেশে যেমন হয়ে থাকে— কারোর বন্দুকের নিশানাও হতে পারো, এমন সর্বক্ষেত্রেই যদি তুমি তোমার সত্যে স্থির থাকো, তাহলে তুমি চরিত্রবান। তখন চরিত্র ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বহন করে, সে চরিত্রের সাথে, সমাজ যে চরিত্রের উন্নতি-সাধনের কথা বলে, তার কোনো সম্বন্ধই নেই।

কিন্তু দেখবে তোমাদের এই পথে যাবার জন্য উৎসাহিত করা হয় না। না শিক্ষক, না ছাত্র— কারোর মধ্যে, কোনো জিনিসের সত্যতাকে দেখা এবং তাতে স্থির থাকা, অসত্যকে বিসর্জন দেওয়ার মতো প্রাণের প্রৈতি নেই। কিন্তু যদি এটা করতে পারো, তখন দেখবে, তোমরা কোনো রাজনৈতিক নেতাই বলো অথবা ধর্মীয় গুরুই বলো কাউকে অনুসরণ করবে না, কারণ তখন তোমরা নিজেই নিজের পথে আলো হয়েছো। যখন তোমরা ছোটো শুধুমাত্র তখনই নয়, সারা জীবনভর এই আলোর আবিষ্কার, আর তার শিখাকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করাই হলে শিক্ষা।

প্রশ্নকারী ঃ *ঈশ্বরোপলব্ধির ক্ষেত্রে বয়স কীভাবে বাধা হয়ে দাঁড়ায়?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ বয়স কী? এটা কি আপনি যতো বছর বেঁচেছেন তার সংখ্যা? আপনি অমুক অমুক বৎসরে জন্মেছিলেন তাই আপনার

বয়স পনেরো, চল্লিশ বা ষাট। আপনার শরীর বৃদ্ধ হয়, জর্জরিত হয়। মনের সাথেও তেমনটাই ঘটে। যে মন জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা, দুর্দশা, দুশ্চিন্তার বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ায় তেমন মনের পক্ষে সত্য কী তা আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। মন যখন তরুণ, অনাবিল, সরল তখনই সে সত্যকে খুঁজে পায়। কিন্তু এই অকপট সরলতার, বয়সের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। বাচ্চারাই শুধু সরল, ব্যাপারটা এমন নয়, হয়তো-বা সে সরল নয়। সরল মন অর্থাৎ যে মন সকল অনুভূতির অবশেষগুলো নিজের মধ্যে একত্রিত না করেই অনুভব করে চলে। মনকে অবশ্যই অনুভব করতে হবে, সেটা অবশ্যম্ভাবী। নদী, অসুস্থ প্রাণী, দাহ করার জন্য যে মৃত শরীরকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, গরীব গ্রামবাসী রাস্তা দিয়ে ভারী বোঝা নিয়ে যাচ্ছেন, জীবনের সকল যন্ত্রণা, সকল দুঃখ এবং আরো যা যা হয় সেই প্রত্যেক কিছুর ব্যাপারে মনকে জাগ্রত জীবন্ত থাকতে হবে, তাতে সাড়া দিতে হবে, না হলে সে মন মৃত। কিন্তু মনের যেন কোনো অনুভূতিতে বদ্ধ না হয়ে সাড়া দেওয়ার সামর্থ্য থাকে। আসলে আমাদের পরম্পরা, আমাদের প্রচুর অনুভূতির সংগ্রহ, স্মৃতির ভস্ম মনকে বৃদ্ধ করে তোলে। যে মন প্রতিদিন গতকালের সব স্মৃতিকে, তথা যে সময় গত হলো তার সকল আনন্দ আর দুঃখকে বিসর্জন দেয়, সেই মনই নবীন, সরল, তার কোনো বয়স নেই; আর এই অকপট সরলতা ছাড়া কারোর বয়স দশই হোক আর ষাটই হোক, সে ঈশ্বরকে খুঁজে পাবে না।

২৭

সত্যের খোঁজ

অসংখ্য সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম একটি সমস্যা, যেটা আমাদের সকলকে এবং বিশেষত যারা শিক্ষিত হচ্ছো এবং শীঘ্রই শিক্ষা শেষ করে বেরিয়ে বিরাট পৃথিবীর মুখোমুখি হবে, তাদেরও সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তা হলো— সংস্কারসাধন। বিভিন্ন সম্প্রদায়, সমাজবাদী, সাম্যবাদী এবং সবরকমের সংস্কারকেরা পৃথিবীতে বিশেষ কিছু কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছেন। পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজন। এরই মধ্যে যদিও কিছু কিছু দেশ যথেষ্ট উন্নতি করেছে, কিন্তু সারা বিশ্বে মানুষ খাদ্য পাচ্ছে না, অনাহার চলছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের পরার প্রয়োজনীয় কাপড়ের অভাব, মাথা গোঁজবার, একটু শোয়ার ঠিক মতো ঠাঁইটুকু পর্যন্ত নেই। এখন প্রশ্ন হলো আরো বিশৃঙ্খলা, আরো দুর্গতি, আরো সংঘর্ষ সৃষ্টি না করে কীভাবে এক মৌলিক পরিবর্তন আসতে পারে? যদি কেউ ইতিহাসের কয়েকটা পাতা ওলটান, যদি বর্তমান রাজনীতির প্রবণতা কোনদিকে তা লক্ষ্য করেন, তবে যে জিনিসটা খুব সহজেই তাঁর চোখে পড়বে, তা হলো— আমরা যাকে সংস্কার বা পরিবর্তন বলি, সেটা যতোই কাম্য এবং যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন, তা সর্বদাই নিজের সঙ্গে ভিন্নধরণের এক সংশয়, এক সংকট ও দ্বন্দ্ব নিয়ে আসে। সেই দুর্দশাকে রোধ করার জন্য আবার কিছু আইন-কানুন, কিছু নিয়ন্ত্রণ এবং তাদেরও আবার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয়

হয়ে পড়ে। এইভাবে সংস্কারসাধন নতুন নতুন বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসে, এবং তাকে ঠিক করার জন্য, আরো কিছু বিশৃঙ্খল ব্যবস্থাকে নিয়ে আসা হয়। ফলতঃ ভ্রান্তির এই ক্রম এগিয়ে চলতেই থাকে। এটাই একটা সমস্যা, আমরা সবাই এর সম্মুখীন হচ্ছি, আর মনে হয় যেন এই শৃঙ্খলটারও কোনো শেষ নেই।

এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে একজন এই ভ্রান্তির শৃঙ্খলকে ছিন্ন করবে? একটা কথা মনে রেখো পরিবর্তন প্রয়োজন, কিন্তু আরো অন্য কোনো সংকটের বীজ বপন না করে কী এটা সম্ভব? আমার মনে হয় এটা খুবই মৌলিক প্রশ্ন এবং প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির সাথেই এর সম্বন্ধ রয়েছে; কী ধরণের পরিবর্তন বা কোন স্তরে পরিবর্তন প্রয়োজন সেটা এখানে প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা হলো এমন সংস্কার বা পরিবর্তন কী সম্ভব, যার সাথে আরো কিছু সমস্যা না আসে; নয়তো তাদের আবার পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেবে। একজন এই অন্তহীন শৃঙ্খলটাকে ছিন্ন করবে কী করে? ছোটো স্কুল বা বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় যেখানেই হোক, শিক্ষার কাজ কিন্তু এই সমস্যার মুখোমুখি হওয়া; এবং সেটা কিন্তু কোনো কাল্পনিকভাবে, তাত্ত্বিকভাবে, দার্শনিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বা বই লেখার মাধ্যমে নয়, কোন পথে এর নিরাময় আসবে তা খুঁজে বার করার জন্য বাস্তবিকভাবে এর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। মানুষ এমন এক সংস্কারের ঘূর্ণাবর্তে ঘুরে চলেছে যা আরো আরো সংস্কারের প্রয়োজন দাবী করছে। যদি এই আবর্তন থেকে বেরিয়ে আসা না যায়, তাহলে কোনোদিন আমাদের সমস্যারও সমাধান হবে না।

সুতরাং এই দুষ্ট চক্রটাকে ভেঙে ফেলার জন্য কী ধরণের শিক্ষা বা চিন্তার প্রয়োজন? আমাদের সব কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে এই সমস্যা যাতে আরো আরো বেড়ে না যায়, সেটাকে বন্ধ করবার জন্য কোনো ক্রিয়া আছে কী? কোন পথে, কোন চিন্তার ক্রিয়া— মানুষের এই

ধরণের বেঁচে থাকা তথা এই সংস্কারসাধন যা আরো সংস্কারের প্রয়োজন দাবী করে— এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে মুক্ত করে? অন্যভাবে বললে এমন কোনো ক্রিয়া আছে কি, যার উৎপত্তি কোনো প্রতিক্রিয়া থেকে হয় না?

আমার মনে হয়, আরো এক ধরণের বাঁচা রয়েছে। সেখানে বার বার সংস্কারসাধনের এই প্রক্রিয়া অর্থাৎ যা আরো দুর্গতি নিয়ে আসে— তা নেই। তা হলো ধর্মীয় পথ। সত্যকার ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি এইসব সংস্কারের ব্যাপারে আদৌ উৎসাহী নন। তিনি সামাজিকভাবে বিভিন্ন সংস্কারের ব্যাপারে আগ্রহী নন। তিনি সত্য কী— তা অন্বেষণ করেন আর তাঁর সেই অন্বেষণ সমাজকে রূপান্তরিত করতে থাকে। সেই কারণেই ছাত্রদের সত্য বা পরমকে খোঁজার ব্যাপারে সহায়তা করাই শিক্ষার মুখ্য ভূমিকা হওয়া উচিত; সমাজের দেওয়া কোনো নকশায় তারা যাতে ঠিক মানিয়ে যায়, তারজন্য তাদের তৈরী করার কোনো অর্থ নেই।

আমার মনে হয় এগুলো আমাদের ছোটোবেলাতেই বুঝতে হবে। যতো আমরা বড়ো হতে থাকি এবং যতো আমরা আমাদের ছোটো ছোটো আমোদ-আহ্লাদ, মনভোলানোর সামগ্রীগুলোকে, যৌন কামনাগুলোকে, তুচ্ছ তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষাগুলোকে সরিয়ে রাখতে থাকি, ততই সমগ্র বিশ্ব যেসব গভীর সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তাদের সম্পর্কে আরো তীব্রভাবে সচেতন হয়ে উঠি। তখন আমরা এই সমস্যাগুলোর ব্যাপারে কিছু করতে চাই, আমরা অবস্থার উন্নতিসাধন করতে চাই। কিন্তু আমরা যদি সত্যকার অর্থে ধর্মনিষ্ঠ না হই তাহলে আমরা আরো সংকট, আরো দুর্গতি তৈরী করবো। পুরোহিত, চার্চ, কোনো মতবাদ বা কোনো ধরণের সংগঠিত বিশ্বাসের সাথে কিন্তু ধর্মের কোনো সম্বন্ধ নেই। এগুলো ধর্মই নয়। ওগুলো আমাদের এক বিশেষ ধারায় চিন্তা ও ক্রিয়াকর্মের মধ্যে সীমিত রাখবার সামাজিক উপায়, ওগুলো

আমাদের সহজ বিশ্বাস, আশা ও ভয়কে কাজে লাগিয়ে স্বার্থসিদ্ধির উপায়। ধর্ম হলো সত্যের, ঈশ্বরের অন্বেষণ এবং এই অন্বেষণ—অসামান্য শক্তি, অপরিমিত মেধা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তা দাবী করে। এই অনন্তকে খোঁজার মধ্যে দিয়েই সঠিক সামাজিক ক্রিয়া জন্ম নেয়। কোনো বিশেষ সমাজের তথাকথিত সংস্কার থেকে তা কোনোদিন আসে না।

সত্যকে খোঁজার অর্থ, সকল কিছুর সঙ্গে ব্যক্তির যে সম্পর্ক—তার প্রতি ব্যক্তির প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং সচেতনতা থাকতে হবে। যার অর্থ ব্যক্তি কখনোই নিজস্ব উন্নতি, নিজস্ব সাফল্যের নেশায় আচ্ছন্ন নয়। সত্যকার ধর্ম হলো পরমকে খোঁজা; যে ব্যক্তি তা খোঁজেন তিনি একমাত্র ধর্মিষ্ঠ মানুষ। এমন মানুষ তাঁর প্রেমের কারণে সমাজ-সীমাবদ্ধতার বাহিরে; কিন্তু সমাজের উপর তাঁর ক্রিয়া, আর যে ব্যক্তি সমাজের মধ্যে থেকে সংস্কারসাধনের চেষ্টা করছেন তাঁর ক্রিয়া একেবারেই ভিন্ন। এই সংস্কারক কোনোদিন নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু সেই সত্যকার ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অন্বেষণই এক নিজস্ব সংস্কৃতি, এক ভিন্ন কৃষ্টির জন্ম দেয়, আর এরমধ্যেই আমাদের একমাত্র আশা রয়েছে। পরমের খোঁজ, মনে এক বিস্ফোরক সৃজনশীলতা নিয়ে আসে এবং এটাই সত্যকার বিপ্লব। এই খোঁজে মন সামাজিক অনুশাসন-নীতি-নিয়মের আবর্জনার ভারে গতিহীন নয়। এইসব কিছুর থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার কারণে ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সত্যকে খুঁজে পায় এবং প্রতিক্ষণে পরমকে নতুন করে আবিষ্কারের মধ্যে দিয়েই এক নতুন সংস্কৃতি বিকশিত হতে থাকে।

সেইজন্যই যেটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সেটা হলো সঠিক শিক্ষা। তাই শিক্ষকদেরও সঠিকভাবে শিক্ষিত হতে হবে। তিনি যেন শিক্ষকতাকে শুধু জীবিকার্জনের একটা উপায় বলে মনে না করেন, তিনি যেন ছাত্রদের সবরকমের মতবাদকে, সমস্ত প্রকারের বিশ্বাসকে তাদের

জীবন থেকে সরিয়ে রাখতে সাহায্য করেন। যে ব্যক্তিরা কোনো ধর্মীয় কর্তৃত্বকে মেনে নিয়ে বা বিশেষ কতগুলো আদর্শকে পালন করার কারণে একত্রিত হয়, তারা আসলে সামাজিক সংস্কারের সঙ্গেই যুক্ত; ওটা অনেকটা যে কারাগারে আছি তার দেওয়ালটা একটু সাজানো ছাড়া কিছু নয়। সত্যকার ধর্মিষ্ঠ মানুষই সত্য বিপ্লবী। শিক্ষার কাজ হলো আমাদের প্রকৃত অর্থে, গূঢ়তম অর্থে ধর্মনিষ্ঠ বলতে যা বোঝায় তা হওয়াতে সাহায্য করা, কারণ ঐ পথেই আমাদের মুক্তি রাখা আছে।

প্রশ্নকারী ঃ *আমি সমাজের কাজ করতে চাই, কিন্তু কী করে শুরু করবো সেটাই বুঝতে পারছি না?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ আমার মনে হয় কী করে কাজটা শুরু করবে তার থেকেও কেন তুমি কাজটা করতে চাইছো সেটা খুঁজে বার করা অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। কেন তুমি সমাজের জন্য কাজ করতে চাও? এটা কি অনাহার, রোগ, শোষণ, ঐশ্বর্যের নৃশংস নির্লজ্জ উদাসীনতা এবং আশঙ্কাজনক দারিদ্রের পাশাপাশি অবস্থান, মানুষে মানুষে শত্রুতা—এইসব চারিদিকে তুমি দেখছো তাই? তোমার হৃদয়ে ভালোবাসা আছে, তাই তুমি নিজের সফলতার ব্যাপারে উৎসাহী নও, তাই তুমি সমাজের কাজ করতে চাও, নাকি নিজের থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য এই কাজ করতে চাও? একটা উদাহরণ নেওয়া যাক, ধরো প্রথানুসারী বিবাহের সব কদর্য জায়গাগুলো তুমি দেখছো, এখন তুমি বললে, 'আমি বিবাহ করবো না' এবং তার পরিবর্তে তুমি সমাজসেবার কাজে নেমে পড়লে। এমনও হতে পারে তোমার বাবা-মা তোমায় এটা করতে বলেছেন বা তোমার নিজেরই এমন কোনো আদর্শ আছে, তাই তুমি এই কাজে নিজেকে ঢেলে দিলে। এখন যদি তুমি নিজের থেকে পালাবার জন্য বা সমাজের বা কোনো নেতার বা ধর্মগুরুর খাড়া করা কোনো

আদর্শকে অনুসরণের জন্য এটা করো, তাহলে জেনে রেখো, সমাজের যে কোনো কাজই তুমি করো, সেটা আরো দুর্গতি আনবে। কিন্তু যদি তোমার হৃদয়ে ভালোবাসা থাকে, যদি তুমি পরমের অন্বেষণ করো, তথা তুমি একজন সত্যকার ধর্মনিষ্ঠ মানুষ হও, যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষা তোমার জীবন থেকে চিরকালের জন্য নির্বাসিত হয়ে থাকে, যদি সাফল্যের তৃষ্ণা আর না থাকে এবং তোমার গুণ তোমাকে সম্মান আর প্রতিষ্ঠার পথে টেনে না নিয়ে যায়, তখন তোমার জীবনই সমাজের আমূল পরিবর্তনে সহায়তা করবে।

তোমরা অধিকাংশই এখন বয়সে ছোটো, এখনই তোমাদের এগুলো বোঝা উচিত। এই সময় আমরা কিছু-না-কিছু করতে চাই। সমাজসেবার কথাটা যেন চারিদিকে গুঞ্জরিত হচ্ছে, বইগুলো এর কথা বলে, সংবাদপত্রগুলো এর প্রচার করে, কিছু সংস্থা আছে যারা সমাজসেবার প্রশিক্ষণ দেয়; চারিদিকে এমন বহু কিছু ঘটছে। কিন্তু নিজেকে এবং নিজের সম্পর্কগুলোকে উপলব্ধি না করে যেকোনো সমাজের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করো না কেন— অব্যর্থভাবে তা সারহীন ভস্মে পরিণত হবে।

যে আনন্দিত, যে সুখী সে-ই প্রকৃত বিপ্লবী, কোনো আদর্শবাদী বা কোনো দুদর্শাগ্রস্থ পলায়নবাদী নয়। যাঁর অনেক অনেক জিনিসের সংগ্রহ আছে সেই কিন্তু সুখী মানুষ নয়। এক সুখী মানুষই সত্য ধর্মিষ্ঠ মানুষ, তাঁর শুদ্ধ বেঁচে থাকাটাই সমাজের সেবা, সমাজের কাজ। কিন্তু যদি তুমি অসংখ্য সমাজসেবীদের বা সমাজহিতৈষীদের একজন হয়ে ওঠো, তোমার হৃদয় কিন্তু খালিই থেকে যাবে। হতে পারে তুমি তোমার সব টাকাপয়সা বিলিয়ে দিলে, অন্যকেও দানের জন্য উৎসাহিত করলে, হয়তো সমাজের চমৎকার কোনো সংস্কারও করলে, কিন্তু হৃদয় যতক্ষণ খালি, মন যতক্ষণ কতোগুলো আদর্শ আর মতামতের ভিড়ে কোলাহলপূর্ণ, ততক্ষণ জীবন স্থূল, চিন্তাগ্রস্থ হয়ে রয়ে যাবে।

জীবন, আনন্দের সাথে অপরিচিতই থেকে যাবে। তাই সবার আগে নিজেকে বোঝো, সেই আত্মবোধ থেকে সঠিক ক্রিয়া জন্ম নেবে।

প্রশ্নকারী ঃ *মানুষ এতো নির্মম কেন?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ ব্যাপারটা খুবই সহজ। যখন শিক্ষা কিছু তথ্য সরবরাহ করার মধ্যে নিজেকে সীমিত রাখে, ছাত্রদের কেবল কোনো-না-কোনো জীবিকার জন্য প্রস্তুত করে, যখন তা কতকগুলো আদর্শকে কেবল ধরে রাখে এবং ছাত্রদের কেবল সফলতাকেই জীবনের অন্তিম আরাধ্য বলে শিক্ষা দেয়, তখন তারা অবশ্যই নিষ্ঠুর হবে। দেখবে আমাদের অধিকাংশের হৃদয়ে ভালোবাসা নেই। আমরা কখনো নক্ষত্রদের দিকে তাকিয়ে দেখি না, জলের বয়ে যাওয়ার মৃদু শব্দে আনন্দিত হই না, উদ্দাম জলস্রোতে চাঁদের আলোর উচ্ছলতা দেখি না, পাখির উড়ে যাওয়াকে লক্ষ্য করি না। আমাদের হৃদয়ে কোনো গান নেই, আমরা সদাসর্বদা ব্যস্ত। মানবসভ্যতা বাঁচাবার জন্য আমাদের মন হাজার পরিকল্পনা, হাজার আদর্শে ঠাসা। বলি আমরা বন্ধুতার কথা, মৈত্রীর কথা, কিন্তু আমাদের প্রত্যেক দৃষ্টিতে আমরা সেই বন্ধুতাকেই নির্বাসনে পাঠাই। সেইজন্যই আমরা যখন ছোটো তখনই সঠিক শিক্ষার প্রয়োজন, যাতে আমাদের মন, আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত থাকে, সংবেদনশীল ও কৌতুহলী থাকে। কিন্তু আমরা যদি ভীত হই তাহলে—আমাদের সামর্থ্য, আমাদের জিজ্ঞাসা, আমাদের বিস্ফোরক বোধ নষ্ট হয়, আর দুঃখের বিষয় হলো আমাদের মধ্যে অধিকাংশ জনই ভীত। আমরা আমাদের বাবা-মা, শিক্ষক, পুরোহিত, সরকার, উপরওয়ালার ভয়ে ভীত, এমনকী আমরা আমাদের নিজেদেরও ভয় পাই। তাই জীবন আমাদের কাছে ভয়ের, অন্ধকারের ব্যাপার হয়ে রয়ে যায়। এইজন্যই মানুষ এতো নির্মম, এতো কঠোর।

প্রশ্নকারী ঃ *একজন তার ভালোলাগার কাজ না করেও কি সত্যকে খুঁজতে পারে?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ জানবে, শুধু কিশোর বয়সেই নয়, সারাজীবন ধরেই আমরা বাস্তবিক কী করতে চাই সেটা খুঁজে বার করা খুব কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তোমার সমস্ত সত্তা দিয়ে তুমি কী করতে ভালোবাসো সেটা যদি নিজে খুঁজে বার না করো, তাহলে শেষ পর্যন্ত তুমি এমন কিছু করবে, যার সাথে তোমার প্রাণের কোনো আত্মীয়তা নেই। জীবন তখন বিবর্ণ হয়ে উঠবে, একটা ভার হয়ে উঠবে। এই বিবর্ণতা, এই বিরসতা, এই অনতিক্রম্য অবসাদ থেকে নিজের মনকে একটু সরিয়ে রাখার জন্য তোমরা সিনেমা দেখবে, মদ্যপান করবে, অসংখ্য বইয়ের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখবে অথবা কোনো সমাজ-সংস্কারের কাজে নেমে পড়বে। এমন আরো বহু পথ আছে।

এখন প্রশ্ন হলো শিক্ষকেরা— তোমাদের বাবা-মা বা সমাজ যাই কিছু চাক না কেন, সেটা সরিয়ে রেখে তোমরা নিজেরা সারাজীবন কী করতে চাও, সেটাকে কি খুঁজে বার করার ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা করতে পারেন? কারণ, যেটা তুমি নিজের সবটুকু দিয়ে করতে ভালোবাসো যদি সেটাকে খুঁজে পাও তখন তুমি একজন মুক্ত মানুষ, তখন তোমার সামর্থ্য, প্রত্যয় আর উদ্দীপনা থাকে। কিন্তু সেই ভালোবাসার জিনিসটাকে খুঁজে না পেয়ে যদি উকিল বা রাজনীতিবিদ বা অন্য কিছু হয়ে যাও, তখন সেখানে আনন্দের কোনো স্পর্শই থাকবে না। তোমার ঐ পেশা তোমাকে এবং অন্যদের নষ্ট করার একটা পথ মাত্র হয়ে রয়ে যাবে।

সমস্ত সত্তার সঙ্গে কী করতে ভালোবাসো তা খুঁজে বার করতেই হবে। সমাজে কী করে মানিয়ে যাবে সেই কথা মাথায় রেখে কখনো বাছতে যেও না, ঐভাবে কোনোদিন খুঁজে পাবে না। আসলে যখন ভালোবাসার জিনিসটা করার ব্যাপারটা আসে, তখন কোনটা

বাছবো সেই প্রশ্নটাই আর সেখানে থাকে না। যদি কোনো কাজের প্রতি তোমার এমনই জীবন্ত ভালোবাসা থাকে, যদি সেই ভালোবাসাকে তার নিজের কাজ করতে দাও, তখন যেটাই করবে সেটাই সঠিক কাজ। এর কারণ ভালোবাসা সফলতা খোঁজে না, এটা কারোর অনুকরণ করে না। কিন্তু যদি এমন কিছু করো, যার সাথে তোমার নিবিড় সংযোগ নেই, তাহলে কোনোদিন মুক্ত হবে না।

এখানে আর একটা ব্যাপার হলো, যা তোমার খুশী হলো সেটা করলে, আর কোনো জিনিস প্রাণ দিয়ে ভালোবাসো বলে করো— দুটো কিন্তু আদপেই এক নয়। সত্যি কী করতে ভালোবাসো খুঁজে পেতে গেলে গভীর অন্বেষণ এবং অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন। জীবিকার কথা চিন্তা করে কোনো কিছু শুরু কোরো না, কিন্তু যদি নিজের সেই ভালোবাসার কাজটাকে আবিষ্কার করতে পারো, তাহলে দেখো জীবিকার সমস্যারও সমাধান হয়ে গেছে।

প্রশ্নকারী ঃ *এটা কি সত্যি— যে মানুষ নিষ্কলুস, নির্দোষ— সে-ই একমাত্র ভয়শূন্য হতে পারে?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ শুদ্ধতা, পবিত্রতা, বন্ধুতা, অহিংসা এমন আরো যা যা আছে সেই আদর্শগুলোকে আঁকড়ে ধরে বসে থেকো না, ওগুলো অসার। সাহসী হওয়ার চেষ্টা করো না, ওটা ভয়ের প্রতিক্রিয়া মাত্র। ভয়শূন্য হতে হলে চাই গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং ভয়ের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ও তার কারণ সম্পর্কে বোধ।

দেখবে যতক্ষণ তোমরা সুরক্ষিত থাকতে চাও ততক্ষণ ভয় থাকে। তোমরা বিবাহতে, চাকুরীতে, পদমর্যাদায়, তোমাদের দায়িত্বে— সুরক্ষিত থাকতে চাও। তোমরা তোমাদের ধারণায়, তোমাদের বিশ্বাসেও সুরক্ষিত থাকতে চাও। তোমরা পৃথিবীর সাথে তোমাদের সম্পর্কে বা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কেও সুরক্ষিত থাকতে চাও। যে

মুহূর্তে মন যে কোনোরূপে, যে কোনো স্তরে নিরাপত্তা বা আত্মতুষ্টি খুঁজছে, সেই মুহূর্তেই ভয়ের সাথে তার দেখা হয়। যেটা জরুরী সেটা হলো এই প্রক্রিয়াটা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং তাকে বোঝা। এখানে তথাকথিত শুদ্ধতার কোনো জায়গাই নেই। যে মন সজাগ, লক্ষ্য করছে, এবং ভয়নির্মুক্ত সেই মনই সরল আর এরকম মনই পরম, সত্য বা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারে।

দুঃখের বিষয় অন্যান্য দেশের মতো এই দেশেও আদর্শকে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরা হয়। 'কী হওয়া উচিত' (what *should* be) এই আদর্শ। আমার অহিংস হওয়া উচিত, আমার ভালো হওয়া উচিত, এমন রাশি রাশি আদর্শ রয়েছে। 'কী হওয়া উচিত' এই আদর্শ সবসময়ে অনেক দূরে কোথাও রয়েছে, তা কখনই 'যা বর্তমানে আছে' (what *is*) তা নয়। আদর্শগুলো হলো অভিশাপ, কারণ 'যা বর্তমানে আছে' তুমি যখন তার মুখোমুখি হও, এই আদর্শগুলোই— তোমার সরাসরি, সরলভাবে, বাস্তবিকতার সাথে চিন্তার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। আসলে আদর্শ বা 'কী হওয়া উচিত' হলো 'যা বর্তমানে আছে' তার থেকে পলায়ন। 'যা বর্তমানে আছে' তাকেই তোমরা ভয় পাও। তোমাদের বাবা-মা কী বলবে, লোকে কী ভাববে, সমাজ কী ভাবে নেবে— এই ভয়ে ভীত; তোমরা ব্যাধি এবং মৃত্যুকে ভয় পাও। কিন্তু যদি সরাসরি 'যা বর্তমানে আছে' তার মুখোমুখি হও, যদি তা দুর্দশাও আনে তবু যদি তার ভিতরে প্রবেশ করো, তাকে বোঝো দেখবে মন আশ্চর্য সরল এবং স্বচ্ছ হয়ে গেছে। সেই স্বচ্ছতায় ভয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভাগ্যজনকভাবেই আমরা আদর্শের হাস্যকর দার্শনিকতার শিক্ষায় শিক্ষিত হই, যেটা আসলে এই মুহূর্তের ক্রিয়াকে স্থগিত রাখা; যার কোনো অর্থও নেই।

উদাহরণ হিসাবে ধরো তোমার 'অহিংসার' আদর্শটা আছে, কিন্তু তুমি কি অহিংস? সুতরাং নিজের হিংসার মুখোমুখি হচ্ছো না কেন?

তুমি নিজে যা, তার দিকে সরাসরি তাকাচ্ছো না কেন? যদি নিজের লোভ, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিজের পরিতৃপ্তি, চিত্তবিনোদন বা যে পথে নিজের মনকে একটু ভুলিয়ে রাখতে চাও— সেগুলোকে পর্যবেক্ষণ করো এবং সেগুলোকে উপলব্ধি করতে শুরু করো তাহলে দেখবে, যে সময়কে ব্যবহার করে তোমরা উন্নতি করবে ভেবেছিলে, যে সময়কে ব্যবহার করে কোনো আদর্শকে নিজের জীবনে ফলবান করবে ভেবেছিলে— সেই সময়ের আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। মন সময়ের আবিষ্কার করে কারণ এর মধ্যে দিয়ে বা একে ব্যবহার করে মন কোনো কিছু সফলতা অর্জন করতে চায়; সেইজন্য মন কখনো শান্ত থাকতে পারে না, স্থির থাকতে পারে না। কিন্তু একটা শান্ত মনের হয়তো সহস্র বছরের অনুভব রয়েছে, তবু সে সরল, একেবারে নতুন আর সেইজন্যই সব সম্পর্কের মধ্যে তার নিজ অস্তিত্বের যে কোনো সমস্যার সমাধানে সমর্থ।

প্রশ্নকারী ঃ *মানুষ নিজেরই কামনা, যা কতো সমস্যার জন্ম দেয়— তার শিকার হয়ে যায়। কী করে সে এমন কোনো অবস্থায় আসবে যাতে কোনো কামনাই আর থাকবে না?*
কৃষ্ণমূর্তি ঃ কামনাশূন্য অবস্থার জন্য চাওয়া হলো মনের একটা কৌশল মাত্র। মন দেখতে পায় কামনা দুর্গতি আনে, তাই সে তার থেকে পালাতে চায়। তখন মন কামনাহীন অবস্থার একটা আদর্শকে খাড়া করে বলে, 'কী করে আমি ঐ আদর্শে পৌঁছোবো'। তখন কী ঘটে? তখন কামনাশূন্য হতে গিয়ে তুমি কামনাকে দমন করো, তাই তো? তুমি তোমার ইচ্ছাগুলোর কন্ঠরোধ করো, তাদের হত্যা করার চেষ্টা করো, তারপর ভাবো তুমি বীতকাম হয়েছো— যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

কামনা কী? এটা একটা শক্তি, নয় কি? যে মুহূর্তে তুমি তোমার শক্তিকে রুদ্ধ করলে তুমি নিজেকেই আরো স্থূল, আরো নিষ্প্রাণ

করে তুললে। ভারতে এই ব্যাপারটাই ঘটেছে। এখানে তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তিরা তাদের ইচ্ছার কণ্ঠরোধ করে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি আছেন যাঁরা নিজেরা চিন্তা করতে পারেন এবং মুক্ত। সুতরাং কামনাকে শ্বাসরুদ্ধ করা জরুরী নয়, প্রয়োজন শক্তিটাকে বুঝতে পারা, তাকে সঠিক পথে প্রবাহিত করানো।

লক্ষ্য করবে, যখন তোমরা ছোটো তখন তোমাদের শক্তি অপরিমিত। সে শক্তি তোমাদের মধ্যে পাহাড় পেরোবার, তারায় পৌঁছোবার ইচ্ছা জাগায়। এরপরে সমাজের পদার্পণ ঘটে, সমাজ বলে তোমাদের শক্তিকে শোভনতার চারদেওয়ালের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করে রাখো। তারপর শিক্ষার মাধ্যমে, সব রকমের বিধি-নিষেধ এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সে শক্তিকে নিষ্পেষিত করা হয়, ক্ষীণ করে তোলা হয়। কিন্তু তোমাদের কম শক্তি নয়, আরো অনেক অনেক বেশী শক্তির প্রয়োজন। শক্তির অসামান্য প্রাচুর্য ছাড়া সত্যকে কোনোদিন খুঁজে পাবে না। সুতরাং সমস্যাটা শক্তিকে কমানো নিয়ে নয়, বরং কীভাবে যে শক্তি আছে তাকে সংরক্ষণ করা যাবে, কীভাবে তাকে বাড়ানো যাবে, কীভাবে তাকে স্বাধীন এবং সতত সঞ্চরমান রাখা যাবে, যাতে তা পরম বা ঈশ্বরের দিকেই সর্বদা ধাবিত হয়— সেটাই মূল ব্যাপার। তখন এই শক্তির অর্থ একেবারে ভিন্ন। শান্ত হ্রদের জলে একটা পাথর ফেললে ঢেউয়ের বৃত্তটা ক্রমশ বড়ো হতে থাকে, তেমনই সত্যের দিকে শক্তির কোনো ক্রিয়া নতুন সংস্কৃতির ঢেউ তোলে। তখন শক্তি সীমাহারা, শক্তি অপরিমেয়, আর সেই শক্তিই ঈশ্বর।

প্রশ্নসূচি

১ (ক) যদি সবাই বিদ্রোহ করে তবে কি পৃথিবীতে
এক অরাজকতার সৃষ্টি হবে না? ৬

(খ) বিপ্লব, শেখা আর প্রেম এরা কি পৃথক পৃথক
প্রক্রিয়া, নাকি এরা একইসাথে ক্রিয়া করে? ৮

(গ) সমাজ, কিছু অর্জনের লোলুপতা আর
উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে রয়েছে
তা ঠিক, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকলে কি
আমাদের ক্ষয় বন্ধ হয়ে যাবে? ৯

(ঘ) অন্যান্য বেশীর ভাগ দেশের মতো ভারতেও
শিক্ষা সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এমতাবস্থায়
আপনার আলোচিত বিষয়গুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা
কি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব? ১০

২ (ক) মেধা কী? ১৬

(খ) রুক্ষ মন কি সংবেদনশীল মন হতে পারে? ১৮

(গ) কী করে একজন শিশু তার বাবা-মা ও শিক্ষক
ছাড়া খুঁজে পাবে— সে কী? ১৯

(ঘ) বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে গ্রামে তারা অদ্ভুত ঘটনা—
যেমন ভূতে-ধরা বা ভর হওয়া এইসব দেখেছে
এবং তারা ভূত-প্রেত এসবে ভয় পায়। তারা

মৃত্যু সম্পর্কেও প্রশ্ন করে। কীভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়? ২০

৩ (ক) কামনার উৎপত্তি কোথা হতে হয়, কী করে আমি এর থেকে মুক্ত হবো? ২৬

(খ) যতক্ষণ আমরা সমাজে বসবাস করছি ততক্ষণ কী করে আমরা এই নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হবো? ২৮

(গ) মানুষ লড়াই করে কেন? ৩০

(ঘ) ঈর্ষা কী? ৩১

(ঙ) কেন আমি কখনও কোনো কিছুতেই সন্তুষ্ট নই? ৩২

(চ) পড়াশুনা করা কেন জরুরী? ৩৩

(ছ) সঙ্কোচ কী? ৩৪

৪ (ক) ঈশ্বরকে পূজা করা কি সত্যকার ধর্ম নয়? ৪১

৫ (ক) অতৃপ্তিবোধ স্বচ্ছ চিন্তাভাবনায় বাধা দেয়। কী করে এই বাধা অতিক্রম করা যায়? ৫০

(খ) আত্মজ্ঞান কী, আমরা কীভাবে তা লাভ করতে পারি? ৫২

(গ) আত্মা কী? ৫৪

৬ (ক) আমরা কেন বিখ্যাত হতে চাই? ৫৯

(খ) আপনি যখন ছোটো ছিলেন আপনি একটা বই লেখেন। যাতে আপনি বলেছেন ‘এগুলো আমার কথা নয় আমার গুরুর বাণী’। তাহলে এখন কেন আপনি আমাদের নিজেদের চিন্তা করতে হবে— এই ব্যাপারে জোর দিচ্ছেন? আপনার গুরুই-বা কে ছিলেন? ৬১

(গ) মানুষ কেন গর্বিত হয়? ৬৩

	(ঘ)	আমাদের ছোটোবেলা থেকেই আমাদের বলা হয়, সুন্দর কী, অসুন্দর কী— ফলত সারা জীবন আমরা সেটারই পুনরাবৃত্তি করি, আর বলে যাই 'এটা সুন্দর, ওটা অসুন্দর'। তাহলে কী করে একজন জানবে সত্যকার সুন্দর বা অসুন্দর কী?	৬৪
	(ঙ)	দয়া করে যদি কিছু মনে না করেন— আপনি বলেননি আপনার গুরু কে ছিলেন?	৬৫
৭	(ক)	আপনি এতো লাজুক কেন?	৭২
	(খ)	রোজকার জীবনে কীভাবে সত্যকে উপলব্ধি করা যাবে?	৭২
	(গ)	মূর্তি, গুরু বা সাধু মহাত্মারা কি সঠিকভাবে ধ্যান করতে সহায়তা করেন না?	৭৪
	(ঘ)	ছাত্রদের কর্তব্য কী?	৭৫
	(ঙ)	প্রেম এবং সম্মানের মধ্যে পার্থক্য কী?	৭৬
৮	(ক)	রাগ কী এবং লোকে রেগে যায় কেন?	৮৩
	(খ)	আমরা আমাদের মাকে এতো ভালোবাসি কেন?	৮৪
	(গ)	আমার ভিতরটা ঘৃণায় ভর্তি। আমাকে কীভাবে ভালোবাসতে হয় শিখিয়ে দেবেন?	৮৪
	(ঘ)	জীবনে আনন্দ কী?	৮৬
	(ঙ)	সত্য জীবন কী?	৮৮
৯	(ক)	আমরা বিলাসবহুলভাবে বাঁচতে চাই কেন?	৯৩
	(খ)	যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরিবেশের সাথে লড়াই করবো আমাদের জীবনে কি শান্তি আসবে?	৯৪
	(গ)	আপনি কি সুখী, না তা নয়?	৯৫
	(ঘ)	আমরা কাঁদি কেন? দুঃখই-বা কী?	৯৬

(ঙ) সংঘর্ষ ছাড়া, দ্বন্দ্ব ছাড়া আমরা কী করে অখণ্ডতা লাভ করবো ? ৯৭

১০ (ক) মৃত্যুর পরেও কি আত্মার অস্তিত্বটা থেকে যায় ? ১০২

(খ) যখন আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন কেন আমাদের বাবা-মায়েরা এতো চিন্তা করেন ? ১০৪

(গ) মন্দিরের দ্বার কি সবার পূজা দেবার জন্য খুলে দেওয়া উচিৎ ? ১০৫

(ঘ) জীবনে নিয়মানুবর্তিতার কী ভূমিকা রয়েছে ? ১০৬

(ঙ) মন্দির নিয়ে কথা বলার সময় আপনি বললেন ঃ ভগবানের যে প্রতীক সে তো কেবলমাত্র ছায়া। আমরা তো কোনো মানুষের অনুপস্থিতিতে তার ছায়া দেখতে পাই না। ১০৮

(চ) পরীক্ষাগুলো যারা সম্পন্ন পরিবার থেকে এসেছে সেইসব ছাত্র বা ছাত্রীদের জন্য অপ্রয়োজনীয় হতে পারে। কিন্তু যারা দরিদ্র, যাদের কোনো-না-কোনো একটা জীবিকার জন্য নিজেদের তৈরী করতেই হবে, তাদের জন্য কি পরীক্ষা প্রয়োজনীয় নয় ? সমাজের পরিকাঠামো যা, তাকে ঠিক সেভাবে মেনে নিয়েই তাদের পরীক্ষার প্রয়োজনটা কি কম গুরুত্বপূর্ণ ? ১০৯

(ছ) ধনী কি দরিদ্রের সুরাহার জন্য কোনোদিন তাদের সম্পদের অনেকটা দেবার জন্য প্রস্তুত থাকবে ? ১০৯

১১ (ক) আপনি যেগুলো নিয়ে কথা বলছেন সেগুলো কী করে জানলেন ? আমরাই-বা ওগুলো কী করে জানতে পারবো ? ১১৫

(খ) অন্যের সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা উচিত, না উচিত নয় ? ১১৬

(গ) অনুভূতি কী, আমরা কেমনভাবে অনুভব করি ? ১১৭

(ঘ) ভারতীয় সংস্কৃতি ও আমেরিকার সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য কী ? ১১৮

(ঙ) ভারতীয়দের সম্পর্কে আপনার ধারণা কী ? ১২১

১২ (ক) আমরা কেন সঙ্গী চাই ? ১২৮

(খ) বক্তৃতা দেওয়া কি আপনার একটা সখ ? এই ব্যাখ্যা করতে করতে আপনি কি ক্লান্ত হন না ? আপনার এটা করার ভিতরের কারণটা কী ? ১২৯

(গ) আমি যখন কাউকে ভালোবাসি আর সে রেগে যায়, তার রাগে এতো তীব্রতা থাকে কেন ? ১৩০

(ঘ) মন কী করে এর বাধাগুলোকে অতিক্রম করবে ? ১৩১

(ঙ) ঈশ্বর পৃথিবীতে কেন এতো পুরুষ এবং নারী সৃষ্টি করেছেন ? ১৩২

১৩ (ক) কেন আমরা আমাদের খেলার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাই, পড়াশুনায় তা পাই না ? ১৩৭

(খ) আপনি বলেছিলেন যখন কেউ কোনো কিছুর ভুলটা, তার ব্যর্থতাটা দেখতে পায়, তা আপনেই তার জীবন থেকে চলে যায়। আমি রোজ ধূমপানের ভুল জায়গাটা, তার ব্যর্থতাটা দেখি, কিন্তু ওটা তো আমার জীবন থেকে চলে যাচ্ছে না ? ১৩৯

(গ) কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ যখন গম্ভীর হয়ে ওঠেন আমরা কেন ভয় পাই ? কী তাঁদের গম্ভীর করে তোলে ? ১৪১

(ঘ) ভাগ্য কী ? ১৪৩

১৪ (ক) আমরা গরীবদের ঘৃণা করি কেন ? ১৫০

(খ) আপনি সত্য, ভালোত্ব, অখণ্ডতা এইসব নিয়ে

কথা বলছেন। যার অর্থ অন্য দিকে মিথ্যা, খারাপ, খণ্ডিত অবস্থা রয়েছে। তাহলে কী করে একজন নিয়মানুবর্তিতা ছাড়া অনুশাসন ছাড়া সৎ, ভালো ও সম্পূর্ণ হবে? ১৫২

(গ) শক্তি কী? ১৫৩

(ঘ) আমরা কেন খ্যাতি খুঁজি? ১৫৫

১৫ (ক) যেসব পরিস্থিতিগুলো বা কারণগুলো মানসিক দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করে তাদের এড়িয়ে না গেলে কী করে আমরা মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে পারি? ১৬০

(খ) কী করে আমরা নিজেদের জানতে পারবো? ১৬৩

(গ) যিনি প্রেরণা দান করেন— এমন কেউ ছাড়া কি আমরা নিজেদের জানতে পারবো? ১৬৬

(ঘ) একজনের মধ্যে এতো অসংগতি, এতো স্ববিরোধিতা থাকলে পূর্ণতা নিয়ে থাকা এবং কাজ করা কী করে সম্ভব? ১৬৭

(ঙ) আমরা যা করতে ভালোবাসি— তার জন্য কি আমরা বাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্যটাই ভুলে যাবো? ১৬৯

(চ) আমি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাই আর বাবা যদি তার বিপক্ষে থাকেন, তাহলে তা তো কোনোমতেই আমাকে সাহায্য করবে না। তখন কী করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বো? ১৭০

১৬ (ক) আপনি যা কিছুই বলছেন, কীভাবে আমাদের আচারে-আচরণে আমরা তা নিয়ে আসবো? ১৭৬

(খ) কেন কোনো সময়ই আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না? আমাদেরই চাওয়া কোনো কাজ যখন আমরা সম্পূর্ণ করতে চাই, কেন সবসময়ই

বাধা আসে? ১৭৮

(গ) আমি নিজেকে স্থূলবুদ্ধির মানুষ হিসাবে দেখতে পাই। কিন্তু অন্যে বলে আমি বুদ্ধিমান। আমার জানাটা, না অন্যের বলাটা— কোনটার প্রভাব আমার উপর বেশী পড়া উচিত? ১৮০

(ঘ) আমরা দুষ্টু কেন? ১৮২

(ঙ) আমার চা খাওয়ার অভ্যাস আছে। একজন শিক্ষক বলেন ওটা বদঅভ্যাস, আর একজন বলেন ওটা ঠিক আছে। ১৮৩

১৭ (ক) আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই কেন? ১৯০

(খ) এটা বলা হয় আমাদের মধ্যে এক স্থায়ী, এক শাশ্বত সত্য রয়েছে। আমাদের এই ক্ষণিক জীবনে কী করে এই চিরন্তন সত্য থাকতে পারে? ১৯২

(গ) পূর্ণতা সম্পর্কে কী আমাকে কোনো ধারণা দিতে পারেন? ১৯৩

(ঘ) যে ব্যক্তি আমাদের আঘাত করে তাকে প্রত্যাঘাত করে আমরা প্রতিশোধ নিতে চাই কেন? ১৯৪

(ঙ) আমি অন্যকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করতে মজা পাই, কিন্তু আমাকে নিয়ে কেউ করলে ভারী রাগ হয়। ১৯৪

(চ) মানুষের কাজ কী? ১৯৫

(ছ) আমরা ঈশ্বরের পূজা করি কেন? ১৯৬

১৮ (ক) কাল সভা ভেঙ্গে যাবার পর আমরা দেখলাম আপনি অতি গরীব কৃষকের দুই ছেলে, যারা রাস্তার ধারে খেলছিল তাদের দেখছেন।

ওদের দিকে যখন দেখছিলেন তখন আপনার
মনে কী অনুভূতি আসছিল একটু বলবেন? ২০৩

(খ) মন কী করে একই সঙ্গে অনেক জিনিস
শুনতে পারে? ২০৪

(গ) আমরা অলসতা ভালোবাসি কেন? ২০৫

(ঘ) একদিকে আপনি বলেন আমাদের সমাজের
বিরুদ্ধে বিপ্লব করা উচিত। একইসঙ্গে এও
বলছেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া ঠিক নয়। তাহলে
সমাজের উন্নতির যে ইচ্ছা সেটা কি
উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়? ২০৬

(ঙ) যখন আমি পড়াশুনা করি না তখন কেন
নিজেকে ঘৃণা করি? ২০৮

(চ) বর্তমানে যে সমাজ আছে, এর বিরুদ্ধে বিপ্লব
করে যদি আমরা একটা নতুন সমাজ গড়ি,
সেই নতুন সমাজ গড়াটাও কি উচ্চাকাঙ্ক্ষারই
একটা অন্য রূপ নয়? ২১১

১৯ (ক) ভালোবাসা না শাস্তি, কোনটা দুষ্টু বাচ্চাদের
মধ্যে পরিবর্তন আনে? ২১৭

(খ) একজন কী করে বুদ্ধিমান হবে? ২১৯

(গ) আমি একজন মুসলমান। যদি আমি আমাদের
ধর্মের যে সংস্কার, যে নিয়মরীতি তা প্রাত্যহিক
জীবনে না মেনে নিই, আমার বাবা-মা বলেন
বাড়ী থেকে বার করে দেবেন। আমার কী
করা উচিত? ২২০

(ঘ) আপনি বলছেন মনোযোগ দিতে গেলে
কোনোপ্রকার প্রতিরোধ থাকলে চলবে না।
এটা কী করে সম্ভব? ২২২

	(ঙ)	আচ্ছা, আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এতো ভালোবাসি কেন ? ২২৪
২০	(ক)	যদি আমি ছোটো বয়স থেকেই একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখি, তাহলে কি বড়ো হলে তা পূর্ণ হবে ? ২৩১
	(খ)	বর্তমান সামাজিক অবস্থায় আপনি যা বলছেন তাকে কাজে লাগানো কি সত্যি খুব কঠিন নয় ? ২৩২
	(গ)	আমূল পরিবর্তন বলতে আপনি কী বোঝাতে চান, একজন ব্যক্তির জীবনে বা সত্তায় তা কী করে আসবে ? ২৩৪
	(ঘ)	আত্মবিস্তার কী ? ২৩৫
	(ঙ)	ধনীরা এতো গর্বিত কেন ? ২৩৫
	(চ)	আমরা কেন সর্বদা 'আমি' এবং 'আমার' এতেই বন্দী হয়ে থাকি, এবং কেন আপনার সাথে মিলিত হলে ঐ ধরণের মানসিক অবস্থা থেকে উৎপন্ন প্রশ্নগুলো আপনার সামনে তুলে ধরি ? ২৩৬
	(ছ)	মেয়েরা এতো সাজে কেন ? ২৩৭
২১	(ক)	যেটা আমাদের শিখতে কঠিন লাগে, কেন আমরা সেটা তাড়াতাড়ি ভুলে যাই ? ২৪২
	(খ)	প্রগতি কথার তাৎপর্য কী ? ২৪৩
	(গ)	আমি কাছে এলে পাখীরা উড়ে পালায় কেন ? ২৪৫
	(ঘ)	আপনার এবং আমার মধ্যে পার্থক্য কী ? ২৪৬
	(ঙ)	যখন আমি ধূমপান করি তখন শিক্ষকরা কেন বিরক্ত হন ? ২৪৭
	(চ)	মানুষ বাঘ শিকার করে কেন ? ২৪৮
	(ছ)	আমাদের এতো দুঃখ কেন ? ২৪৯

২২ (ক) স্কুলের কোনো অনুষ্ঠানে কেন সবসময়ই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা ধনী ব্যক্তিরাই আমন্ত্রিত হন? ২৫৫
(খ) আপনি বলেন নির্মিত প্রতিমায় ঈশ্বর থাকেন না, কিন্তু অন্যে বলে সেখানেই ঈশ্বর অধিষ্ঠিত। যদি আমরা আমাদের হৃদয়ে পূর্ণ বিশ্বাস রাখি, শ্রদ্ধা রাখি, তখন তাঁর শক্তি স্বয়ং সেখানে প্রকট হয়। পূজার সত্যতা কী? ২৫৭
(গ) আপনি একদিন বলেছিলেন আমাদের শান্ত হয়ে বসা উচিত এবং আমাদের মনের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা উচিত। কিন্তু যেই সচেতনভাবে তা নিরীক্ষণ করতে যাই অমনি চিন্তাগুলো লুপ্ত হতে থাকে। তাহলে যখন মনই দ্রষ্টা এবং মনই দৃশ্য তখন কী করে আমরা আমাদের মনকে দেখবো? ২৫৯
(ঘ) মানুষ কি কেবল মন এবং মস্তিষ্ক, নাকি তাদের অতিক্রম করে আরো বেশী কিছু? ২৬০
(ঙ) প্রয়োজন এবং লোভের মধ্যে পার্থক্য কী? ২৬১
(চ) যদি মন এবং মস্তিষ্ক একই হয় তাহলে কেন কোনো চিন্তা বা কোনো আবেগকে মস্তিষ্ক বলল ভালো নয়, মন কিন্তু তাকে বয়ে নিয়েই চলল? ২৬২
২৩ (ক) সজাগতা আর সংবেদনশীলতার পার্থক্য কী? ২৬৯
(খ) যখন কেউ হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় আমরা হাসি কেন? ২৭১
(গ) আমাদের একজন অধ্যাপক বলেন, আপনি যা যা বলেন বাস্তবে তার রূপায়ণ সম্ভব নয়, ওগুলো অব্যবহারিক। তিনি বলেন, একশো কুড়ি টাকা মাইনেতে ছটা ছেলে আর ছটা মেয়েকে পালন করে, তারপর যদি আপনি

একই কথা বলেন তো ঠিক আছে। এ ব্যাপারে
আপনার মতামত কী? ২৭২
(ঘ) শিক্ষা গ্রহণ করা সত্ত্বেও যদি আধুনিক বিশ্বের
বিলাসিতা আমাদের বিনষ্ট করে তাহলে এমন
শিক্ষার অর্থ কী? ২৭৫
(ঙ) আমি বড়ো কালো, কিন্তু বেশীরভাগ লোকই
তো ফরসা লোকেদের পছন্দ করে। কী করে
তাদের কাছ থেকে প্রশংসা পাবো? ২৭৬
২৪ (ক) ইংরেজ কেন ভারতে শাসন করতে এসেছিল? ২৮৪
(খ) ধ্যানের সময়েও ব্যক্তি সত্য কী অনুভব করে
বলে তো মনে হয় না, দয়া করে বলবেন সত্য
কী? ২৮৫
(গ) আমরা যদি কোনো ভুল করি, কেউ যদি সেটা
দেখিয়েও দেয় তবু কেন সেই ভুল আবার করি? ২৮৬
(ঘ) জীবন কী, কীভাবে আমরা সুখী হতে পারি? ২৮৭
(ঙ) আমরা কেন নিজেদের মধ্যে লড়াই করি? ২৮৮
(চ) মন কেন অন্যকে এবং নিজেকেও ভুলভাবে
ব্যবহার করে? ২৮৯
(ছ) যে মন সাফল্য খোঁজে, আর যে মন সত্যকে
খোঁজে তারা কি আলাদা? ২৯০
২৫ (ক) আমি কিছু কাজ করতে চাই। কিন্তু অনেকবার
চেষ্টা করেও তাতে সফল হইনি। এখন কি ঐ
চেষ্টাটা ছেড়ে দেবো, নাকি চালিয়ে যাবো? ২৯৫
(খ) মৌলিকভাবেই কেন আমরা স্বার্থান্বেষী?
আচার-ব্যবহারে আমরা নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা
করি, কিন্তু যে মুহূর্তে আমাদের নিজেদের
স্বার্থ এসে আমাদের সামনে দাঁড়ায় আমরা

আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠি, অন্যের প্রয়োজন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে উঠি। ২৯৮

(গ) কেন মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ভালোবাসা পেতে চায়, এবং যদি সে না পায় অন্যান্যদের মতো সে একজন বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রত্যয়পূর্ণ মানুষ হয় না? ৩০০

(ঘ) বয়স্ক লোকেরা চুরি করে কেন? ৩০১

২৬ (ক) মানুষ এতো জ্ঞান সঞ্চয় করলো কীভাবে? বস্তুগতভাবেই-বা তার এতো প্রগতি হলো কীভাবে? কোথা থেকে সে এতো বিশাল শক্তি আহরণ করলো? ৩০৯

(খ) যখন আমি বলি— আমি অন্য ধর্ম অনুসরণ করবো, আমার বাবা-মা রেগে যান কেন? ৩১২

(গ) চরিত্র গড়ে তোলার সঠিক উপায় কী? ৩১৪

(ঘ) ঈশ্বরোপলব্ধির ক্ষেত্রে বয়স কীভাবে বাধা হয়ে দাঁড়ায়? ৩১৫

২৭ (ক) আমি সমাজের কাজ করতে চাই, কিন্তু কী করে শুরু কররো সেটাই বুঝতে পারছি না? ৩২১

(খ) মানুষ এতো নির্মম কেন? ৩২৩

(গ) একজন তার ভালোলাগার কাজ না করেও কি সত্যকে খুঁজতে পারে? ৩২৪

(ঘ) এটা কি সত্যি— যে মানুষ নিষ্কলুস, নির্দোষ সে-ই একমাত্র ভয়শূন্য হতে পারে? ৩২৫

(ঙ) মানুষ নিজেরই কামনা, যা কতো সমস্যার জন্ম দেয়— তার শিকার হয়ে যায়। কী করে সে এমন কোনো অবস্থায় আসবে যাতে কোনো কামনাই আর থাকবে না? ৩২৭